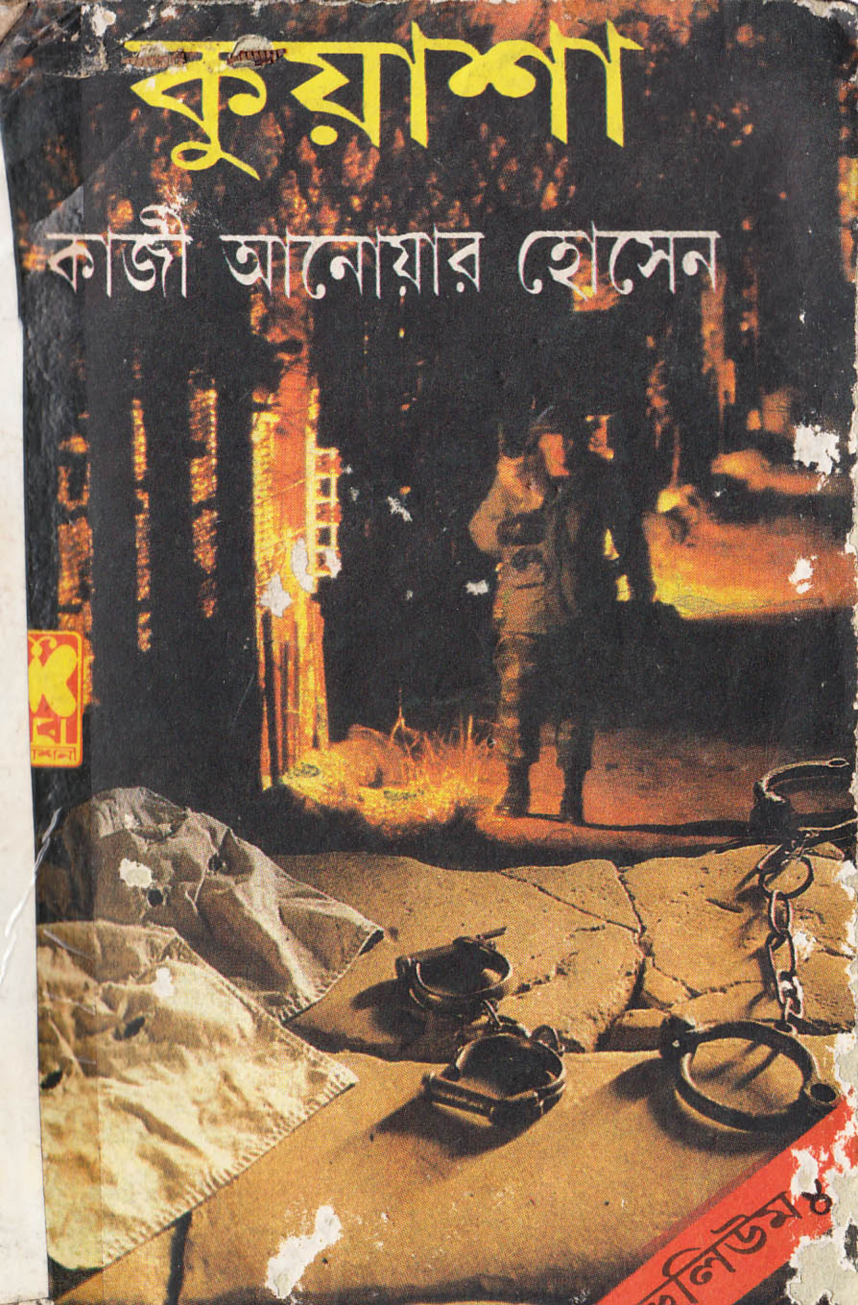
কুয়াশা
কাজী আনোয়ার হোসেন
ভলিউম ৮

কুয়াশা-১০

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮

ঢাকা এয়ারপোর্ট।

রানওয়েতে লণ্ডনগামী একখানি ট্রাইডেন্ট জেট বিমান মহাশূন্যে ডানা মেলে দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

রাত নটা বাজতে দশ মিনিট বাকি আছে আর। এমন সময় শহীদের ক্রিমসন কালারের ফোকসওয়াগেনটা এয়ারপোর্টের পার্কিং সেন্টারে এসে প্রবেশ করতে দেখা গেল। পিছনে মি. সিম্পসনের গাড়িটাও।

গাড়ি পার্ক করে শহীদ আগে নামলো। তারপর একে একে মহুয়া, কামাল, লীনা ও গফুর।

মি. সিম্পসনের গাড়িটাও কিছুটা দূরে এসে থামলো। গাড়ি থেকে নেমে মি. সিম্পসন একবার পিছন ফিরে তাকালেন। তারপর শহীদের দিকে একটা ইঙ্গিত করে হাঁটতে লাগলেন সামনে। মি. সিম্পসনের ইঙ্গিতে পিছন ফিরে তাকালো শহীদ। দেখলো একটা নিউ মডেলের কনভেয়ার অদূরেই পার্ক করা রয়েছে। একটা লোক কনভেয়ারের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অন্ধকারে লোকটার মুখাবয়ব দেখা যাচ্ছে না।

শহীদ ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করলো। ওরা সকলে একসঙ্গে এগিয়ে চললো কথা বলতে বলতে।

'আমার প্ল্যানটা তাহলে হানড্রেড পার্সেন্ট সাক্‌সেসফুল বলেই প্রমাণিত হলো,' ওয়েটিংরুমের দিকে হাঁটতে হাঁটতে পার্শ্ববর্তী মি. সিম্পসনের উদ্দেশ্যে বললো শহীদ।

'সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই,' মি. সিম্পসন মৃদু হেসে বললেন, 'তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারা যায় না।'

মি. সিম্পসনের উদ্দেশ্যে আরও কিছু বলবার জন্যে মুখ খুলেছিল শহীদ, এমন সময় মাইকে ঘোষকের গলার আওয়াজ শুনে চুপ করে গেল।

'অ্যাটেনশন...ইওর অ্যাটেনশন প্লীজ...পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ার লাইনস অ্যানাউন্সেস দ্যা ডিপারচার অব ইট্‌স ফ্লাইট পি, কে, ফোর সেভেন নাইন, ফর লণ্ডন ভায়া করাচী। প্যাসেঞ্জারস অন বোর্ড প্লীজ। থ্যাঙ্কইয়ু।'

আরও কিছুক্ষণ পর মহুয়া, লীনা এবং মি. সিম্পসনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এগিয়ে চললো ওরা অপেক্ষমাণ বিমানটির দিকে। শহীদ আর কামাল আগে আগে

পিছনে গফুর। ক'পা এগিয়েই কি মনে করে গফুর আবার ফিরে এলো। মহুয়ার দিকে তাকিয়ে বললো, 'দিদিমণি, আমি সঙ্গে থাকতে দাদামণির কোনো ভয় নেই এ কথা তুমি নিশ্চয় জেনো। আর মীরপুর মাজারে একবার যেতে ভুলো না যেন!'

গফুরের কথা বলবার ভঙ্গি দেখে লীনা শব্দ করে না হেসে পারলো না। মহুয়াও হাসলো, কিন্তু তার হাসিটা কেমন যেন ম্লান। হাসির মধ্যে দয়িতের সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনাই যেন তাতে বেশি করে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

প্লেনের ভিতরে ঢুকবার আগে শহীদ ঘুরে দাঁড়িয়ে সকলের উদ্দেশে হাত নেড়ে বিদায় জানালো। বিদায় জানাতে এসেছিল যারা তারাও হাত নাড়লো।

মিনিট দুই পর ফুঁসে উঠলো ট্রাইডেন্টটা। রানওয়ে ধরে ছুটতে শুরু করলো তারপর। আর ক'মুহূর্ত পরই বিরাট এই যন্ত্রদানবটি ভূমি ছেড়ে উপরে, আরও উপরে উঠে যাবে। যাত্রা শুরু হবে মহাশূন্যের পথে, আর এক মহাদেশের উদ্দেশে।···

এক

মি. সিম্পসনের অফিস রুম।

মি. সিম্পসন উত্তেজিত ভাবে ঘরময় পায়চারি করছেন। তাঁর চোখমুখে গভীর চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে। বড় বেশি বিচলিত দেখাচ্ছে তাঁকে। টেবিলের ওপর একটা খোলা ফাইল। মাঝে মাঝে পায়চারি বন্ধ করে খোলা ফাইলটায় নজর বুলিয়ে নিচ্ছেন তিনি। চেষ্টা করছেন কি যেন একটা সমস্যার সমাধান বের করতে। কিন্তু দু'এক মুহূর্ত পরই ফাইল থেকে মুখ তুলে সরে আসছেন টেবিলটার কাছে থেকে। শেলফ থেকে একবার একটা বই বেছে বের করে পাতা ওল্টাতে লাগলেন কিছুক্ষণ, কি যেন দেখে নিয়ে বইটা রেখে দিলেন, তারপর আবার শুরু করলেন পায়চারি। আর একবার টেবিলটার কাছে সরে গিয়ে খোলা ফাইলটায় চোখ রেখে অনেকখানি সময় নিয়ে ঝুঁকে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন ফাইল থেকে চোখ সরিয়ে। দুশ্চিন্তার গভীর রেখাগুলো কপাল থেকে ধীরে ধীরে মুছে গেল তাঁর। তারপর ফোনটার দিকে হাত বাড়ালেন। ডায়াল করে মুখ খুললেন, 'হ্যালো···শহীদ? সিম্পসন স্পিকিং···শোনো, তোমাকে এখুনি দরকার বোধ করছি···হ্যাঁ, চলে এসো আমার অফিসে···হ্যাঁ, বিশেষ জরুরী ব্যাপার একটা···না, বলা যাবে না এখন···হ্যাঁ ···এখুনি ···বেশ, আমি অপেক্ষা করছি।'

ফোনটা নামিয়ে রেখে মি. সিম্পসন আবার ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন।

'আমি শখের গোয়েন্দা শহীদ খান, ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের গৌরব মি. সিম্পসনের জরুরী ডাকে এখানে আমার আগমন ঘটেছে।'

মি. সিম্পসন চমকে উঠে পায়চারি বন্ধ করে বললেন, 'কে! ওহ শহীদ, কখন

এসেছো?'

শহীদ হাসতে হাসতে বললো, 'তা মিনিট দশেক তো হবেই। কিন্তু কি ব্যাপার মি. সিম্পসন···'

মি. সিম্পসন প্রথানুসারে ক্ষমা চাইলেন, 'আই অ্যাম সরি···' তারপর ইঙ্গিতে টেবিলের ওপর খোলা ফাইলটা দেখিয়ে দিলেন। শহীদ উঠে দাঁড়িয়েছিল আগেই, এবার এগিয়ে গিয়ে ফাইলটা হাতে তুলে নিলো।

ফাইলটাতে রয়েছে একটা টপ সিক্রেট মার্কা মারা রিপোর্ট। শহীদ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে রিপোর্টটা পড়তে শুরু করলো।

পাঠকের সুবিধার জন্য রিপোর্টটা সংক্ষিপ্তাকারে এখানে তুলে দেয়া হলোঃ

'বিশালবনের ফরেস্ট অফিসারের জন্য নির্দিষ্ট বাংলোটি জঙ্গলাকীর্ণ একটি ছোটো পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। গত সাত মাস ধরে আশ্চর্যজনক কয়েকটি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে এই বাংলোটির মধ্যে। গত সাত মাস সময়-সীমার মধ্যে পর পর তিনজন ফরেস্ট অফিসার নিহত হয়েছেন এই বাংলোর একটি কামরায়। নিহত হওয়ার কারণটা খুবই বিপজ্জনক, সন্দেহজনক এবং রহস্যজনক। প্রথমজন নিহত হওয়ার প্রায় দেড়মাস পর নিহত হন দ্বিতীয়জন। তৃতীয়জন নিহত হন প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস পর, গত মাসের আঠারো তারিখে। তিনজন অফিসারই একই ঘরে এবং রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। জ্যামেইকা অঞ্চলের ব্ল্যাক উইডো নামে এক প্রকার বিষাক্ত মাকড়সার কামড়েই এদের তিনজনের মৃত্যু ঘটেছে বলে জানা গেছে। স্ত্রী মাকড়সাকে না খাইয়ে রেখে বিষাক্ত করে তোলা হয়। আশ্চর্যের কথা হলো, আমাদের দেশে এই মাকড়সার অস্তিত্ব থাকা একেবারেই অসম্ভব—যদি না কেউ আমদানী করে থাকে। আশেপাশের জঙ্গল তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সেই বিষাক্ত মাকড়সার কোনো চিহ্ন পুলিস বিভাগ বা ইনফর্মার বের করতে পারেনি। পর পর তিনজন নিরীহ ফরেস্ট অফিসারকে এভাবে হত্যা করার কি কারণ থাকতে পারে, এতে লাভ কি, কার লাভ, এসব প্রশ্ন না তুলে ব্যাপারটাকে হত্যাকাণ্ড মনে না করাই স্বাভাবিক। কিন্তু, যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা না গেলেও পুলিস বিভাগ এই ঘটনাগুলোকে ঠিক দুর্ঘটনা বলে মেনে নিতে রাজি নয়। পুলিস বিভাগ মনে করে একটা রহস্যজনক কারণ এই আশ্চর্য ঘটনাগুলোর পিছনে কাজ করছে, যে কারণে তিনজন নিরীহ ফরেস্ট অফিসারকে পৃথিবী থেকে অকালে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। এদিকে এই তিনজন অফিসারের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে দেখা গেছে কোনো জটিলতা বা রহস্য এদের মধ্যে ছিলো না, সন্দেহজনক চরিত্রের মানুষ এদেরকে বলা যায় না। কোনমতেই···'

রিপোর্টটা পড়া শেষ করে মুখ তুলে চাইলো শহীদ। মি. সিম্পসন এতক্ষণ তাকিয়ে

ছিলেন শহীদের মুখের দিকে। এবার নীরবতা ভঙ্গ করে তিনি বলে উঠলেন, 'কি মনে হয় তোমার?'

শহীদ চিন্তিত স্বরে বললো, 'অনেক কিছু মনে হওয়া সম্ভব, মি. সিম্পসন। কিন্তু না বুঝে না জেনে কিছুই মনে করতে চাই না আমি। ওটা আমার স্বভাব নয়।'

'ব্যাপারগুলো যে দুর্ঘটনা নয় এবং রহস্যজনক তা স্বীকার করো তো?'

শহীদ বললো, 'না করে উপায় কি?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'যাক! আমরা তা হলে ব্যাপারটা সম্পর্কে একমত। এবার তোমাকে আমি একটা অনুরোধ করবো...'

শহীদ মি. সিম্পসনকে মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলো, 'ডোন্ট গো ইনটু ফর্মালিটিজ মি. সিম্পসন, আই অ্যাম ইন্টারেস্টেড ইন দিস কেস।'

মি. সিম্পসনের আন্তরিক স্বর শোনা গেল, 'থ্যাঙ্কিউ, মাই বয়।'

শহীদ বললো, 'এবার কাজের কথায় আসা যাক। সরাসরি শহীদ খান বিশালবনে যাবে না। বর্তমানে নিশ্চয়ই ওখানে ফরেস্ট অফিসার বলতে কেউ নেই, তাই না? আপনি ব্যবস্থা করুন যাতে বিশালবনের ফরেস্ট অফিসারের পদটি আমি পাই। প্রকাশ্যে না গিয়ে ছদ্মবেশে নব নিযুক্ত ফরেস্ট অফিসার হিসেবে আমি ওখানে যেতে চাই, নতুন ফরেস্ট অফিসারের সঙ্গে থাকবে তার সহকারী আর আরদালি। ঠিক আছে?'

মৃদু হেসে মি. সিম্পসন বললেন, 'ঠিক আছে। কবে তুমি তৈরি হতে পারবে বলে মনে করো?'

শহীদ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাতটা মি. সিম্পসনের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো, 'সেটা নির্ভর করে আপনার উপর। চাকরিটার বন্দোবস্ত হয়ে গেলেই আমি রওনা হয়ে যাবো।'

বেরিয়ে এলো শহীদ মি. সিম্পসনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে। তার ক্রিমসন কালারের ফোকসওয়াগেনটা মৃদু গর্জন তুলে অফিস কম্পাউণ্ড ছেড়ে রাস্তায় নামলো।

সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার পাশে অপেক্ষারত নিউ মডেলের একটি কনভেয়ারকে স্টার্ট দিয়ে শহীদের ফোকসওয়াগেনটার পিছন পিছন দূরত্ব বজায় রেখে এগোতে দেখা গেল।

বাড়ি ফিরে শহীদ দেখলো, কামাল এসে বসে আছে। কথা বলছে লীনার সঙ্গে। ঘরে মহুয়াও আছে। শহীদকে দ্রুত ঢুকতে দেখে সকলে ওর দিকে মুখ তুলে তাকালো। শহীদ ফোনটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে মৃদু স্বরে বললো, 'মহুয়া, তোমরা একটু পাশের ঘরে যাও, কামাল থাক।'

শহীদের কথা শুনে মহুয়া ও লীনা সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। যাবার সময় মহুয়া কপট অভিমানে জানতে চাইলো, 'কেন, ফোনে কারও সঙ্গে প্রেমালাপ চলবে নাকি এবার? দেখা করে এসেও হলো না!'

শহীদ মিটি মিটি হেসে তার দিকে তাকালো।

মহুয়া ও লীনা ঘর ছেড়ে বের হয়ে যেতে শহীদ কামালকে নিচু স্বরে চটপট বললো, 'একজন লোক বাড়ির আশপাশে ঘোরাফেরা করছে। মি. সিম্পনের অফিস থেকেই আমাকে ফলো করে এসেছে বেটা। ওর মতি কি এবং গতি কোথায় সেটা একটু জানতে চেষ্টা কর দেখি।'

কামাল মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

শহীদ সাবধান করে দিয়ে বললো, 'দেখিস, তুই ওকে জানতে দিস না তোর অভিসন্ধি।'

কামাল ঘর ছেড়ে বের হয়ে যেতেই শহীদ রিসিভারটা তুলে ডায়েল করতে শুরু করলো।

'হ্যালো মি. সিম্পসন? শহীদ স্পিকিং···আপনার অফিস থেকে ফিরতি পথে ফলো করা হয়েছে আমাকে···না, কিছু করার নেই...তাই নাকি? আপনার কী মনে হয় বিশালবনের ঘটনার সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ রয়েছে?···আমিও সন্দিগ্ধ···যাকগে, জানেন তো, কাকপক্ষীরও অগোচরে আমি ওখানে যেতে চাই···তাই প্রমাণ করা প্রয়োজন···আর যেখানেই আমি যাই না কেন বিশালবনে নিশ্চয়ই যাচ্ছি না।···বিনা উদ্দেশ্যে আমার গায়েব হয়ে যাওয়াটা সন্দেহের উদ্রেক করবে নিশ্চয়ই···সেটা আমি চাই না···শুনুন আমার প্ল্যান···আগামী পরশুদিন লণ্ডন যাচ্ছি আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের আমন্ত্রণে···সঙ্গে যাবে কামাল ও গফুর—হ্যাঁ, সব ব্যবস্থা পাকাপাকিভাবে করা দরকার। কাগজে খবর বেরুবে, লণ্ডনের টিকিটও কাটা হবে, আপনারা আমাকে সি অফ করে আসবেন, আমরা প্লেনে চড়বো, প্লেন রানওয়ে ধরে ছুটবে—কিন্তু বিশেষ ব্যবস্থানুসারে প্রয়োজনীয় দূরত্ব বজায় রেখে পূর্ব নির্ধারিত স্থানে আমরা নেমে পড়বো।' জায়গাটা অবশ্যই ঢাকা এয়ারপোর্টের রানওয়েই হবে—পাইলট ব্যতীত ব্যাপারটা আর কেউ জানবে না···এই নামিয়ে দেয়ার ব্যাপারে আপনি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলেই আমাদের গন্তব্যস্থানের পরিচয় আর কেউ জানতে পারবে না, ···রাখি তাহলে, কেমন?'

মিনিট দশেক পরে কামাল ফিরে এলো। বললো, 'কই রে, কাউকে তো দেখলাম না রাস্তায়। ব্যাপার কি বলতো?'

শহীদ বললো, 'ব্যাপার অনেক কিছু। শোন—'

তরপর সব কথা কামালকে জানাবার জন্য সোফায় আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে বসলো শহীদ।

দুই

স্টেশন থেকে সাত মাইল ধরে একটি ইট-বিছানো রাস্তা চলে গেছে দক্ষিণমুখো। তারপরেও রাস্তা আছে। তবে ইট বিছানো নয়, মেঠো। বিশালবনের জঙ্গলের শুরু এখান থেকেই। ক্রমেই জঙ্গল গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠেছে। মেঠো পথটা একটা

জীপ গাড়ি চলার মতো চওড়া, এবড়োখেবড়ো, ধূলিময় আর অন্ধকার। দিনের বেলাতেও সূর্যের আলো যথেষ্ট স্বাধীনভাবে প্রবেশ করতে পারে না। এই মেঠো পথ ধরে মাইল চারেক এগিয়ে গেলেই দেখা যাবে ফরেস্ট অফিসারস কোয়ার্টার অভ বিশালপুর। ছোট্টো একটা পাহাড়ের গায়ে বাংলোটা। চারপাশে গভীর জঙ্গল, কেটেকুটে খানিকটা খোলা জায়গা বের করা হয়েছে। ডানদিকে, চার পাঁচশ' গজ দূরে একটি খাদ। খাদটির সৃষ্টি হয়েছে প্রাকৃতিক কারণে। জলও নিশ্চয় কোনো ঝরনা থেকে উৎসারিত। তিনশো ফিট নিচে বয়ে চলেছে প্রবল জলস্রোত। উপর থেকে দাঁড়িয়েও শোনা যায় খরস্রোতা পার্বত্য নদীর গর্জন।

ফরেস্ট অফিসারদের কোয়ার্টার ছাড়িয়েও কিছুদূর চলে গেছে সঙ্কীর্ণ মেঠো পথটা। তবে মাইলখানেকও হবে না। যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে রাস্তাটা তারপরও মানুষ যাতায়াতের পথ আছে। পায়ে চলা পথ। একটা দুটো নয়, অগুণতি। এগুলো সভ্য মানুষের সৃষ্টি নয়, আদিবাসীরা এর কারণ। বন্য জন্তু জানোয়াররাও এ পথে চরে বেড়ায়।

অফিসার্স কোয়ার্টার থেকে মাত্র মাইল খানেক দূরে আদিবাসীদের গ্রাম। বোণ্ডা, গারো, রাজবংশী বিশালবনের আদিবাসী। বোণ্ডারা থাকে পাহাড়ের ওপারে, তাদের নিজেদের প্রাচীন গাঁয়ে। খুব তেজী, দুর্ধর্ষ, ভয়ঙ্কর। সভ্যতার মুখ ওরা দেখেনি, দেখতে চায়ও না। সভ্য মানুষকে ওরা এখনও ঘৃণার দৃষ্টিতেই দেখে। অতি সামান্য কারণে রেগে ওঠা এদের স্বভাব। হঠাৎ ওরা তীর ছুঁড়ে বসতে পারে, বিষাক্ত সে তীর। প্রাণ ছিনিয়ে নেবার জন্যই এর সৃষ্টি।

বোণ্ডা মেয়েরা সকলেই মাথা কামিয়ে ফেলে। কাপড়-চোপড়ের ব্যবহার অত্যল্প, উর্ধ্বাঙ্গে কিছুই পরে না। কিন্তু গহনা? সত্যি কথা বলতে কি, বোণ্ডা মেয়েরা একেকজন একেকটা জুয়েলারী দোকানের চলমান শো কেস। পুরুষরা শুধু নেংটি পরে। নিজেদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা মেনে চলে সবাই।

পাহাড়ের এদিকে, অর্থাৎ, জঙ্গলের ভিতর ঘরবাড়ি করে বসবাস করে রাজ-বংশীরা। বোণ্ডাদের মতো এরা অতো ভয়ঙ্কর নয়, তেজী কম নয় যদিও। সভ্য মানুষ ওদের ওপর না চটলে পারতপক্ষে ওরাও চটে না। তবে ব্যতিক্রমও ঘটেছে।

সভ্য মানুষও কোনো কোনো সময় এদিকে আসে বৈকি। শিকারই একমাত্র কারণ। কিন্তু সে দুই বা চারদিনের জন্যে। গাছ কাটার ব্যবসায়ীরাও আসে। তারা থাকে বেশ কিছুদিন ধরে। গাছ কাটা সারা হলে একদিন চলেও যায়। বেশিদিন ধরে থাকে শুধু ফরেস্ট অফিসাররা। উপজাতীয়দের চোখে এরা এখন অমঙ্গলের চর। দেবতা এদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। দেবতার অভিশাপ এদের ওপর অমোঘ হয়ে দেখা দিয়েছে। রেগে গেছেন দেবতা, আর তাই 'বিশ্বাবুনের' [বিশালবনের] ওপর নেমে আসছে একের পর এক ভয়ঙ্কর শাস্তি। এ পর্যন্ত তিনজন সভ্য মানুষকে তেনারা সাজা দিয়েছেন। আর শুরু হয়ে গেছে অলৌকিক সব ক্রিয়াকাণ্ড। কালো ছায়া-মূর্তি জঙ্গলে

জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। রাতে শোনা যায় অদ্ভুত সব রহস্যময় শব্দ। দেখা যায় ভৌতিক আলো। এ সবই দেবতাদের মানুষকে ভয় দেখাবার উপায়। ভয় দেখাচ্ছেন মানে মানুষকে সাবধান করে দিচ্ছেন। কেউ যদি তা না মানে তাহলে তাকে চরম শাস্তি পেতেই হবে। কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না।

উপজাতীয়রা তাই পরামর্শ সভা ডেকেছে। গুরুতর আলোচনা হচ্ছে দেবতাদের কিভাবে সন্তুষ্ট করা যায় তার উপায় উদ্ভাবনের জন্যে। ভয় ওদের মনের মধ্যে জমাট মেঘের মতো অবিচল দাঁড়িয়ে থেকে গর্জন করছে। অভিশাপ দিচ্ছে ওরা সভ্য মানুষদেরকে। অমঙ্গল ডেকে এনেছে তারা। কে বলতে পারে তারাও ছারখার হয়ে যাবে কিনা?

বুড়ো সর্দার আতাকু ভীষণ ভয় পেয়েছে। দেবতাদের সন্তুষ্টি বিধানের আগে সভ্য মানুষদের সঙ্গে তাদের নতুন সম্পর্ক কি হবে সে ব্যাপারেই সে বেশি চিন্তিত। কিন্তু বুড়ো মানুষ বলে উত্তেজিত হয়ে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তাকে খুব চিন্তামগ্ন দেখাচ্ছে, একটি কথাও এ পর্যন্ত তার মুখ থেকে বের হয়নি। আদিবাসীরা হাঁটু গেড়ে বসে হৈ-চৈ করছে প্রবল উত্তেজনায়।

ছোট্ট স্টেশন বিশালপুর। ট্রেন মিনিটখানেকের বেশি দাঁড়ায় না। শহর বলতে স্টেশনের চারপাশটাকেই বোঝায়। দুটো পানবিড়ির দোকান, একটা চায়ের দোকান, দুটো কি তিনটে রিকশা, একটা ঠেলাগাড়ি, বইয়ের দোকান একটা এবং স্টেশন মাস্টার ও রেলওয়ে কর্মচারীদের ছোটো একটা একতলা কোয়ার্টার নিয়ে বিশালপুর শহর। পাকা বাড়ি আছে বটে চার-পাঁচটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে, কিন্তু তাতে লোকজন থাকে না। শহরের লোক এখানে বাস করার কথা ভাবতে পারে না। কখনও-কখনও এসে দু'চারদিন কাটিয়ে যায় হয়তো, আমোদ ফুর্তি করে, শিকার করে, হাওয়া বদলাতেও আসে কেউ কেউ। নিম্নশ্রেণীর কিছু ছন্নছাড়া লোক থাকে বেড়ার ছাপড়া তুলে, কেউ বলতে পারে না কখন কে গাড়ি ধরে চলে যাবে কোথায়। কে পড়ে থাকতে চায় এই জংলী এলাকায়? লোকজন, গাড়িঘোড়া, আমোদ-ফুর্তি, আত্মীয়-স্বজন, কেউ নেই, কিছু নেই। কিসের আশায় পড়ে থাকবে লোক এখানে? ভালো না লাগলেই চলে যায় গাড়ি ধরে। আবার ভাগ্যান্বেষী দু'চারজন কপর্দকহীন ভুলক্রমে নেমেও পড়ে ছোট্ট এই স্টেশনটায়। কিন্তু কদিনেই হাজার বছরের পুরানো হয়ে যায় তার কাছে এই বিশালপুর। এখানে আর থাকতে চায় না।

বেলা এগারোটা।

লোকাল একটি ট্রেন এসে ইন করলো বিশালপুর স্টেশনে। মাত্র তিনজন যাত্রী নামলো গাড়ি থেকে। বলা ভালো, তিনজনের একটি দল। বিশালবনের নতুন ফরেস্ট অফিসার এলেন। সঙ্গে তাঁর সহকারী আর আর্দালী। বলাই বাহুল্য, নতুন এই ফরেস্ট

আগন্তুক, তার সহকারী আর আর্দালী যথাক্রমে আমাদের পূর্ব পরিচিত শখের গোয়েন্দা শহীদ খান, তার বন্ধু এবং সহযোগী কামাল এবং প্রভুভক্ত দশাসই গফুর। অবশ্য এই মুহূর্তে মি. সিম্পসনও এদের তিনজনকে দেখলে সনাক্ত করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। এমনই নিখুঁত হয়েছে এদের ছদ্মবেশ।

গাড়ি থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মের চতুর্দিকে অনুসন্ধিৎসু এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার দেখে নিলো শহীদ।

কামাল বললো, 'জায়গাটা একেবারে যাচ্ছে তাই বলে মনে হচ্ছে। এখন প্রায় দুপুর, অথচ কি রকম জনশূন্য, দেখেছিস!'

শহীদ বললো, 'ভালোই তো, কদিন বেশ নিরিবিলি থাকা যাবে।'

কামাল নিচু স্বরে বললো, 'শহীদ খান যেখানে থাকবে সেখানে নিরিবিলি থাকবার উপায় কি?'

'চুপ!' ভর্ৎসনা ফুটে উঠল শহীদের কণ্ঠে।

কামাল শহীদের দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরলো। দেখলো একটা লোক এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

সামনে এসে দাঁড়ালো লোকটা। রোগা পাতলা চেহারা। দেখে মনে হয় যেন মন ভালো নেই,জড়োসড়ো হয়ে আছে কেমন। শহীদের উদ্দেশে মুখ খুললো লোকটা, 'স্যার, আপনি মিস্টার রুহুল আমিন, নতুন ফরেস্ট অফিসার বিশালবনের, না?'

'হাঁ,' লোকটির চোখে চোখ রেখে শহীদ বললো, 'তোমার নাম তিতু? ড্রাইভার?'

'জ্বী হাঁ।'

উত্তর দিয়ে লোকটা শহীদের দিকে কেমন আচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে রইলো।

ধমকে উঠলো শহীদ , 'কি দেখছো?'

সঙ্গে সঙ্গে কয়েক পা পিছিয়ে গেল লোকটা। চোখ নামিয়ে থতমত খেয়ে বললো, 'কিছু না, স্যার, এমনি···মানে, কিছু মনে করবেন না, স্যার!'

শহীদ কিছু বলার আগেই কামাল বললো, 'কি ব্যাপার, তুমি কি মারামারি করতে অভ্যস্ত নাকি? তোমার প্যান্টে রক্তের দাগ কেন? নিশ্চয়ই তুমি মদ খেয়ে মারামারি করেছো?'

'মদ আমি খাই না, স্যার।'

'তবে?'

'একটা পাগল লোকের জন্যে আমার এই দুরবস্থা, স্যার।' ড্রাইভার তিতু মিয়ার কণ্ঠে রীতিমত উষ্মার ভাব, 'লোকটা আমাকে জ্বালিয়ে মারলো।'

'কে লোকটা, নাম কি তার?'

'নাম-টাম জানি না, স্যার।' তিতু মিয়া হাত নেড়ে বললো, 'উনি হোসেন সাহেবের বন্ধু বলে নিজের পরিচয় দেন। সারাদিন বন-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান। আল্লা মালুম, কেন এখানে এসে আমার মাথার ওপর ভূতের মত সওয়ার হয়ে বসেছেন।'

'এই হোসেন সাহেবটা কে?'

'আপনারা জানেন না? আপনার আগে উনিই তো ছিলেন এখানকার করেস্ট অফিসার।'

'ওহ–হ্যাঁ, হোসেন সাহেব!' কামাল যেন হঠাৎ চিনতে পেরেছে এমন গলায় বললো, 'সত্যি এতো ভুলো মন আমার।' মালপত্র তুলে নিয়ে সকলে জীপে চড়ে বসতে ড্রাইভার স্টার্ট দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে বললো, 'স্যার, আপনি গাড়ি চালাতে জানেন?'

'একথা জানতে চাইছো কেন?' শহীদ জিজ্ঞেস করলো।

ড্রাইভার বিনীত কণ্ঠে যেন প্রার্থনা করলো, 'আমাকে এখান থেকে চলে যেতে দিন, স্যার! বিশালবনে থাকলে আমি মরে যাবো। আমার চাকরি আজ থেকে আপনার আণ্ডারে, তাই আপনি অনুমতি দিলেই আমি চলে যেতে পারি।'

'কিন্তু তুমি মরে যাওয়ার কথা বলছো কেন? বিশালবন কি খুব খারাপ জায়গা?' কামাল ড্রাইভারের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

ড্রাইভার উত্তর দিলো না। একমনে গাড়ি চালাতে লাগলো।

'আচ্ছা, এই পাগলাবাবুর আস্তানাটা কোথায় বলতে পারো?' শহীদ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো।

'আমার সঙ্গেই থাকেন। কিন্তু কখন থাকেন, কখন থাকেন না, তা ঠিক জানি না। রাতদিন জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান, বই পড়েন, গুম মেরে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকেন, নাওয়া–খাওয়ার কোনো সময় নেই, তাই তো আমি ওর নাম রেখেছি পাগলাবাবু।'

'কবে থেকে তোমার সঙ্গে আছেন উনি?'

'দিন সাতেক হলো এসেছেন।'

'কোথা থেকে এসেছেন বলতে পারো?'

'না।'

'কেন এসেছেন? তার কেউ আছে নাকি এখানে?'

'কেউ না।'

'তবে?'

'জানি না, স্যার। আমি জানি না, আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না দয়া করে।'

ড্রাইভারের এহেন আচরণে অবাক না হয়ে পারে না শহীদ। কিন্তু সে আর কিছু জিজ্ঞেসও করে না।

ইট–বিছানো রাস্তা ধরে গাড়ি দ্রুত চলছে, চারপাশে ঝোপঝাড়ের সমুদ্র। কোথাও ছোটো ছোটো টিবি দেখা যাচ্ছে। দু'পাশে খোলা মাঠও আছে। কিন্তু পাঁজা করে রাখা লাখ লাখ ইট সাজিয়ে মাঠের চিহ্ন মুছে ফেলা হয়েছে। এতক্ষণ একটি মানুষেরও দেখা পায়নি ওরা। পৃথিবীর কোথাও এমন নির্জন জায়গা থাকতে পারে মেনে নিতে বাধে।

'তুমি কতদিন আছো বিশালবনে?' শহীদের গলা শোনা গেল আবার।
'সাতমাস হবে, স্যার।'
'তবে তো বিশালপুর তোমার খুব চেনা।'
মাথা নেড়ে চুপচাপ থাকলো তিতু মিয়া।
আর কেউ কোনো কথা বলছে না দেখে গফুর জিজ্ঞেস করলো, 'বাজারটা কোনদিকে, তিতু মিয়া?'
'স্টেশন থেকে মাইল খানেক পুবে,' ড্রাইভার রাস্তার ওপর থেকে চোখ না ফিরিয়েই বললো, 'নামমাত্র বাজার, কিছু পাওয়া যায় না তেমন।'
'বাজারে কিছু পাওয়া যায় না। এটা আবার কেমন কথা,' যেন খুবই অবাক হয়েছে এমন গলায় বললো গফুর, 'লোকে খায় কি তবে?'
'লোকই নেই বিশালপুরে,' গফুরের কথায় একটু হেসে বললো ড্রাইভার।
'কেমন কথা তোমার, তিতু মিয়া!' গফুর অবাক কণ্ঠে বললো, 'এই তো সাহেবরা এসেছেন, এনারা যদি কিছু খেতে চান তো আমি কি করবো?'
'সে তোমাকে ভাবতে হবে না,' ড্রাইভার বললো, 'টাকা খরচ করতে পারলে এখানে পাওয়া যায় না এমন কিছু নেই।'
গফুরের পিছনে বসেছিল কামাল, গফুরের কথা বলার ধরন দেখে নিঃশব্দে হাসতে লাগলো সে।
'তোমার নামটা কি তা তো জানা হলো না,' ড্রাইভার গফুরের পানে তাকিয়ে বললো।
'আমার নাম বশির আলী,' গফুর স্বাভাবিক কণ্ঠেই বললো, 'আমি সাহেবের আর্দালী, বাড়ি খুলনা।'
ড্রাইভার বললো, 'তা তোমার কোনো ভাবনা নেই, বশির আলী, এখানকার আদিবাসীরা ফরমায়েশ দিলে রোজই মুরগী এনে দেবে, অসংখ্য বনমুরগী পাওয়া যায় এখানে, ফলমূল তরিতরকারিও আছে।'
'আদিবাসীরা কেমন লোক, তিতু?' কামাল হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো।
'লোক ভালো। কিন্তু…'
'কিন্তু কি?'
'আজকাল ওরা সভ্য মানুষকে ভালো চোখে দেখে না, স্যার।'
শহীদ বললো, 'কেন?'
'ওরা বলে, সভ্য মানুষেরা নাকি অমঙ্গলের চর।'
'এ রকম মনে করার কারণ কি?'
'কারণ আছে, স্যার।'
'কি কারণ? খুলে বলছো না কেন?' অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেলো শহীদের কণ্ঠে।
ড্রাইভার হঠাৎ কেমন যেন দমে গেল। চুপচাপ গাড়ি চালাতে লাগলো। যেন আর

কোনো কথা বলতে রাজি নয় সে।

'কই, বলো?' শহীদ আবার বাঘা উকিলের মতো জেরা করার ভঙ্গিতে তাকে জিজ্ঞেস করলো।

ড্রাইভার তিতু মিয়া কিন্তু চুপ করেই রইলো। কোনো কথা বললো না আর।

ইতিমধ্যে রাস্তা শেষ হয়েছে। গাড়ি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে ঝাঁকুনি খেতে খেতে। উঁচু নিচু মেঠো পথ। গতি বাড়ানো যাবে না গাড়ির। এভাবেই এগোতে হবে। ভরদুপুর বেলাতেও আলো যথেষ্ট নয়। মনোযোগ সহকারে না চললে যে কোনো মুহূর্তে একটা বিপর্যয় ঘটতে পারে।

কামাল ড্রাইভারকে হঠাৎ চুপ করে যেতে দেখে কিছু বলতে যাচ্ছিলো। শহীদ সেটা বুঝতে পেরে নিঃশব্দ ইঙ্গিতে তাকে থামিয়ে দিলো। বাকি পথটুকু আর কোনো কথা হলো না। সবাই মগ্ন যে যার চিন্তায়। কেউ লক্ষ্য করলো না একজন লোক গাছের মাথায় বসে তীব্র দৃষ্টিতে ওদের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। গাঢ় সবুজ রঙের জীপটা দূরের মোড়ে হারিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সে তাকিয়ে রইলো নির্ণিমেষে।

ওরা যখন বাংলোতে পৌঁছলো তখন বেলা দেড়টা বাজে। রান্না-বান্নার ব্যবস্থা করার কোনো দরকার নেই। দুপুরের খাবার ওরা সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছে। গফুর মোটঘাট নামিয়ে খুলতে লেগে গেল। ড্রাইভার বাংলোর শেষ মাথায় তার ঘরে চলে গেল সবকিছু বুঝিয়ে দিয়ে।

দুটো ঘর মোটে ফরেস্ট অফিসারের জন্যে। একটি বেডরুম, অপরটি কিচেন হিসেবে ব্যবহার করা চলে। ঠিক হলো শহীদ আর কামাল থাকবে এক ঘরে, গফুর শয্যা পাতবে রান্নাঘরেই।

ড্রাইভারের কাছ থেকে চাবি নিয়ে প্রথমেই ডান দিকের ঘরটা খুলে ফেললো শহীদ। মালপত্তর সেই ঘরেই ঢোকানো হলো। দুটো মাত্র দরজা ঘরটার। একটা খুলে বারান্দায় বের হওয়া যায়, আর একটা দরজা পাশের ঘরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

শহীদ মাঝখানের দরজাটা খুলে পাশের ঘরে প্রবেশ করলো। পিছনে কামাল। এ ঘরটা আগেরটার চাইতে আকারে বেশ বড়। খাট, কাঠের টেবিল, একটা শেলফ, দুটো হাতলওয়ালা চেয়ার আর একটা ইজি চেয়ার ঘরটার মধ্যে। এতগুলো আসবাব থাকা সত্ত্বেও ঘরটা কেমন খালি খালি লাগছে।

'ঘরটা বেশ বড় রে,' শহীদ চারপাশে তাকাতে তাকাতে বললো।

'কিন্তু পাথরের দেয়াল কেন?' কামাল জিজ্ঞেস করলো।

'নিশ্চয়ই মজবুত করার জন্যে,' শহীদ ঘরময় ঘুরতে ঘুরতে বললো।

'ঘরটাতে মোটে দুটো জানালা, তাও বেশ কিছুটা ওপরে। জানালার লোহার রডগুলো অতিরিক্ত মোটা, শক্ত আর মজবুত। কামাল জানালার পাল্লাগুলো খোলা শেষ

করে বারান্দার দিককার দরজাটা খুলেই সামনে ড্রাইভার তিতু মিয়াকে দেখতে পেয়ে ভ্রূ কুঁচকে বললো, 'তুমি?'

'পাগলাবাবু নেই, স্যার, আশেপাশে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনো হদিস পেলাম না।'

এমন সময় শহীদ ঘর থেকে বের হয়ে এলো। তার চোখমুখে বিরক্তির ছাপ সুস্পষ্ট। ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে শহীদ বললো, 'ঠিক আছে, ফিরে এলে খবর দিও।'

মাথা নেড়ে ঘুরে দাঁড়ালো ড্রাইভার। তারপর হঠাৎ কি মনে করে পিছন ফিরে বললো, 'আমার কথা কি ভাবলেন, স্যার?'

'এখনও কিছু ভাবিনি, ভেবে দেখি তারপর তোমাকে জানাবো,' শহীদ বললো।

শ্লথ পদক্ষেপে ধীরে ধীরে চলে গেল ড্রাইভার। কামাল একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। শহীদ কামালের কাঁধে হাত রেখে মৃদু হেসে বললো, 'তিতু মিয়ার সঙ্গে কথা বলার সময় উত্তেজিত হওয়াটা ঠিক হবে না।'

'তোর সন্দেহ হয় না লোকটাকে?' কামাল বললো, 'এমন বাজে একটা অজুহাত দেখিয়ে হাজির হওয়ার অর্থ কি? আমরা ওর পাগলাবাবুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে একেবারে পাগল হয়ে গেছি আর কি!'

'এ জন্যেই তোকে আমি উত্তেজিত হতে বারণ করেছি,' শহীদ কামালের দিকে তাকিয়ে ধীর কণ্ঠে বললো, 'আমার বিশ্বাস ও এখানকার ঘটনা সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানে, হয়তো সেজন্যেই এতো ভয় পেয়েছে। যাই হোক, তুই ওকে নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করিস না। আমাদের কাজের পক্ষে সেটা অসুবিধাজনক হয়ে উঠতে পারে।'

'তথাস্তু,' কামাল বললো। 'কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। এই পাগলাবাবু লোকটা কে, কি ওর পরিচয়, সব ছেড়ে এই নির্জন নির্বান্ধব পুরীতে এসে আছে কেন, উদ্দেশ্য কি লোকটার, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, তাই না?'

'সবই বোঝা যাবে ধীরে ধীরে,' শহীদ বললো, 'শুধু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে, আর কর্তব্যের কথা ভুললে চলবে না একমুহূর্তের জন্যেও।...কিন্তু যথেষ্ট হয়েছে আজকের মতো, তুই যা, গফুরকে খেতে দিতে বল, বড্ড খিদে পেয়েছে আমার।'

কামাল হেসে উঠে বললো, 'তুই আমার মনের কথাটাই বলেছিস। কখন থেকে মনে হচ্ছে কোথায় যেন কি একটা গোলমাল ঘটেছে। সেটা যে আন্ত্রিক তা কিছুতেই ঠাহর করে উঠতে পরিনি!'

কামালের কথা বলার ধরন দেখে হেসে উঠলো শহীদ। এমন সময় গফুর ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো।

'কি খবর বশীর আলী?' শহীদ গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলো।

'এখানে তো এখন কেউ নেই, দাদামণি, এখন আমি বশীর আলী হতে যাবো কোন দুঃখে।'

'নাহ্, তোকে নিয়ে আর পারা গেল না! আমার ভয় হয় তোর জন্যেই না আমাদের ছদ্মবেশ সব পণ্ড হয়ে যায়।'

'সে তুমি কিছু ভেবো না, দাদামণি,' গফুর একটুও না দমে বললো, 'লোকজনের সামনে আর্দালী হয়েই থাকবো। কোনো ভুল হবে না।'

'তা খাবার-দাবারের কদ্দুর বল দেখি,' কামাল জিজ্ঞেস করলো।

'খাবার তো দিয়েছি,' গফুর বললো, 'কিন্তু জানালাটা খোলা রাখলে চলবে না, দাদামণি।'

'কেন? জানালা খোলা রাখতে আপত্তি কিসের?'

'পাহাড় দেখলে আমার ভয় করে,' গফুর ভয়মিশ্রিত কণ্ঠে বললো, 'আর কালো মতো কি যেন একটা দেখলাম, ইয়া বড়...'

'কোথায়। এতক্ষণ বলিসনি কেন?' কামাল উত্তেজিত কণ্ঠে বললো, 'চল তো দেখি।'

বলতে বলতে কামাল দ্রুত ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লো। ওর পিছন পিছন শহীদ এবং গফুরও এলো। উঁচু পাহাড়ের ওপর ঘন গাছপালার দিকে আঙুল নির্দেশ করে গফুর বললো, 'ওই যে, ওইখানটায় কালো মতো বিরাট একটা...দেখলাম। ওইখানটায় নড়াচড়া করছিল, বড় একটা বাদুড়ের মতো, অতো বড় বাদুড় আমি জীবনে দেখি নাই, আমাকে দেখেই চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল।'

শহীদ আর কামাল বেশ কিছুক্ষণ গফুরের নির্দেশিত জায়গাটার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। মিনিট দশেক সময় কেটে গেল প্রায়। কিন্তু কিছুই চোখে পড়লো না ওদের।

'ও কিছু না, তোর চোখের ভুল,' শহীদ বললো।

'আমি পষ্ট দেখলাম যে!'

'ভূত-টুত হবে হয়তো,' কামাল বললো।

'আমারও সেরকম সন্দেহ হয়,' গফুর চিন্তিত কণ্ঠে বললো।

'জানালাটা খোলাই থাক,' শহীদ বললো। 'অনেক দিন ধরে ভূত দেখার ইচ্ছে আমার, সুযোগটা হাতের কাছে পেয়ে ছাড়া উচিত হবে না।'

খাওয়া-দাওয়ার পর একটু গড়িয়ে নিয়ে শহীদ যখন উঠলো তখন বেলা শেষ হয়ে এসেছে। কামাল ঘুমিয়ে পড়েছিল। গফুর মেতে ছিলো মুরগী রান্না নিয়ে। মুরগী দুটো ড্রাইভার তিতু মিয়া জোগাড় করে এনে দিয়েছে। দাদামণি ভালো খাবার পেলে খুশি হয়, গফুর জানে। আর দাদামণিকে খুশি করতে পারলে সে আর কিছু চায় না।

কাপড়-চোপড় পরা শেষ করে কামালকে ঘুম থেকে ডেকে তুললো শহীদ। তারপর রাইফেলটা ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করতে লাগলো।

'ওটা নিয়ে মেতে উঠেছিস যে হঠাৎ?' চোখ মুখ ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছতে মুছতে শহীদের হাতের রাইফেলটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো কামাল।

'আজ আর প্ল্যান মতো কিছু করার সময় হাতে নেই,' রাইফেলের নলের ভিতর এক চোখ রেখে বললো শহীদ, 'ভেবেছিলাম জঙ্গলটার চারপাশে একটু ঘুরে ফিরে দেখবো,কিন্তু আপাততঃ তা কালকের জন্যে তোলা থাক। তুই তৈরি হয়ে নে চটপট, বাংলোটার চারপাশটা একটু জরিপ করে নেবো আজ।'

'কিন্তু সেজন্যে রাইফেল সঙ্গে নেয়ার কি দরকার?' কামাল ট্রাউজার পরতে পরতে বললো।

'এ প্রশ্নের মানে কি, মি. রশীদ?' মৃদু হেসে শহীদ বললো, 'ফরেস্ট অফিসারের শিকার না করার অভ্যাসটা কি বেমানান নয়?'

ওর রসিকতা শুনে হেসে উঠলো কামাল। খানিক পর বেরিয়ে পড়লো দুজনে।

গভীর জঙ্গলে রাত কাটানো এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। পোকামাকড়ের একটানা অদ্ভুত সব শব্দ, হাওয়া লেগে গাছের ডালে ডালে ঘষাঘষির শব্দ, বন্য জন্তু-জানোয়ারের অদ্ভুত ডাক, চিৎকার, নৈশ নিস্তব্ধতাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে যেন। কাছে পিঠে কোথাও ছুটোছুটি করছে শিয়াল, বনবিড়াল বা পাখা ঝাপটাচ্ছে বনমোরগ। ডেকে উঠছে রাত জাগা দু'একটা পাখি। এখানে পাহারাওয়ালার ডাক নেই, পথিকের বুটের শব্দ নেই, পুলিসের হুইসেলের শব্দ নেই, নেই যন্ত্রদানবের কর্ণপটাহবিদারণকারী শব্দ। উপভোগ করছিল শহীদ অদ্ভুত এই রাতটাকে।

এমন সময় আর্তমানুষের আতঙ্কিত চিৎকার নৈশ রাত্রির সমস্ত শব্দকে ছাপিয়ে শহীদের কানে এসে বাজলো। সচকিত হয়ে উঠলো সে। শব্দটা যেমন সহসা জেগে উঠেছিল তেমনি আবার কয়েক নিমেষের মধ্যেই নিস্তব্ধ হয়ে গেল। বিচিত্র সব শব্দ আবার শোনা যেতে লাগলো।

'শুনেছিস?' কামালের গলা শুনতে পেলো শহীদ।

'হুঁ,' শহীদ বললো। কামালও যে শব্দটা শুনেছে বুঝতে পারলো সে।

হঠাৎ বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো শহীদ। কামালও। সেভেন এম. এম. উইনচেষ্টার রাইফেলটা মাথার বালিশের কাছেই আড়াআড়ি রাখা ছিলো, সেটা তুলে নিলো শহীদ। তারপর দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। পাঁচ ব্যাটারির টর্চটা জ্বালালো একবার। পরক্ষণেই শহীদ গম্ভীর গলায় ডাক দিলো, 'কে?'

'আমি স্যার! তিতু...'

'কি করছো তুমি ওখানে?'

'আপনারা শোনেননি, স্যার? ওদিকটায় পাগলাবাবুর চিৎকার শুনলাম যেন, তাই বেরিয়ে এসেছি ঘর থেকে...'

তিতু মিয়ার গলার স্বরে চাপা উত্তেজনা প্রকাশ পাচ্ছে।

'তুমি ঠিক জানো ওটা পাগলাবাবুরই চিৎকার?' শহীদ জিজ্ঞেস করলো।

'আমার কোনো ভুল হয়নি, স্যার। হলফ করে বলতে পারি ও চিৎকার পাগলাবাবুর

ছাড়া আর কারও নয়।'

'উনি কি আজ একবারের জন্যেও ফেরেননি?'

'না, স্যার। আজ সকাল থেকে ওনার দেখা পাইনি আর। তাছাড়া শুধু আজ নয়, রোজ রাতেই উনি এরকম বাইরে বাইরে কাটান।'

'আর কখনও এ রকম চিৎকার শুনেছো?' কামাল শহীদের ঘাড়ের পাশ থেকে বলে উঠলো।

'না, স্যার।'

'শব্দটা এলো কোনদিক থেকে বলতে পারো?'

ড্রাইভার জঙ্গলের ডানদিকের অন্ধকারে তাকিয়ে থেকে বললো, 'ডানদিক মনে হলো, স্যার।'

'আমারও তাই মনে হলো যেন,' কামাল বললো।

'আসুন মিস্টার রশীদ, দেখা যাক।' শহীদ কামালের উদ্দেশে কথাটা বললো।

কামাল টর্চ হাতে এগোলো শহীদের পাশাপাশি। বেশিদূর যেতে হলো না। প্রায় একশো গজ দূরে দেখা গেল একটা লোককে মাটিতে পড়ে থাকতে। কামাল টর্চের আলো ফেলতে দেখা গেল লোকটি মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে আছে। মরেনি। কোথায় আঘাত পেয়েছে তা-ও ঠিক বোঝা গেল না। গোঁ গোঁ করে একটা শব্দ বের হচ্ছে লোকটার নাকমুখ দিয়ে।

ড্রাইভার তিতু মিয়া সামনে এগিয়ে এসে বললো, 'ইনিই পাগলাবাবু, স্যার।'

রাইফেলটা কামালের হাতে দিয়ে হাঁটু গেড়ে লোকটার পাশে বসে পড়লো শহীদ।

পায়ে জখম হয়েছে লোকটার। গুরুতর কিছু নয়। হাঁটুর সামান্য নিচে কিছুটা চামড়া ছড়ে গেছে। রক্ত ঝরছে এখনও।

ধরাধরি করে লোকটাকে ড্রাইভারের ঘরে তুলে আনা হলো। শহীদ অবশ্য এলো না সঙ্গে। সে অকুস্থলেই রয়ে গেল।

টর্চের উজ্জ্বল আলোয় কামাল দেখলো, না কামানো দাড়ি গোঁফ, চোখে অত্যন্ত ভারি পাওয়ারের চশমা, মাথায় পাহলওয়ানী ছাঁটের চুল, চোখে পিচুটি এবং অদ্ভুত বেঁটে ও রোগা শরীরের একটি মানুষ এই পাগলাবাবু। বয়স চল্লিশের কম নয়।

মিনিট দশেক পর ঘর থেকে ফার্স্ট-এইডের বাক্সটা নিয়ে চিন্তিত মুখে হাজির হলো শহীদ।

জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল আহত লোকটা। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য চোখে-মুখে পানি ছিটাতেই জ্ঞান ফিরে এলো। ড্রাইভার তিতু মিয়াই প্রথম প্রশ্ন করলো, 'কি হয়েছিল আপনার?'

লোকটা সে কথার উত্তর না দিয়ে শহীদ ও কামালের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। তারপর হঠাৎ বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলে উঠলো, 'আমাকে উঠে বসতে দিন, আর আপনারা সবাই ঘর থেকে বের হয়ে যান।'

শহীদ কিন্তু একটুও বিচলিত না হয়ে বিছানার দিকে এগিয়ে এসে বললো, 'তার আগে পরিচয় দিন মিস্টার…'

লোকটা সেই রকম ভারিক্কি চাল বজায় রেখে বললো, 'আমার নাম খোন্দকার হাবিবুর রহমান। আর আপনাদের পরিচয় আমার অজানা আছে ভেবেছেন? ফরেস্ট অফিসার আর তার সহকারী—তাই নয় কি? কিন্তু আমার পরিচয় এখনও আপনারা জানেন না নিশ্চয়–জানলে আমার হুকুম অমান্য করার স্পর্ধা আপনাদের কখনই হতো না। আমার পরিচয়ঃ আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। বিশালবনের জঙ্গলে মাকড়সা–রহস্য বের করার দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসেছি—বুঝতে পেরেছেন? এখন যেতে পারেন আপনারা।'

কামাল শহীদের মুখের দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে ছিলো। মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এতো রাতে আপনি ওখানে কি করছিলেন, মিস্টার খোন্দকার?'

খোন্দকার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললো, 'আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি আইনতঃ বাধ্য নই।'

কামালের মুখে আর কথা জোগালো না।

শহীদ কামালকে মিস্টার খোন্দকারের জখমটা দেখিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দেবার ইঙ্গিত করে বললো, 'আপনি একজন ডিটেকটিভ এ কথা জানতে পেরে খুব খুশি হলাম মিস্টার খোন্দকার। কেননা, এখানে আসবার আগে শুনেছিলাম পরপর তিনজন ফরেস্ট অফিসার নাকি বিষাক্ত মাকড়সার কামড়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। এখনও যদি এই বিষাক্ত মাকড়সা এই বাংলোর আশপাশে থেকে থাকে তবে সেটা বড় আশঙ্কার কথা। চাকরির জন্য এই জংলী দেশে এসে শেষ পর্যন্ত কি প্রাণ হারাবো! তা আপনি তো একজন ডিটেকটিভ, যাকে বলে কি না গোয়েন্দা। আপনি মাকড়সা–রহস্য ভেদ করতে এসেছেন জানতে পেরে খুব খুশি হলাম। আপনি বিষাক্ত মাকড়সা সমূলে ধ্বংস করতে সমর্থ হবেন আশা করি! আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে আপনাকে যতটুকু পারি সাহায্য করবো। কিন্তু কিছুক্ষণ আগেকার ঘটনাটির কোনো হদিসই আমি করতে পারছি না, মিস্টার খোন্দকার। আপনি বুঝি মাকড়সা ধরতে বেরিয়েছিলেন এতো রাতে? কিন্তু আপনার পায়ে রক্ত কেন? কিভাবে জখম হলেন?'

'আপনি ডিটেকটিভদের সম্বন্ধে সামান্যতম জ্ঞানও রাখেন না দেখছি, মিস্টার রুহুল আমিন। ডিটেকটিভরা মূলানুসন্ধান করে থাকে, গৌণ ব্যাপারে তাদের কোনো দায়িত্ব নেই,' মিস্টার খোন্দকার অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলেন।

ভালমানুষের মতো মুখ করে শহীদ বললো, 'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না, মিস্টার খোন্দকার।'

মুখে বিজ্ঞের হাসি ফুটিয়ে মি. খোন্দকার বললেন, 'সেটা আপনার বোঝার কথাও নয়। কিন্তু আপনার সাহায্য আমার দরকার, মিস্টার রুহুল আমিন। আপনি আমায় সাহায্য করবেন আশা করি।'

'নিশ্চয়। সে কথা তো আমি আগেই শুনিয়েছি আপনাকে। আর সে জন্যেই তো, যে ভয়ঙ্কর ঘটনাটা কিছুক্ষণ আগে ঘটেছে সে সম্পর্কে জানতে চাইছি আপনার কাছে।'

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। মিস্টার খোন্দকার উঠে বসলেন বিছানার উপর। চশমাটা ঠিক করে নাকে লাগিয়ে নিলেন একবার, তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'এক গ্লাস পানি।'

খানিক পরে ড্রাইভার তিতু মিয়া এক গ্লাস পানি নিয়ে এসে দাঁড়ালো। মিস্টার খোন্দকার তাকে ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, 'আমি বলেছি না তুমি আমাকে কিছু খেতে দেবে না। যাও, নিয়ে যাও তোমার পানি।'

ওরা সবাই দাঁড়িয়ে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলো। ড্রাইভার ঠকাস করে টেবিলের ওপর গ্লাসটা নামিয়ে রেখে একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ালো। মিস্টার খোন্দকার চিৎকার করে উঠলেন, 'লোকটাকে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে বলুন তো, মিস্টার রুহুল আমিন।' না, না আমিই হুকুম দিচ্ছি, 'এই, তুমি বের হয়ে যাও ঘর থেকে, এখুনি!'

শহীদের ইঙ্গিতে তিতু ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেল। মিস্টার খোন্দকার শহীদের দিকে সরে এসে ফিসফিস কণ্ঠে বললেন, 'লোকটাকে বিশ্বাস করি না। আমার বিশ্বাস মাকড়সা-রহস্যের পিছনে ওরও একটা ভূমিকা আছে। অনেক কিছু জানি আমি ওর সম্পর্কে। মনে রাখবেন, আমাকে সাহায্য করতে হলে আমার উপদেশ মতো চলতে হবে আপনাকে। আমার প্রথম উপদেশঃ ড্রাইভার তিতু মিয়া লোকটাকে বিশ্বাস করবেন না মোটেই। দ্বিতীয় উপদেশঃ মনে প্রাণে বিশ্বাস করবেন মাকড়সার কামড়ে যে তিনজন ফরেস্ট অফিসার মৃত্যুবরণ করেছেন তাদেরকে সুপরিকল্পিত ভাবে হত্যা করা হয়েছে। কোনো রকম দুর্ঘটনায় তাদের মৃত্যু হয়নি।'

কথাটা শুনে শহীদ যথাযথ স্তম্ভিত হবার ভান করলো।

'দেয়ালেরও কান আছে...'

কথাটা বলে মিস্টার খোন্দকার প্রায় শোনা যায় না এমন নিচু গলায় বলতে শুরু করলেন তাঁর কথা।

লোকটার রকম-সকম দেখে হেসে ফেলা উচিত হবে কি না তা ভেবে ঠিক করতে না পেরে কামাল অস্থির হয়ে উঠলো। ততক্ষণে মিস্টার খোন্দকার শহীদের কানের কাছে মুখ সরিয়ে নিয়ে গিয়ে কি যেন বলছেন। মিনিটখানেক ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলো শহীদ কান পেতে। মিস্টার খোন্দকার তখনও ঠোঁট নাড়ছেন কানের কাছে। শহীদ হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বললো, 'আপনার কথা কিছুই শুনতে পাচ্ছি না, মিস্টার খোন্দকার... বাঘ দেখলেন...বাঘটা আপনাকে কিছু না বলে আপনার পিছন পিছন আসছিল, তারপর আপনি আত্মরক্ষার জন্য গাছে চড়তে গিয়ে পড়ে যান। তারপর? তারপর কি হয়েছিল— একটু স্পষ্ট করে বলুন দিকি তারপর কি হয়েছিল।'

শহীদের কথা শুনে মিস্টার খোন্দকার যেন হতবাক হয়ে গেলেন।

'স্পষ্ট করে বলবো!'

শহীদ বললো, 'মানে একটু জোরে বলুন এরপর যা আপনার বলার আছে। একদম শুনতে পাচ্ছি না যে!'

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন মিস্টার খোন্দকার। চাপা গলায় বললেন, 'আমি আপনাকে সব কথা জোরে জোরে বলি আর ড্রাইভারের ছদ্মবেশে ওই লোকটা জেনে ফেলুক আমার ধারণাগুলো।…না, আপনাকেও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। সাবধান! রেহাই পাবেন না আমার হাত থেকে। কোনো সুযোগ নিতে চেষ্টা করলে ফল ভালো হবে না মনে রাখবেন।'

মিস্টার খোন্দকার চট করে এক লাফে ঘরের কোণে সরে গিয়ে চিৎকার করে উঠলেন। শহীদ হতভম্বের মতো মুখ করে তাকিয়ে রইলো লোকটার দিকে।

আবার শুরু হলো, 'সন্দেহ আমার হাড়ে মজ্জায় মিশে আছে। নতুন ফরেস্ট অফিসার আসছে শুনে গাছের মাথায় চড়ে আগেই দেখে নিয়েছি সব। তখনই কেমন সন্দেহ হয়েছিল আমার…এই মুহূর্তে ঘর ছেড়ে বের হয়ে যান, নয়তো…'

চিৎকার শুনে ড্রাইভার তিতু মিয়া ঘরে এসে ঢুকেছিল। কামাল ও শহীদকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ব্যাপারটা বুঝে নিলো সে। তারপর নিজের মাথায় আঙুল ঠেকিয়ে ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইলো, 'মাথা খারাপ।'

'যান বলছি! বেরিয়ে যান এখুনি!'

নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো শহীদ। কামালও তার পিছু নিলো। সেই সঙ্গে একটি ছায়ামূর্তি ঘরের জানালাটার পাশ থেকে সরে দাঁড়ালো। ভয়ঙ্করদর্শন ছায়ামূর্তিটার কুটিল দৃষ্টির আওতায় এতক্ষণ ওরা বসে ছিল, কিছুই জানতে পারলো না।

ঘরে ফিরে ঘড়ি দেখলো শহীদ। রাত তিনটে বাজে।

'শুয়ে পড়, রাত শেষ হয়ে এলো প্রায়,' শহীদ বললো কামালের দিকে তাকিয়ে।

'ঘুম আসবে না আমার,' কামাল বললো, 'গফুরকে উঠিয়ে চা করতে বলবো ভাবছি।'

শহীদ বললো, 'আমি ঘুমোবো। তুই গফুরকে উঠিয়ে চায়ের কথা বলতে পারিস। রাত জাগার জন্য চা খুব ভালো।' তারপর বললো, 'তার চেয়েও ভালো কয়েকটা কথা বলি তোকে। কথাগুলো শুনলে একদম ঘুম আসতে চাইবে না। মিস্টার খোন্দকার কয়েকটা মিথ্যা কথা বলেছেন এবং কয়েকটা ব্যাপার লুকিয়ে রেখেছেন ইচ্ছাকৃতভাবে।'

'বলিস কি! ধরলি কি ভাবে?'

'এই দেখ…'

শহীদ পকেট থেকে একটা বুলেটের খোল বের করে কামালের হাতে দিলো। তারপর খাটের তলা থেকে বের করে আনলো একটা মরা মানুষের মাথার খুলি। বললো, 'তোরা চলে আসার পর আমি পেয়েছি এ দুটো জিনিস। মরা মানুষের খুলি অবশ্য আশা করিনি। আর গুলির শব্দ আমরা কেউ শুনতে পাইনি বলে খোলটা আশাও করা যায় না

বটে, কিন্তু আঘাতটা দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম ওটা বুলেটের কাজ। পিস্তলে নিশ্চয় সাইলেন্সার লাগানো ছিলো। খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম বুলেটটা, আর মরা মানুষের খুলিটাও পেয়ে গেলাম সেই সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে।'

কামাল জিজ্ঞেস করলো, 'গুলিটা ছুঁড়েছিল কে?'

'কি করে বলি!'

'মরা মানুষের খুলিটাই ব কোত্থেকে এলো?'

'একই উত্তর আমারঃ বলতে পারি না এখনও কিছু।'

কামাল কতক্ষণ একদৃষ্টে শহীদের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, 'মিস্টার খোন্দকার সম্পর্কে কি ধারণা হলো তোর?'

শহীদ ধীরে ধীরে বললো, 'এরকম অদ্ভুত চরিত্রের লোক আমি খুব কম দেখেছি। কিন্তু ওর সম্পর্কে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি এখনও।'

'কিন্তু লোকটা মিথ্যা কথা বললো কেন? এ থেকে কিছু ধারণা করতে পারছিস না?'

কামালের অসহিষ্ণুতা দেখে হেসে ফেললো শহীদ। বললো, 'না, এ থেকেও কিছু ধারণা করতে পারছি না। কিন্তু লোকটা সম্পর্কে তোর কি ধারণা?'

'রহস্যজনক চরিত্রের লোক এবং বিপজ্জনকও বটে।'

শহীদ কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বললো, 'আমি কোনো মন্তব্য করতে চাই না। তবে, ড্রাইভার তিতু মিয়াকে দেখা অবধি মনে হচ্ছে কোথায় যেন দেখেছি লোকটাকে। কিছুতেই মনে করতে পারছি না—কোথায়।'

কামাল আর গফুরকে জাগায়নি। শহীদ বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়তে কামালও দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ পর তার অনুগামী হলো। তারপর দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লো অকাতরে।

তিন

সকালবেলা শহীদের ধাক্কায় কামালের ঘুম ভাঙলো। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলো কামাল, 'শোবার সময় দরজা বন্ধ করিসনি কেন?'

কামাল আশ্চর্য হয়ে বললো, 'কি বলছিস আবোল-তাবোল। দরজা আমি নিজের হাতে বন্ধ করে শুতে এসেছি।'

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে শহীদ বললো, 'ভালো করে স্মরণ করে দেখ দেখি, দরজা ঠিক বন্ধ করেছিলি তো?'

কামালের অসহিষ্ণু গলা শোনা গেল, 'কি শুরু করেছিস বলতো কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে! দু'তিন ঘন্টা আগের ব্যাপার আর এখুনি আমি ভুলে যাবো?'

শহীদ বললো, 'বেশ। কিন্তু তারপর আবার উঠেছিলি?'

'না।'

'তবে, দরজা খুললো কে?'

কামাল আশ্চর্য হয়ে বললো, 'তোর কি মাথা খারাপ হলো নাকি? দরজা তো বন্ধই রয়েছে দেখছি।'

শহীদ বললো, 'না, বন্ধ নেই। ছিটকিনি খোলা, শুধু ঠেলে ভিড়িয়ে রাখা হয়েছে পাল্লা দুটো।'

'তা কি করে সম্ভব?'

তড়াক করে খাট থেকে নামতে গেল কামাল। হঠাৎ শহীদ ওকে ধরে ফেলে বললো, 'মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখ।'

মেঝের দিকে চোখ পড়তে কামাল স্তম্ভিত হয়ে গেল। চোখ মুখে অবিশ্বাসের একটা রেখা মূর্ত হয়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। ঘরের সারা মেঝেতে মরে পড়ে রয়েছে কয়েক ডজন পাহাড়ী ইঁদুর। কামাল ভ্রূ কুঁচকে শহীদের দিকে তাকাতে শহীদ বললো, 'এবার টেবিলের ওপর চেয়ে দ্যাখ।'

হতবাক হয়ে গেল কামাল। দেখলো, টেবিলের ওপর পাশাপাশি সাজানো রয়েছে মরা মানুষের দুটো করোটি।

'এ কি ভূতুড়ে কাণ্ড রে বাবা,' কামাল বললো।

কামালের কথার কোনো উত্তর না দিয়ে শহীদ সাবধানে খাট থেকে নেমে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো! বেশ কিছুক্ষণ জানালা ও দরজাগুলো পরীক্ষা করে শহীদ তার সিদ্ধান্ত জানালো।

'জানালা বা দরজা দিয়ে কেউ এ ঘরে প্রবেশ করেনি সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

কামাল এ কথার উত্তরে কিছু না বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো চেহারা করে তাকিয়ে রইলো শহীদের দিকে। তার যেন বাক স্ফূর্তি হচ্ছিলো না।

ঘন্টা দুয়েক পরের কথা।

ব্রেকফাস্ট সেরে কামাল উঠে দাঁড়ালো। শহীদ ওর দিকে তাকিয়ে বললো, 'কোথায় চললি?'

'সন্দেহ নিরসন করতে।'

'কিসের সন্দেহ?'

'মিস্টার খোন্দকার সম্পর্কে।'

শহীদ এ কথার কোনো উত্তর দিলো না দেখে কামাল বললো, 'তুই নিশ্চয় আপত্তি করবি না।'

হেসে ফেলে শহীদ বললো, 'না। কিন্তু তোর প্ল্যানটা কি?'

'ওর মতামত জানতে চেষ্টা করবো, অনুসরণ করবো ওকে।'

শহীদ বললো, 'বেশ। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ফিরবি কিন্তু। জঙ্গলটায় আজ একবার ভালো করে ঘুরে দেখবো ভেবেছি।'

মাথা নেড়ে বের হয়ে গেল কামাল।

কামাল বের হয়ে যেতেই শহীদ সোফা ছেড়ে পাহাড়ের দিককার জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো পাহাড়টার দিকে। হঠাৎ কি মনে করে দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো সে। ড্রাইভারকে ডেকে গাড়ি নিয়ে যেতে বললো স্টেশনের দিকে। সিগারেট আনতে হবে, বাজারও করে আনবে যা পাওয়া যায়।

গাড়ির শব্দ অনেক দূরে মিলিয়ে যেতে শহীদ ড্রাইভার তিতু মিয়ার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। পকেট থেকে চাবির গোছা বের করলো একটা। তারপর একটার পর একটা চাবি নিয়ে দরজার তালা খোলবার চেষ্টা করলো। পাঁচ-ছ'টি চাবি দিয়ে চেষ্টা করবার পর সফল হলো।

ঘরটা ছোটো। একটা মাত্র তক্তপোষ ঘরে। হাঁড়িকুড়ি, চুলো, টিনের কৌটো, ছোটো ছোটো দুটো ট্রাঙ্ক, একটা বড় ট্রাঙ্ক ইত্যাদি ঘরটার ভিতরে অগোছালো ভাবে রাখা। মনোযোগ দিয়ে দেখলো শহীদ ঘরটার চেহারা। দু'একটা জিনিস হাতে তুলে নেড়ে চেড়ে দেখলো। তারপর এক এক করে খুলে ফেললো সবকটা ট্রাঙ্ক। ছোটো দুটো ট্রাঙ্কের ভিতর উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই পেলো না সে। বড় ট্রাঙ্কটা খুলে ভিতরে হাত ঢোকাতেই আঙুলগুলো কেমন যেন পিছলে গেল। চোখের সামনে তুলে ধরলো শহীদ হাতটা। আশ্চর্য হয়ে দেখলো, তার হাতে সাদা পাউডার লেগে গেছে। ঝুঁকে পড়ে তাকালো শহীদ। দেখলো, ট্রাঙ্কের সব জিনিসের ওপর ছড়ানো রয়েছে সাদা পাউডার।

শার্ট-প্যান্ট, কাগজপত্র, ছদ্মবেশ ধারণের সস্তা একধরনের ছেলেমানুষী সরঞ্জাম, এক বাণ্ডিল সরু দড়ি ইত্যাদি হরেক রকম জিনিসে ট্রাঙ্কটা ভরা। কাগজের বাক্সে ভরা একটা জিনিস দেখে প্রথমে চমকে উঠলো শহীদ। কিন্তু পরক্ষণে সেটা হাতে তুলে নিয়ে তার মুখে ফুটে উঠলো মৃদু হাসি। অসংখ্য বই দেখা গেল ট্রাঙ্কের সর্বশেষ স্তরে। বইগুলো দেখে আবার একবার হাসলো শহীদ আপন মনে। কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে একটা ঠিকানা পেলো শহীদ। একটা ডায়েরীও পেলো। ভিতরে নাম লেখাঃ মিস্টার হোসেন, ফরেস্ট অফিসার অভ বিশালপুর। চিরকুটে লেখা ঠিকানা আর ডায়েরীটা পকেটে রাখলো শহীদ। তারপর যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে তালা বন্ধ করে ফিরে এলো সে।

মিস্টার খোন্দকারকে বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুজি করার পর বিফল হয়ে ফিরে আসছিল কামাল। জঙ্গলের বেশ খানিকটা ভিতরে চলে গিয়েছিল সে। পথ চিনে ঠিক ঠিক ফিরে আসতে পারবে কি না সে সন্দেহও ছিলো মনে। হঠাৎ একটা গাছের ওপর নজর পড়তে চমকে উঠে থেমে গেল কামাল।

মিস্টার খোন্দকার একটা উঁচু গাছের ওপর বসে দূরের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখতে চেষ্টা করছেন। কামালকে তিনি দেখতে পাননি। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কামাল কিছুক্ষণ দেখলো মিস্টার খোন্দকারের মতিগতি। তারপর কাছাকাছি

একটা উঁচু গাছে চড়ে বসলো।

মিস্টার খোন্দকারের দৃষ্টি অনুসরণ করে কামাল কিছুই দেখতে পেলো না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বুঝতে পারলো যে লোকটা আসলে বাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, দেখতে পাবে এই আশায় এদিক ওদিক তাকাচ্ছে মাত্র।

কৌতূহলী হয়ে উঠলো কামাল। লোকটার সম্পর্কে এমনিতেই যথেষ্ট সন্দেহ জন্মেছে তার। অপেক্ষা করে দেখা যাক আর কতদূর কি জানা যায়।

সময় গড়িয়ে চললো। লোকটা তেমনি বসে আছে গাছের মাথায়। দৃষ্টি সবসময়ই তার দূরের দিকে। কি যে খুঁজছে লোকটা বোঝা যাচ্ছে না কিছুই। কামাল হঠাৎ লক্ষ্য করলো লোকটার হাতে কয়েকখানা সাদা কাগজ। কিছুক্ষণ পর পর কি যেন লিখছেন বলে মনে হলো তার।

ঘন্টা দেড়েক কাটলো এই ভাবে। ঘড়িতে তখন দুপুর দুটো বাজে। এমন সময় নামতে শুরু করলো লোকটা গাছ থেকে। ধীরে ধীরে অতি সাবধানে নামলো সে। মাটিতে পা দিয়ে কান খাড়া করে কি যেন শুনতে চেষ্টা করলো একমনে। এদিক ওদিক তাকালো সন্ধিগ্ধ দৃষ্টিতে। তারপর সতর্ক পায়ে এগিয়ে চললো।

গাছ থেকে নেমে কামালও অনুসরণ করলো মিস্টার খোন্দকারকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে নিরাশই হতে হলো। ঘন্টাখানেক লোকটাকে একনাগাড়ে অনুসরণ করার পর কামাল বুঝতে পারলো তারা এখন বাংলোর কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। মিস্টার খোন্দকার সম্পর্কে কি ধারণা করবে তা যেন কামাল ভেবে ঠিক করতে পারলো না।

পরদিন দুপুরবেলা মিস্টার খোন্দকারের চিৎকার শুনে ঘর থেকে বের হয়ে এলো শহীদ ও কামাল। ড্রাইভার তিতু মিয়ার গলাও শোনা যাচ্ছে। ধমক মারছে মিস্টার খোন্দকার ড্রাইভারকে। রেজায় চোটপাট শুরু করে দিয়েছে।

'কি হয়েছে সাহেব, এতো চিৎকার করছেন কেন?'

কামাল সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ওদের।

কাঁদ কাঁদ মুখ করে ড্রাইভার শহীদের সামনে এসে দাঁড়ালো।

'স্যার, আমি আজ থেকেই চাকরি ছেড়ে চলে যাবো। এই পাগলাবাবু আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছেন, আপনি আমায় দয়া করে রেহাই দিন।'

'কি বলছেন উনি?' শান্ত গলায় জানতে চাইলো শহীদ।

'দেখবেন, আসুন স্যার, কি অসম্ভব পাগলামী।'

ড্রাইভার তিতু মিয়া কথাটা বলে হাত নেড়ে ওদেরকে অনুসরণ করতে বলে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লো। পিছন পিছন ঢুকলো শহীদ, কামাল ও মিস্টার খোন্দকার।

মিস্টার খোন্দকার ড্রাইভার তিতু মিয়ার দিকে তীব্র অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সর্বক্ষণ। অন্য কোনো দিকে তাঁর মনোযোগ নেই।

ঘরের ভিতরে ঢুকে শহীদ দেখতে পেলো মেঝেতে দশ–বারোটা কাগজ ছড়ানো

রয়েছে। দেয়ালেও আঠা দিয়ে আঁটা রয়েছে কয়েকটা। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, সবগুলো কাগজেই আঁকা রয়েছে ছোটো বড় মাকড়সার ছবি।

ড্রাইভার তিতু মিয়া অসহায় কণ্ঠে অভিযোগ করলো, 'এই যে স্যার—এই মাকড়সার ছবিগুলো উনি এতক্ষণ আমাকে ঘাড় গুঁজে দেখতে বাধ্য করছিলেন। আমি যতোই বলি, আমি দেখবো না। উনি ততই রেগে ওঠেন। আচ্ছা, আপনিই বলুন স্যার…'

কঠিন গলায় মিস্টার খোন্দকার শহীদের দিকে চোখ ফিরিয়ে বললো, 'বিশ্বাস করবেন না, মিস্টার রুহুল আমিন, লোকটার কথা। সাইকোলোজিকেল পরীক্ষা ছিলো এটা আমার। ধরে নিতে পারেন আই হ্যাভ সাকসিডেড। আর ও যে এখান থেকে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে চায় সেটা একটা ভাঁওতা। খবরদার! ওকে যেতে দেবেন না! আর মাত্র কয়েকদিন পরই ওর বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ প্রমাণ করতে পারবো বলে আশা রাখি।'

শহীদ কোনো উচ্চবাচ্য করলো না। কামালও চুপ। ড্রাইভার তিতু মিয়া করুণ মুখ করে তাকিয়ে রইলো শহীদের পানে।

মিস্টার খোন্দকার হঠাৎ শহীদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, 'আমার কথা বুঝতে পারছেন না, তাই না? আচ্ছা, মিস্টার রুহুল আমিন, আমি আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি কি?'

শহীদ নিঃশব্দে ঘাড় দোলালো।

'তবে চলুন আপনার ঘরে, শোনাবো আপনাকে ওর বিরুদ্ধে আমার অভিযোগের ভিত্তিগুলো।'

শহীদকে এক প্রকার ঠেলতে ঠেলতেই মিস্টার খোন্দকার ঘর থেকে বের করে আনলো।

ঘরের বাইরে পা রেখেই থমকে দাঁড়ালো শহীদ। দেখতে পেলো, গফুরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে অদ্ভুত আকৃতির দশ-বারো জন লোক। বেঁটে, কালো, লোহার মতো শক্ত মাংসপেশীর অধিকারী লোকগুলো। এরা জংলী অধিবাসী।

দ্রুত এগিয়ে গেল শহীদ একটা বিপদ আশঙ্কা করে। শহীদের পায়ের শব্দে ফিরে তাকালো লোকগুলো। গফুরকে ছেড়ে দিয়ে ওরা ঘুরে দাঁড়ালো একে একে।

দৈত্যের মতো একজন লোক সবাইকে ছাড়িয়ে শহীদের সামনে এসে দু'হাত সামনে দুলিয়ে চোখ কুঁচকে তাকালো। কি করা উচিত ভেবে পেল না শহীদ।

কয়েক মুহূর্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলো লোকটা শহীদকে। ভাঁটার মতো বড় বড় লাল চোখ লোকটার। কানে অসংখ্য তামার বালা, পরনে নেংটিমাত্র সম্বল, গলায় মোটা এবং ভারি একটা তামার ছোটো সাইকেলের চাকার মতো বস্তু। রং-বেরঙের মোতির মালাও পরেছে লোকটা। অস্বস্তিবোধে জর্জরিত হতে লাগলো শহীদ। এতক্ষণ একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি কেউ। আচমকা গম্ভীর গলায় ঘড় ঘড় করে উঠলো লোকটি, 'তু কেন

এসেছিস এখানে?'

কামাল ও ড্রাইভার ততক্ষণে শহীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ড্রাইভার ফিসফিস করে বললো, 'কথা বলার সময় হাসতে হবে, স্যার!' শান্ত ভাব না দেখালে চটে যাবে ওরা।

জংলী লোকটা হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠলো, 'তু কে বটে?'

ড্রাইভার তিতু মিয়া থতমত খেয়ে চুপ করে গেল। শহীদের মুখে একটু হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল। শহীদ মাথা ঝাঁকিয়ে বিনীত ভঙ্গিতে লোকটির দিকে তাকিয়ে বললো, 'কাজ কাম দেখা শোনা করতে এসেছি, জঙ্গলের মানুষের ভালো মন্দ দেখতে এসেছি। তোমরাই তো জঙ্গলের মানুষ, তোমাদের কোনো অসুবিধা থাকলে আমাকে বলবে, আমি সব শুনবো তোমাদের কথা, সবরকম সুবিধের ব্যবস্থা করে দেবো। বুঝতে পারছো তো আমার কথা?'

আদিবাসীরা মনোযোগ দিয়ে শুনলো শহীদের কথা। নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কি যেন আলোচনাও করলো। কিন্তু সর্দারের মতো লোকটা তখনও নিশ্চল। হঠাৎ সে উঠলো, 'তু হটে যা বাবু, সব্বোনাশ হবে, দেওতা গোসা হলো···তু হটে যা বাবু।'

লোকটি শেষের কথাগুলো বলে অনুরোধে যেন ভেঙে পড়লো।

পকেট থেকে সিগারেট বের করলো শহীদ। প্যাকেটটা লোকটার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ভালমানুষের মতো প্রশ্ন করলো, 'তোমার নাম কি?'

একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করে প্যাকেটটা নিয়ে লোকটি বললো, 'আতাকু নাম আছে। কিন্তুক, আমার কথা তু ফেলিস না বাবু, সব্বোনাশ হবে আমাদের—তু জানিস না···।'

অনেকক্ষণ পর আতাকু তার দলবল নিয়ে চলে গেল। আদিবাসী সর্দার সন্তুষ্ট হতে পারেনি মোটেই। শহীদ তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে এই জঙ্গলে থাকা না থাকাটা তার নিজের ওপর নির্ভর করে না। তবু আতাকু যখন বলছে ওদের দেবতা গোসা করেছেন সভ্য-মানুষদের প্রতি তখন সে কথা অবিশ্বাস করা যায় না। সে চেষ্টা করবে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যেতে। কিন্তু কবে যে যেতে পারবে তা বলতে পারছে না। আতাকু অনেক কথা শোনালো শহীদকে। রহস্যময় ছায়া দেখা যায় বনভূমিতে, পাহাড়ে, গাছের ডালে ডালে। মরা মানুষের খুলি ছুঁড়ে মারে দেবতা পাপীদের উদ্দেশ্যে, চারপেয়ে বাঘ পলকের মধ্যে রূপ নেয় দুপেয়ে মানুষে। সবই দেবতাদের কাজ। সভ্য মানুষকে এই জঙ্গল ছেড়ে চলে যেতে হবে তাই তেনারা ভয় দেখাচ্ছেন। কেউ যদি তা অগ্রাহ্য করে তবে তার শাস্তি মৃত্যু। এ পর্যন্ত তিনজন সভ্য মানুষকে তেনারা মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন এই বাংলো থেকেই। এতে করেই কি ব্যাপারটা বোঝা যায় না? তবে কেন নতুন বাবুরা আবার আসেন এখানে? এতো অবাধ্য হয় কেন সভ্য মানুষ? তাদের ভয়-ডর নাই?

আদিবাসীরা চলে যেতে মিস্টার খোন্দকারকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো শহীদ। তাঁকে চেয়ারে বসতে বলে শহীদ প্রশ্ন করলো, 'চা খাবেন, মিস্টার খোন্দকার?'

'খাবো?' চিন্তান্বিত স্বরে বললেন মিস্টার খোন্দকার, 'খেতে পারি, কিন্তু আপনার চাকরটা বিশ্বস্ত তো?'

শহীদ হাসলো মনে মনে। কিন্তু প্রকাশ্যে গুরুত্ব দিয়ে বললো, 'নিশ্চয়ই।'

তারপর রান্নাঘরের দিকে মুখ করে বললো, 'বশীর, এখানে দু'কাপ চা দিয়ে যাস।'

'তা শুনুন, মিস্টার রুহুল আমিন,' শুরু করলেন মিস্টার খোন্দকার, 'ড্রাইভারের বিরুদ্ধে আমার সন্দেহ ভিত্তিহীন নয় এ কথা আপনাকে বোঝাতে চাই। প্রথমতঃ ধরুন, লোকটা বিশালবনে আছে আজ সাত মাস ধরে···আচ্ছা, মিস্টার রুহুল আমিন, যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্ঘটনাই ঘটুক না কেন তার চেহারা বার বার একই রকম হতে পারে না নিশ্চয়ই—পারে কি?'

শহীদ সমর্থনসূচক উত্তর দিলো, 'না, পারে না।'

'তবেই বুঝুন! এখানে সেই অসম্ভব ঘটনাই ঘটেছে। এবং এর কারণ কি? এর কারণ এগুলো কোনমতেই দুর্ঘটনা নয়। এর পিছনে কাজ করছে বিরাট একটা রহস্য যার সমাধান বের করা সহজ নয়। কিন্তু সহজ নয় বলেই, আমার মতো মানুষের, মানে ডিটেকটিভদের হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলে না। সমাধান বের করার জন্য এগিয়ে আসতেই হয়। মিস্টার হোসেন ছিলেন আমার বন্ধু। হঠাৎ একদিন শুনলাম, না কাগজে পড়লাম, হোসেন বিশালপুরে মারা গেছে বিষাক্ত মাকড়সার কামড়ে। শুধু হোসেনই নয়, জানা গেল এর আগেও দুজন অফিসার নাকি জ্যামাইকা-মাকড়সার কামড়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। অথচ, মাকড়সা তো খোঁজ করে মেলেইনি, এ জাতীয় মাকড়সা নাকি আমাদের দেশে থাকতেই পারে না। ব্যস! আর কিছু জানবার দরকার ছিলো কি? ঘন্টাখানেকের মধ্যেই বেরিয়ে পড়লাম বিশালপুরের উদ্দেশে।

'সাত মাস ধরে আছে ড্রাইভার লোকটা। এই ক'মাসে তিনজন মানুষ মাকড়সার কামড়ে মারা গেল—অথচ ভেবে দেখুন একবার, ওর গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগলো না। এটা কি সন্দেহের কারণ নয়? ওকে কয়েক দিন অনুসরণ করে দেখেছি কয়জন লোকের সঙ্গে গভীর জঙ্গলে গিয়ে দেখা করে। তারপর আমি ওকে ফিরতি পথে একদিন আক্রমণ করে বসলাম। আমাকে চিনতে পেরেছিল বোধ হয়, কিংবা কেন জানি না ঠিক, আমাকে আঘাত করলো না। ওকে মারাত্মক জখম করে বেঁধে ফেলবার চেষ্টা করেছিলাম আমি। কিন্তু সেটা সম্ভবপর হয়নি। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেদিন আমি রিভলভারটা নিয়ে বের হইনি, পায়ে ইট মেরে জখম করেছিলাম।'

আবার ফিসফিস কণ্ঠে শুরু করলেন মিস্টার খোন্দকার। 'আর জানেন, হোসেনের ডায়েরীটাও পাচ্ছি না।'

মিস্টার খোন্দকার যখন শহীদের ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল। শহীদ কামালকে ডেকে জঙ্গলের আশপাশটা ঘুরে দেখে আসতে বললো

একবার। সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসবে বলে কামাল তখুনি বের হয়ে গেল। কামাল চলে যেতেই শহীদ কাপড়-চোপড় পরে ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বললো। কথায় কথায় জেনে নিলো পোস্ট অফিসটা স্টেশনের কোন্ দিকে। তারপর একাই গাড়িতে চড়ে বসলো।

এমন সময় গফুর সামনে এসে দাঁড়ালো।

'কি, বশির মিয়া, কিছু বলবে নাকি?' শহীদ ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো।'

আশেপাশে কাউকে দেখতে না পেয়ে গফুর অভিযোগ করলো, 'দাদামণি, আমার দাড়ি ভালো লাগছে না মোটে। আয়নায় দেখলাম চেহারাটা। ঠিক যেন ষাট বছরের বুড়ো মনে হলো, চিনতেই পারলাম না নিজেকে। আর তাছাড়া অসুবিধাও করতো, সর্বক্ষণ সুড় সুড় করে।'

শহীদ মনে মনে হেসে গম্ভীর কণ্ঠে বললো, 'তোকে বলছি না, বারবার ও কথা আমাকে শোনাবি না।'

মাথা নিচু করে গফুর বললো, 'সে আমার খুব মনে আছে, দাদামণি। কিন্তু শুধু একবার আমি আমাকে দেখতে চাই।'

শহীদ বললো, 'এই গবেট, তুই নিজেকে দেখতে পাচ্ছিস না।'

গফুর দাড়িতে আঙুল ঠেকিয়ে বললো, 'এই লোক আমি নই, দাদামণি। দাড়ি-গোঁফ ছাড়া একবার নিজেকে দেখবো আয়নায়, তা না হলে বিশ্বাস হচ্ছে না এখানকার আমি আগেকার আমি কি না।'

হাসি চাপতে পারলো না এবার শহীদ। কিন্তু ধমক দিয়ে বললো, 'সরে যা হ্যাঁদারাম, আবার ও কথা বললে মজাটা টের পাবি।'

গফুর কোনো কথা না বলে গম্ভীর মুখে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। শহীদ স্টার্ট দিলো গাড়িতে।

পোস্টাকিস থেকে বেরিয়ে বাংলোর দিকে এগুতে লাগলো শহীদ। কিছু দূর এগোতেই পিছন থেকে গড় গড় করে একটা শব্দ উঠলো। পিছন ফিরে তাকাতে চমকে উঠলো শহীদ। দেখলো পিছনে সীটের নিচে গড়াগড়ি যাচ্ছে একটা মরা মানুষের মাথার খুলি।

ঠিক সন্ধ্যার সময় গম্ভীর মুখে ফিরলো শহীদ। কামাল তখনও ফেরেনি দেখে অবাক হলো একটু। ঘরে গিয়ে বসলো চিন্তিত মুখে। গফুর চা দিয়ে গেল এক সময়। শহীদ চুপচাপ বসে না থেকে মিস্টার খোন্দকারের ট্রাঙ্ক থেকে পাওয়া হোসেন সাহেবের ডায়েরীটা পড়তে শুরু করলো মনোযোগ সহকারে।

রাত ক্রমেই বেড়ে চললো। কামালের ফেরার নাম নেই তবু। কিছুক্ষণ পর পর চিন্তিত মুখে বারান্দায় এসে দাঁড়াতে লাগলো শহীদ। সে ভাবছিল, কামাল পথ হারিয়ে ফেলেছে হয়তো কিংবা মিস্টার খোন্দকারকে অনুসরণ করতে গিয়ে গাছের মাথায় চড়ে

এসে আছে। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখবে, মনে মনে এই কথা ভেবে শহীদ চেয়ারে বসলো আবার ডায়েরীটায় চোখ মেলে। হঠাৎ সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলো শহীদের সদাজাগ্রত চেতনা! এদিক ওদিক তাকালো বার বার। তারপর কান পেতে শোনবার চেষ্টা করলো কি যেন। কোথা থেকে যেন একটা শব্দ আসছে। ঘড় ঘড় করে ভারি কোনো জিনিস যেন পাথরের উপর দিয়ে গড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মাঝে মাঝে অন্যরকম শব্দও শোনা যেতে লাগলো। আছড়ে ফেলে ভারি কিছু ভাঙা হচ্ছে যেন। অতি অস্পষ্ট শব্দটা, কিন্তু অদ্ভুতভাবে মনে হচ্ছে, অতি কাছেই যেন শব্দটার উৎস। চঞ্চল হয়ে উঠলো শহীদের সন্দেহপ্রবণ মনটা। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সে। কিন্তু বুঝতে পারলো না ভালো করে। একবার মনে হলো শব্দটা বাইরে থেকেই আসছে, বাইরে বের হতে কিন্তু শব্দ আর শুনতে পাওয়া গেল না। ঘরে ঢুকতেই আবার সেই রহস্যময় শব্দটা শোনা যেতে লাগলো। পাথরের দেয়ালে অনেকক্ষণ কান পেতে রইলো শহীদ, পাথরের মেঝেতেও কান পেতে বুঝতে চেষ্টা করলো শব্দটার উৎস। কিন্তু বৃথাই সব চেষ্টা। ঘর্মাক্ত কলেবরে ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগলো শহীদ। মুখ চোখে উত্তেজনার চিহ্ন, কপালে চিন্তারেখা, চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে একটা কঠিন প্রশ্নঃ কোথায়? কোথা থেকে আসছে এই রহস্যময় শব্দ?

সময় কাটতে লাগলো। অসহ্য লাগছে শহীদের। ছটফট করতে লাগলো সে। পাগলের মতো দেখাচ্ছে তাকে। এক সময় স্থির হয়ে দাঁড়ালো শহীদ। পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাড় মুখ কপাল মুছে স্থির হয়ে ভাবতে চেষ্টা করলো ব্যাপারটা। এতোটা দিশেহারা হয়ে পড়া উচিত হয়নি তার। তার পক্ষে ব্যাপারটা ছেলেমানুষীই হয়ে গেছে, ভাবলো শহীদ। শব্দটা আশ্চর্য হয়ে যাবার মতোই একটা ঘটনা, শব্দ একটা হচ্ছে, অথচ ঘন্টা দুয়েক চেষ্টা করেও তার কোনো হদিস বের করতে পারলো না। এতে বরং তার লজ্জিতই হওয়া উচিত, উত্তেজিত না হয়ে।

হাত ঘড়িতে সময় দেখে রাইফেলটা হাতে তুলে নিলো শহীদ। রাত নটা বাজে। ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো শহীদ শীতকালের রাত নটা কম কথা নয়। কামালের কথা ভেবে কপালে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো শহীদের। পথ হারিয়ে ফেললো নাকি? গফুরকে দিয়ে ড্রাইভার তিতু মিয়াকে ডাকিয়ে এনে প্রশ্ন করলো, 'মিস্টার খোন্দকার কোথায়?'

তিতু মিয়া জানালো পাগলা বাবু ফেরেননি এখনও। মিস্টার রশীদের না ফেরার কথা শুনে তিতু মিয়া বললো সে খুঁজে দেখবে কি না।

শহীদ বললো, 'না।' মিস্টার রশীদ বাংলোর কাছাকাছি কোথাও নেই, সুতরাং খুঁজে কোনো লাভ হবে না। নিশ্চয় তিনি পথ হারিয়ে ফেলেছেন—এখন বরং রাইফেলের শব্দ করে মিস্টার রশীদের সাড়া নেয়া যাক।

পর পর চারবার শব্দ করলো শহীদ আকাশের দিকে লক্ষ্য করে। রাইফেল ছোঁড়া শেষ হতে তিতু মিয়া নিজের ঘরে চলে গেল। ঘরে ফিরে শহীদ গফুরকে খাবার দিতে

বললো। কামালের অনুপস্থিতিতে গফুরের মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেছে দেখে শহীদ আশ্বাস দিলো ওকে।

রাইফেলের আওয়াজ করার পর এক ঘন্টা সময় কেটে গেল। ঘরের ভিতর সেই অস্বস্তিকর শব্দ তেমনি হচ্ছে। শহীদ ঘর ছেড়ে আবার বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। বারান্দার এক কোণে গফুরও দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় কামাল ক্লান্ত পায়ে ফিরে আসছে দেখতে পেলো ওরা। ধীরে ধীরে হাঁটছে কামাল। যেন কতো অসুস্থ।

দূর থেকে ওকে দেখতে পেয়ে অজানা একটা আশঙ্কায় শহীদের মনটা শিউরে উঠলো। শব্দ করে জিজ্ঞেস করলো, 'কি খবর, মিস্টার রশীদ, জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন নাকি?'

কোনো উত্তর দিলো না কামাল। মন্থর পদক্ষেপে এগিয়ে এলো। শহীদের দিকে একবার মাত্র অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো। তারপর তাকে পাশ কাটিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে ধপাস করে বসে পড়লো বিছানার ওপর। পিছন পিছন ঘরে ঢুকলো শহীদ। আশ্চর্য! ঘরের ভিতরের রহস্যময় শব্দটা আর শোনা যাচ্ছে না!

স্থির দৃষ্টিতে তাকালো শহীদ কামালের দিকে। দু'হাতে মুখ ঢেকে কামাল বসে আছে বিছানার ওপর।

'কি হয়েছে রে কামাল, এতো নার্ভাস হয়ে পড়েছিস যে?'

মুখ থেকে হাত সরিয়ে কামাল নির্বাক তাকালো। তার চোখ-মুখে একটা হতচকিত ভাব ফুটে রয়েছে দেখতে পেলো শহীদ। কিছুক্ষণ শহীদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে সে বললো, 'এক গ্লাস পানি।'

গফুর পানি এনে দিতে ঢক ঢক করে গ্লাসের পানিটুকু শেষ করে বললো, 'আর এক গ্লাস।'

কামালের পানি পান করার ধুম দেখে মনে মনে না হেসে পারলো না শহীদ।

কামালের দিকে মুখ করে একটা চেয়ারে বসে শহীদ বললো, 'এবার বল দিকি ব্যাপারটা কি? তুই যেন খুব ভয় পেয়েছিস বলে মনে হচ্ছে।'

খানিকক্ষণ পর স্থির হয়ে কামাল বললোঃ বনের আশপাশটা দেখে ফিরে আসার পথে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। দ্রুত পায়েই ফিরছিল সে। হঠাৎ দূরে কোথাও নারী কণ্ঠের খিল খিল হাসির শব্দ শুনে সে থমকে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে থেকে কিছুক্ষণ শোনার পর তার মনে হলো হাসির শব্দটা ক্রমশ বাড়ছে যেন। নির্জন বনভূমিতে সন্ধ্যা লগ্নে হাসিটা ক্রমেই বেড়ে চললো। রহস্যময়ী কে এক নারী উন্মাদিনীর মতো হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছে যেন। হঠাৎ তার মনে হলো ক্রমেই আবার দূরে সরে যাচ্ছে খিল খিল হাসিটা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একেবারে মিলিয়েও গেল না। যেন কোনো এক ছলনাময়ী নারী হেসেই চলেছে। এক মুহূর্তের জন্যেও বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। রোমাঞ্চিত হলেও ভয় সে তখনও পায়নি। প্রবল একটা কৌতূহল পেয়ে বসলো তাকে। একবার ভাবলো বাংলোতেই ফিরে যায়। কিন্তু মন তাতে সায় দিলো না। হাসির শব্দটা যেদিক থেকে

আসছে সেদিক পানেই এগোতে থাকলো সে। তখন বনে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে এগোতে থাকলো সে। আরও খানিকটা এগিয়ে যেতে হঠাৎ থেমে গেল শব্দটা। সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়ালো সে। কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলো। কিন্তু শুনতে পেলো না আর কিছু। নির্জন বনভূমি আবার নিঃশব্দ হয়ে গেল। যেন এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল কামাল। এইবার বাংলোর দিকে ফিরে আসবে বলে পা বাড়ালো কামাল। কিন্তু হঠাৎ পিছনে খিল খিল করে হেসে উঠলো সেই নারীকণ্ঠ। চমকে উঠলো কামাল। বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়ালো সে। কিন্তু বনভূমির নিশ্ছিদ্র তমিস্রা ভেদ করে কিছুই ঠাহর করতে পারলো না। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেও অন্ধকার ভেদ করে কোনো নারীর আবছা চেহারাও চোখে পড়লো না তার। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে। বিলম্বিত লয়ে ধীরে ধীরে হাসিটা মিলিয়ে গেল। এক মুহূর্ত পরেই আবার চমকে উঠলো কামাল। এবার নারী কণ্ঠের সেই ভয় জাগানো হাসি মাত্র হাত কয়েক দূর থেকে ভেসে এলো। পাগলের মতো গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলো কামাল, 'কে!' কিন্তু কেউ কোনো উত্তর দিলো না তার সে প্রশ্নের। আবার চিৎকার করে উঠলো কামাল। কিন্তু এবারও কেউ উত্তর দিলো না, থামলো না সে পাগল করা হাসি। কে যেন দমকে দমকে গড়িয়ে পড়তে পড়তে একটানা হেসেই চলেছে—বিরামহীন। এভাবেই চলতে লাগলো মিনিটের পর মিনিট ধরে। সাহস হারিয়ে ফেলেছিল কামাল। হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সে অল্প কিছুক্ষণের জন্য। তারপর হাসির শব্দ লক্ষ্য করে অন্ধকারে গুলি ছুঁড়তে শুরু করে সে। ফল হলো না কিছুই। একটা একটা করে শেষ হয়ে গেল রিভলভারের ছ'টা গুলি। শেষ গুলিটা ছুঁড়বার পরই বন্ধ হয়ে যায় মহাযন্ত্রণাকর হাসির খিল খিল শব্দটা। তারও বেশ কিছুক্ষণ পর চারবার গুলি ছোঁড়ার শব্দ শুনতে পায় সে। তখন ওই গুলির আওয়াজ তাকে যথেষ্ট সাহস জোগায়। সে ক্লান্ত পায়ে বাংলো অভিমুখে অগ্রসর হয়।

কামালের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে গম্ভীর হয়ে উঠলো শহীদের মুখ। কামাল প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেছিল, ইতিমধ্যে সে তার কাহিনী শেষ করে বললো, 'তোর কি মনে হয়, শহীদ? আমি তো একেবারে পাজ্‌লড হয়ে গেছি!'

শহীদ দুহাতের খাপের মধ্যে থুতনি রেখে মেঝের দিকে তাকিয়ে বললো, 'ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক, কিন্তু রহস্যজনক যে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'

'প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করিস, শহীদ?' কামাল হঠাৎ গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলো।

মৃদু হাসলো শহীদ, 'বিশ্বাস-বিশ্বাসের কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন?'

'তুই বলছিস, ব্যাপারটা উদ্দেশ্যমূলক। কিন্তু এতে করে কার কি উদ্দেশ্য সিদ্ধি হচ্ছে তাতো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।'

শহীদ বললো, 'আমি একটা ডায়েরী পেয়েছি—ডায়েরীটাতেও ওই অদ্ভুত রহস্যময় হাসির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ডায়েরীটা মিস্টার হোসেনের।'

কামাল বললো, 'তাই নাকি! কিন্তু কি বলতে চাইছিস তুই? মিস্টার হোসেন কি

এই হাসিটাকে উদ্দেশ্যমূলক বলে মনে করেছিলেন? মনে করে থাকলে তিনি কি ধরতে পেরেছিলেন এতে কার কি উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে?'

শহীদ বললো, 'না। ওঁর ধারণা ছিলো নারীকণ্ঠের এই ভৌতিক হাসি কোনো না কোনো ব্যর্থ প্রেমিকার অশান্ত প্রেতাত্মার।'

একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো কামাল শহীদের মুখের দিকে। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিলো সে। তার চোখেমুখে ফুটে উঠলো গভীর চিন্তার ছাপ।

চার

বিশালবনের বাংলোর চারপাশে ঘটতে লাগলো আজব সব ঘটনা। শহীদের প্রতিটি রাত কাটতে লাগলো বিনিদ্র। উৎসহীন, অস্বস্তিকর শব্দ, রহস্যময়ী নারীর খিল খিল হাসি এবং মরা মানুষের শূন্যগর্ভ করোটি ছাড়াও আরেকটি অদ্ভুত ব্যাপার প্রতিদিনই ঘটতে লাগলো।

একদিন রাতে বাতিটা কমিয়ে দিয়ে বিছানায় না গিয়ে শহীদ চেয়ারে বসলো একটা সিগারেট ধরিয়ে।

কামাল বললো, 'কি রে, বসলি যে, শুবি না নাকি?'

রহস্য করে শহীদ বললো, 'এক ঘন্টা পর।'

'কেন?'

'হাউই দেখবো!'

'হাউই! কোথায় রে?'

শহীদ বললো, 'জঙ্গলের ভিতর।'

ওর কথা বুঝতে না পেরে কামাল বিছানার ওপর উঠে বসলো। বললো, 'জঙ্গলের ভিতর হাউই? তা তুই ঘরের ভিতর বসে সেটা দেখবি কেমন করে?'

মৃদু হেসে শহীদ বললো, 'ঘরে বসেই দেখা যাবে। তুইও দেখতে পারিস।'

কামালের অসহিষ্ণু গলা শোনা গেল, 'হেঁয়ালি করার অভ্যেস্যটা ছাড় দেখি তুই।'

শহীদ বললো, 'আর মাত্র এক ঘন্টা অপেক্ষা কর, তাহলেই বুঝবি হেঁয়ালি করছি কি না।'

প্রায় একঘন্টা পর ঘড়ি দেখে শহীদ জানালার পাশে গিয়ে বাইরে দৃষ্টি ফেলে বললো, 'আর পাঁচ মিনিট পর।'

মিনিট দুই অপেক্ষা করার পর কামাল জঙ্গলের গভীর অন্ধকারে চোখ রেখে বলে উঠলো, 'অন্ধকারে তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না।'

ঠাট্টা করে শহীদ উত্তর দিল, 'আলোর নিচেই তো অন্ধকার বেশি।'

কামাল এ কথার কোনো উত্তর দিলো না। অন্ধকার বনানীর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলো। তার চোখে প্রতীক্ষার আভাস।

ঠিক মিনিট তিনেক পর দেখা গেল বনানীর একটা দিক উজ্জ্বল করে দ্রুত উঠে গেল একটা হাউই আকাশের দিকে। অনেক উঁচুতে উঠে গিয়ে হাউইটা লাল মোতির মালা হয়ে বাতাসে ভাসতে লাগলো। তারপর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই নিভে গেল সেটা।

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেল গফুরের। ঘুম ভাঙতেই তার দাদামণির ঘর থেকে কেমন যেন একটা 'ধুপ' শব্দ শুনতে পেলো সে। তড়াক করে বিছানা ছেড়ে নিঃশব্দে দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো গফুর। চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে সন্তর্পণে শহীদের ঘরের জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ভিতরে দৃষ্টি ফেলতেই একটা আঁতকে ওঠার শব্দ বেরিয়ে এলো ওর গলা দিয়ে। দেখলো একটা কালো পোশাক পরিহিত ছায়ামূর্তি ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। অসতর্ক গফুরের কণ্ঠ থেকে শব্দটা বের হতেই ছায়ামূর্তিটা চকিতে ঘরের এককোণে সরে গেল। শহীদের মশারির ভিতরটা গফুর দেখতে পেলো না। দাদামণির বিপদের আশঙ্কায় চঞ্চল হয়ে উঠলো সে। মুহূর্তের মধ্যেই সে তার কর্তব্য স্থির করে ফেললো। একলাফে জানালার কাছে থেকে সরে এসে দরজার উপর দমাদম কিল ঘুসি লাথি মারতে লাগলো সে। আর গলা ফাটিয়ে 'সাহেব, দরজা খোলেন—ও সাহেব!' বলে তারস্বরে চিৎকার করতে লাগলো। কিন্তু দরজা তো খুললই না, ঘরের ভিতর থেকে এমন কি একটি শব্দও বের হলো না। গফুর একবার ভাবলো দরজাটা ভেঙে ফেলবে কি না। তারপর কি মনে করে আবার জানালার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখলো। ছায়ামূর্তিটিকে এবার দেখা গেল না। গফুর মনে মনে ভাবলো, নিশ্চয়ই ঘরের কোণে লুকিয়ে আছে বেটা। কিন্তু তার দাদামণির ঘুম ভাঙছে না কেন এই ভাবনা তাকে আশঙ্কায় জর্জরিত করতে লাগলো। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলো সে। এমন সময় অন্ধকারে শহীদের গলা শোনা গেল, 'এক পা নড়ার চেষ্টা করেছো কি মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো।'

ঘরের বাইরে শহীদের গলা শুনে আশ্বস্ত হয়ে দু'হাত মাথার ওপরে তুলে দাঁড়ালো গফুর। কেউ পিস্তল বাগিয়ে যদি হাত তুলে দাঁড়াতে বলে আর তুমি যদি নিরস্ত্র হও তাহলে তখনকার মতো মাথার ওপরে হাত তুলে দাঁড়ানোই ভালো—শহীদের এই কথাটি গফুর অক্ষরে অক্ষরে মনে রেখেছে। কিন্তু উত্তেজিত কণ্ঠে সে বলে উঠলো, 'সব্বোনাশ হয়ে গেছে, সাহেব।'

শহীদ ও কামাল গফুরের মুখ থেকে ব্যাপারটা কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই জেনে নিলো। দরজার তালাটা দ্রুত হাতে খুলে শহীদ আর কামাল রিভলভার হাতে ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালো। এক ঝটকায় দরজার পাল্লা দুটো খুলে ভিতরে টর্চের আলো ফেললো শহীদ। পরক্ষণেই গর্জে উঠলো দুজনের রিভলভার, গুড়ুম···গুড়ুম···গুড়ুম।

রিভলভারের শব্দ মিলিয়ে যেতে স্তম্ভিত হয়ে ওরা তাকিয়ে রইলো ঘরের মেঝের দিকে। মেঝেতে দশহাতী একটা অজগর পড়ে আছে, নিথর।

গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে এক পা পিছিয়ে এসেছিল ওরা। টর্চের আলোয় দেখলো অজগরটা নিথর পড়ে আছে। গুলি বিশাল অজগরের মাথা ছেঁচে দিলেও অজগরটা সঙ্গে সঙ্গে নির্জীব হয়ে যাবে না। শহীদ ফিসফিস কণ্ঠে উচ্চারণ করলো, 'অজগরটা মরাই ছিলো।'

টর্চের আলো সারা ঘরময় ফেলে দেখে নিয়ে ওরা ঘরের ভিতর ঢুকলো মরা অজগরটার পাশ কাটিয়ে। ঘরে কারও অস্তিত্ব নেই দেখে হতবাক হয়ে গেল গফুর।

'কোথায় গেল, দাদামণি, লোকটা?'

শহীদের মুখের দিকে ক্যাল ক্যাল করে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করলো গফুর।

শহীদ আর কামাল ঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়ে বের হয়েছিল প্রতি রাতে আকাশে নিক্ষিপ্ত হাউইয়ের ব্যাপারটার সন্ধান করতে। আন্দাজমত একটা জায়গায় গিয়ে সবচেয়ে উঁচু একটা গাছে চড়ে বসে ওরা দেখতে পেলো বাংলোটা সেখান থেকে নজর করা যায়। গাছে বসেই ওরা অপেক্ষা করছিল। এমন সময় শোনা গেল রহস্যময়ী সেই নারীর পাগল করে দেয়া খিল খিল হাসি। অদৃশ্য নারীকণ্ঠের অস্বস্তিকর এই হাসি শুনে ওরা একসময়ে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে গাছ থেকে নেমে পড়ে খোঁজ করতে চেষ্টা করলো এর উৎস। কিন্তু বৃথাই সে চেষ্টা। কোনো হদিস করতে পারলো না ওরা।

হাসির শব্দটা লক্ষ্য করে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল ওরা।

শহীদ বললো, 'হাউইয়ের ব্যাপারটা আজ স্থগিতই থাক।'

পরিশ্রান্ত শরীরে চিন্তামগ্ন হয়ে ফিরে আসছিল ওরা। এমন সময় বারান্দায় গফুরকে দেখে চিনতে না পেরে রিভলভার উঁচিয়ে গর্জন করে উঠেছিল শহীদ।

এই ঘটনার ক'দিন পরের কথা।

রাত দশটা বাজে অথচ কামাল ফিরছে না দেখে শহীদ ড্রয়ার থেকে রিভলভারটা নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে পড়লো। ধীর পায়ে হাঁটছিল সে। কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো তাকে। চকিতে একটা গাছের আড়ালে সরে গিয়ে দেখলো, তিতু মিয়ার ঘর থেকে বের হয়ে এলো একটা ছায়ামূর্তি। চাঁদের আলোয় নেমে এলো লোকটা সতর্ক পদক্ষেপে। বিস্মিত শহীদ দেখলো, ছায়ামূর্তি আর কেউ নয়, স্বয়ং তিতু মিয়া।

রিভলভারটা পকেটে হাত দিয়ে পরখ করে নিলো শহীদ। তারপর তিতু মিয়ার চলন্ত শরীরটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সেও এগোতে লাগলো এক পা এক পা করে।

পায়ে চলা সঙ্কীর্ণ একটা পথ ধরে হাঁটছে তিতু মিয়া। কিছুদূর এগোতেই চওড়া একটা রাস্তা পাওয়া গেল। এবার বেশ দ্রুত পায়েই হাঁটতে লাগলো তিতু মিয়া। পিছন পিছন নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করলো শহীদ।

মিনিট পাঁচেক অনুসরণ করার পর শহীদ বুঝতে পারলো তিতু মিয়া পাহাড়টা লক্ষ্য

করে হাঁটছে। ততক্ষণে পাহাড়টার কাছাকাছি এসে পড়েছে ওরা। আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পাহাড়ের পাথর ধরে ধরে একটু একটু করে ওপরে উঠতে শুরু করলো তিতু মিয়া। এখন আর অনুসরণ করা ঠিক হবে না, ভাবলো শহীদ। জায়গাটা বেশ ফাঁকা। তিতু একবার নিচের পানে তাকালেই চাঁদের আলোয় তাকে দেখে ফেলবে নিশ্চিত। যতক্ষণ না তিতু পাহাড়ের কিছুটা ওপরে উঠে একটি পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল ততক্ষণ অপেক্ষা করে রইলো শহীদ। তারপর সতর্ক পায়ে এক প্রকার ছুটেই পাহাড়টার পাদদেশে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর উপরে উঠতে শুরু করলো। কিছুদূর উঠেই একটা সমতল জায়গা দেখতে পেলো শহীদ। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই দাঁড় করানো রয়েছে চারপাশে। চাঁদের আলো পাথরগুলোর ওপর পড়াতে আলোছায়ার অদ্ভুত একটা পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে সমতল জায়গাটাতে।

চারপাশে তাকিয়ে তিতুকে কোথাও দেখতে পেলো না শহীদ। এক পা এক পা করে এগিয়ে একটা বড় আকারের পাথরের আড়ালে দাঁড়ালো সে। পাথরের আড়ালে আড়ালে থেকে সন্তর্পণে খোঁজাখুঁজি করতে লাগলো তিতুকে।

মিনিট দশেক কেটে যাবার পর দূরে একটা ছায়াকে নড়াচড়া করতে দেখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকালো শহীদ। তারপর এগোতে লাগলো ছায়াটা লক্ষ্য করে। ছায়াটা তিতু মিয়ারই। আশ্চর্য হয়ে শহীদ লক্ষ্য করলো তিতু মিয়া কি যেন খুঁজছে চারদিকে তন্ন তন্ন করে। একটা থেকে আরেকটা পাথরের দিকে সরে সরে গিয়ে চঞ্চল ভাবে খোঁজার আর বিরাম নেই তিতু মিয়ার। শহীদ লোকটার কার্যকলাপ দেখে কিছুই বুঝতে পারলো না।

আধঘন্টারও বেশি সময় খুঁজে চললো তিতু মিয়া। শহীদ ঠায় পাহাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে পর্যবেক্ষণ করলো তিতু মিয়ার ব্যর্থতা। কি যেন খুঁজছে লোকটা অথচ হদিস করতে পারছে না জিনিসটার।

হঠাৎ একটা উজ্জ্বল আলোর আভা দেখা গেল চারদিকে। থমকে থেমে গেল তিতু মিয়া। শহীদও দেখলো, জঙ্গলের দিক থেকে আকাশে উঠে গেছে একটা হাউই। আকাশে উঠে গিয়ে হাউইটা একটা লাল মোতির মালার মতো জ্বলে আছে। বাতাসে ভাসতে লাগলো হাউইটা। তারপর একসময় নিবে গেল মোতির দানাগুলো একে একে।

তিতু মিয়া হাউইটা দেখেই লুকিয়ে পড়ছে শহীদের মাত্র পাঁচ গজ দূরে একটি পাথরের আড়ালে। মিনিট পনেরো কেটে গেল নিঃশব্দে। তিতু মিয়া বের হচ্ছে না পাথরের আড়াল থেকে। লোকটার উপস্থিতি টের পাচ্ছে শহীদ। যেন কারও আগমনের অপেক্ষা করছে সে।

শহীদও ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলো পরবর্তী ঘটনার অপেক্ষায়।

আর মাত্র ক'মিনিট পরই দেখা গেল অত্যন্ত নিচু একটি ছায়াকে শ্লথ, মন্থর গতিতে ওদের দিকে আসতে। কাছাকাছি আসতে শহীদ দেখলো ছায়াটি চতুষ্পদ জন্তুর। আরও এগিয়ে এলো জন্তুটা। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল জন্তুটা একটা বাঘ। বিশালবনে

বাঘও আছে এ কথা জানা ছিলো না শহীদের। থাকলে নিশ্চয়ই শুনতো সে। কিন্তু অবিশ্বাস করার উপায় নেই। চোখের সামনে জলজ্যান্ত প্রমাণ এগিয়ে আসছে।

আত্মরক্ষার জন্য রিভলভারটা আঁকড়ে ধরলো শহীদ। হঠাৎ শহীদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়লো বাঘটার চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে জ্বলছে না। আশ্চর্য তো! একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো শহীদ। কেমন যেন সন্দেহ হলো তার। এবং সেই মুহূর্তেই আবছা সন্দেহটা বিশ্বাসে পরিণত হয়ে গেল শহীদের চোখে। তিতু মিয়া যে পাথরটার আড়ালে লুকিয়ে ছিলো তার উল্টো দিকে দাঁড়িয়েছিল বাঘটা। চোখের পলকে চারপেয়ে জন্তুটাকে দুপেয়ে একটা মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যেতে দেখলো শহীদ।

বাঘের ছাপমারা খোলসটা খুলে সেটা পাথরের ওপর রাখলো লোকটা। তারপর হঠাৎ দেখে ফেললো তিতু মিয়াকে। তিতু মিয়া কিছু বুঝে উঠবার আগেই একলাফে এগিয়ে গিয়ে লোকটি তাকে জাপটে ধরলো। হুমড়ি খেয়ে পড়লো দুজনেই। শব্দ হতে লাগলো ধ্বস্তাধ্বস্তির। তিতু মিয়া বুঝতে পারেনি বলে পড়ে গিয়েছিল আচমকা ধাক্কা খেয়ে। কিন্তু তার শরীরেও শক্তি কম নয়। আক্রমণকারী তিতুকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে বুকের ওপর উঠে বসে ঘুসি চালাতে লাগলো এলোপাতাড়ি। কয়েক মুহূর্ত পর তিতু মিয়া লোকটাকে দুপায়ের প্যাঁচে আঁকড়ে ধরে ছুঁড়ে দিলো বুকের ওপর থেকে। পরক্ষণেই দুজনে উঠে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো পরস্পরের দিকে হিংস্রভাবে তাকিয়ে। তারপর তিতু মিয়া ছুটে গিয়ে ঘুসি চালালো আক্রমণকারীর নাক বরাবর। প্রচণ্ড একটা ঘুসি খেয়েও লোকটা পড়ে গেল না। ঘুসি থেকে নাকটা বাঁচাতে গিয়ে একটু সরে গিয়েছিল শুধু, ঘুসিটা লাগলো মুখে। দ্বিতীয়বার আঘাত করার আগেই তীব্র একটা লাথি মারলো লোকটা তিতুর তলপেট লক্ষ্য করে। অদ্ভুত একটা কোঁৎ শব্দ করে দূরে ছিটকে পড়লো তিতু মিয়া। আক্রমণকারী একলাফে এগিয়ে গিয়ে আবার চেপে বসলো তিতু মিয়ার বুকে, লোহার মতো দুটো হাত দিয়ে সাঁড়াসির মতো করে দশ আঙুলে চেপে ধরলো তিতুর কণ্ঠনালী। গলা থেকে আক্রমণকারীর হাত সরিয়ে দেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো তিতু। কিন্তু ক্রমেই গলার চাপ বাড়তে লাগলো তার, কিছুই করতে পারছে না সে আক্রমণকারীর। শহীদ বুঝতে পারলো তিতুর শক্তিতে আর কুলোচ্ছে না। আক্রমণকারী দম বন্ধ করে ওকে এবার মেরেই ফেলবে নিশ্চিত।

আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করলো না শহীদ। রিভলভারের ট্রিগারটা পর পর দুবার টিপলো সে। একটা পাথরের গায়ে গিয়ে লাগলো গুলি দুটো। গুলির শব্দেই কাজ হলো। আক্রমণকারী তিতুকে ছেড়ে দিয়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো। তারপর ছোটো বড় পাথরের চাঁই টপকে পালিয়ে গেল।

ছাড়া পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে তিতু মিয়া। ততক্ষণে শহীদ এক পা পিছনে সরে গিয়ে আবার পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে। এদিক-ওদিক হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে তিতু মিয়া আস্তে উচ্চারণ করলো, 'ভাইয়া!'

শহীদ ভাবলো, তিতু মিয়া আবার 'ভাইয়া' বলে ডাকে কাকে? দ্বিতীয়বার তিতুর

গলা শোনা গেল, 'ভাইয়া, কোথায় আপনি?'

কোনো দিক থেকে কেউ সাড়া দিলো না দেখে তিতু মিয়া হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

চিন্তিত মনে ভাবছিল শহীদ, কে এই 'ভাইয়া, লোকটা, তিতু যাকে শ্রদ্ধাপূর্ণ কণ্ঠে ডাকছে বার বার?

ততক্ষণে কোনো উত্তর না পেয়ে তিতু মিয়া ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করেছে। গুলির শব্দ শুনে তিতু মিয়া ভাবছে এ তার ভাইয়ার কাজ। তিতু মিয়ার ভাইয়ার সঙ্গে তিতুর কি সম্পর্ক সে কথাই ভাবছিল শহীদ। আক্রমণকারী লোকটাই বা কে? কেন এসেছিল ওরা এই পাহাড়ে? কি খুঁজছিল তিতু মিয়া পাথরের ফাঁকে ফাঁকে অমন করে? হাউইটা কে এবং কেন জঙ্গলের ভিতর থেকে আকাশের দিকে ছোঁড়ে?

প্রশ্নগুলোর কোনো উত্তর আপাততঃ খুঁজে পেলো না শহীদ। মনে মনে হেসে ফেললো সে। ভাবলো, এসব প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। অনুসরণ করতে হবে তিতু মিয়াকে। তিতু মিয়া যে ছদ্মবেশ ধারণ করে আছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আর, তিতু মিয়ার আসল পরিচয় যেমন করে হোক তাকে জানতেই হবে।

পাহাড় থেকে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেছে তিতু মিয়া। শহীদ দ্রুত পাহাড় থেকে নেমে পড়লো। তারপর জোর কদমে হাঁটতে লাগলো। কিছুটা দূরে তিতু মিয়াকে আবার দেখতে পেলো সে।

তিতু মিয়া পায়ে চলা পথ ধরেই এগিয়ে চলেছে। দ্রুত পায়ে হাঁটছে সে। শহীদও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করতে লাগলো তাকে।

বাংলোর দিকে না গিয়ে তিতু জঙ্গলের গভীরতর অঞ্চলের দিকে হাঁটতে লাগলো। তিতু মিয়া এদিক ওদিক তাকাচ্ছে না। সোজা হেঁটে যাচ্ছে জঙ্গলের দিকে। পাতার ফাঁক দিয়ে ছিটেফোঁটা চাঁদের আলো পিছলে পড়েছে বনভূমিতে। প্রায় অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে গভীর জঙ্গলের চারপাশটা।

অনেকক্ষণ হাঁটবার পর তিতু মিয়াকে একটা ঝোপের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে দেখা গেল। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো শহীদের দৃষ্টি। হঠাৎ তিতু দু'কদম এগিয়ে ঝোপটার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। গুটি গুটি এগোল শহীদ ঝোপটা লক্ষ্য করে। নিঃশব্দে ঝোপটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ঝোপটা হাত দিয়ে ফাঁক করে ভিতরে তাকাবে কি না ভাবছে শহীদ, এমন সময় হঠাৎ তিতুর গলা শুনতে পেয়ে হাতটা গুটিয়ে নিলো সাবধানে।

কাদের সঙ্গে যেন কথা বলছে তিতু মিয়া। তিতু মিয়ার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শহীদ শুনতে পেলো, 'ভাইয়া কোথায় তোরা জানিস কেউ?'

কে যেন উত্তর দিলো, 'ভাইয়ার খোঁজ করার দরকার কি রে, পাগলা। তিনি দেখছেন, সব শুনছেন। প্রয়োজন ঘটলে তিনি নিজেই এসে দেখা দেবেন। এতো উতলা হবার মতো কি ঘটেছে?'

তিতুর গলা শোনা গেল, 'তা আর জানি না ভেবেছিস? কিন্তু সাংঘাতিক একটা ঘটনা ঘটেছে আজ। ভাইয়াকে সব জানানো দরকার।'

তৃতীয় আরেকজনের গলা শোনা গেল, 'তুই পাহাড়ের দিক থেকে এলি বলে মনে হলো। খুঁজে পেলি কিছু।'

তিতু বললো, 'খুঁজতেই তো গিয়েছিলাম। খুঁজে না পেলেও আজ ঠিক জানতে পারতাম শিকলটা কোথায়। বিশ্বাসঘাতকদের একজন লোক যে আমাকে দেখে ফেললো, খুব খানিকক্ষণ মারামারি হলো, শেষ পর্যন্ত আমি হয়তো মারাই যেতাম, এমন সময় রিভলভারের গুলি ছুঁড়লো কে জানি না, অমনি লোকটা আমাকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেল। আমি ভাবলাম, গুলি নিশ্চয়ই ভাইয়া ছুঁড়েছেন, কিন্তু কোনো খোঁজ পেলাম না। তাই ছুটতে ছুটতে চলে এসেছি এখানে।'

প্রথমজন বললো, 'গুলি তাহলে ভাইয়াই ছুঁড়েছেন।'

অন্যজন বললো, 'তাই-ই হবে। কোনো বিশেষ কারণে হয়তো উত্তর দেননি।'

প্রথমজনের গলা শোনা গেল আবার, 'নতুন ফরেস্ট অফিসার তোকে সন্দেহ করেনি তো?'

তিতু বললো, 'মনে হয় না।'

তিতুর কথা শুনে নিঃশব্দে হাসলো শহীদ। কিন্তু হাসিটা ঠোঁট থেকে মিলিয়ে যাবার আগেই সে আক্রান্ত হলো ভয়াবহভাবে। পিছনদিক থেকে পাঁচজন লোক একসঙ্গে শহীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে মাটিতে। রিভলভারটাও ছিটকে পড়ে গেল অদূরে। মাটি থেকে শহীদকে নিজের চেষ্টায় উঠতে হলো না। আক্রমণকারীরা হেঁচকা টানে তাকে দাঁড় করিয়ে ঘুসি বাগিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল হিংস্রভাবে। কিন্তু শহীদের দুহাতের দুটো মুঠোর প্রচণ্ড আঘাতে পলকের মধ্যে দুজন আক্রমণকারী কাতরে উঠে মাটিতে বসে পড়লো। একজন লোক পিছন থেকে শহীদের চুলের মুঠি ধরে ঝুলে পড়েছে ততক্ষণে। আর একজন ঘুসি বাগিয়ে গণ্ডারের মতো ছুটে আসছে। অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটলো পরক্ষণেই।

শহীদ সামনের আক্রমণকারীর বুক লক্ষ্য করে নিজের পা দুটো শূন্যে ছুঁড়ে দিলো। পা দুটো সিধা গিয়ে ধাক্কা দিলো লোকটার বুকে। এদিকে লোকটার বুকে জোড়া লাথি মেরেই শহীদ শূন্য থেকে চিত হয়ে মাটির দিকে পড়তে লাগলো। শহীদের পিছনের চুল ধরে ঝুলছিল যে লোকটা সে ব্যাপারটা তখনও বুঝতে পারেনি। বুঝলো, যখন শহীদ নিজের শরীরের সম্পূর্ণ ভারটা নিয়ে লোকটার ওপর ধপাস করে পড়লো। লোক দুজনের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে শহীদ উঠে দাঁড়ালো দ্রুত। দেখলো, তিতু মিয়া এবং তার সঙ্গের আরও দুজন লোক ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে তিনজন লোকের সঙ্গে। এদিকে দুজন লোক এগিয়ে আসছে শহীদকে লক্ষ্য করে। শহীদ নিশ্চল দাঁড়িয়েছিল বলে লোকগুলোর সাহস যেন হাজার গুণ বেড়ে গেল। একজন এক লাফে এগিয়ে এসে একটা ঘুসি মারলো শহীদের মুখ লক্ষ্য করে। লোকটাকে বুঝতে না দিয়ে আচমকা বসে পড়লো

শহীদ। ঘুসিটা উঁচিয়ে ধরে পিছন থেকে ঠেলে দিলো। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল লোকটা। তার দিকে ফিরে না তাকিয়ে শহীদ সামনে আর একটা লোককে এগিয়ে আসতে দেখে রুখে দাঁড়ালো। ঠিক তখুনি শহীদ হঠাৎ লক্ষ্য করলো, তিতু মিয়া আর তার সঙ্গের লোক দুজন নেই। আক্রমণকারী লোকটা শহীদের পলকের অন্যমনস্কতার সুযোগ পেয়ে গেল। প্রচণ্ড একটা ঘুসি এসে লাগলো শহীদের মুখে। লোকটাকে পালটা আঘাত হানতে অবশ্য ভুল হলো না শহীদের। দ্বিতীয় ঘুসিটা মুখে লাগার আগেই একটা তীব্র লাথি ঝাড়লো শহীদ। কিন্তু লাথিটা জায়গা মতো লাগলো না। লোকটা একটু পিছিয়ে গিয়ে আবার এগিয়ে আসতে লাগলো। হঠাৎ শহীদ দেখতে পেলো মাত্র কয়েক হাত দূরে পড়ে রয়েছে তার রিভলভারটা। কিন্তু এগিয়ে যাওয়া আর হলো না শহীদের। আচমকা পিছন থেকে একটা মোটা লাঠির ঘা খেয়ে যন্ত্রণায় যেন মরে যেতে থাকলো শহীদ। ঘুরে উঠলো মাথাটা, চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যেতে লাগলো, এর ওপর প্রচণ্ড একটা ঘুসি এসে লাগলো তার ডান চোয়ালে, পড়ে গেল শহীদ মাটিতে। জ্ঞান হারায়নি সে। কিন্তু এ এক অদ্ভুত অবস্থা। যন্ত্রণায় হাত পা অসাড় হয়ে আসছে। শহীদ টের পেলো বুকের ওপর চেপে বসে গলা টিপে ধরেছে একজন লোক, আর একজন তার পা দুটো চেপে ধরে আছে, তারপর চোখ দুটো কোনমতে সামান্য একটু খুলেই দেখতে পেলো আরও একজন লোক তীক্ষ্ণধার একখানা ছোরা তার বুক লক্ষ্য করে উঁচিয়ে ধরে কুৎসিত হাসিতে ভরিয়ে রেখেছে মুখ। মুহূর্তের মধ্যেই বসিয়ে দেবে আমূল ছোরা শহীদের বুকে। এমন সময় গুড়ুম···গুড়ুম···গুড়ুম··· তিনবার শব্দ শোনা গেল রিভলভারের। একটা গুলি এসে লাগলো যে লোকটা শহীদের বুক লক্ষ্য করে ছোরা উঁচিয়ে ছিলো তার ডান হাতে। ছোরাটা ছিটকে পড়ে গেল তার হাত থেকে। উঃ! বলে কাতরে উঠলো লোকটা। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গুলিটা লাগলো যে লোকটা শহীদের গলা চেপে ধরে দম বন্ধ রেখেছিল তার দুহাতের কনুই বরাবর। যে লোকটা শহীদের পা দুটো শক্ত করে চেপে ধরেছিল সে গুলির শব্দ শুনেই সবার আগে প্রাণভয়ে সটকে পড়েছে। বাকি দুজন আহত অবস্থায় পালিয়ে গেল।

মাথায় তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছে তখনও শহীদের। তবু ধীরে ধীরে উঠে বসলো সে। মনে হলো পড়ে যাবে। কিন্তু চেষ্টা করে বসে থেকে সামনে চোখ মেলে দেখতে পেলো কালো—আলখেল্লাধারী একটা বিশাল ছায়ামূর্তিকে চকিতে গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যেতে।

কে এই রহস্যময় প্রাণরক্ষাকারী? তিতু মিয়ার সাথে ধস্তাধস্তি করলো যারা তাদের হাতে অবধারিত মৃত্যু ঘটতো তার। আজ কালো আলখেল্লাধারী বিশাল চেহারার ওই ছায়ামূর্তিটা সময়মত গুলি না ছুঁড়লে সে নির্ঘাত মারা পড়তো। রহস্যময় এই লোকটিরই দলের কেউ নাকি তিতু মিয়া? পরস্পর বিরোধী দুটি দল বিশালবনের জঙ্গলে বিচরণ করছে। কি এদের উদ্দেশ্য? মাকড়সা রহস্যের সাথে এদের কোথাও একটা যোগাযোগ আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু কিসের যোগাযোগ? গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে

পড়লো শহীদ। কোথায় যেন বিরাট একটা ফাঁক রয়ে গেছে। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো প্রশ্ন জাগলো তার মনে, আলখেল্লাধারী লোকটা কুয়াশা নয় তো?

কুয়াশার নাম মনে পড়তেই গভীর শ্রদ্ধায় ভরে গেল শহীদের মন। কতবার মৃত্যুর অবধারিত ছোবল থেকে তাকে রক্ষা করেছে কুয়াশা। কুয়াশার সঙ্গে শেষবার দেখা হওয়ার কথাটা মনে পড়লো তারঃ সেবার কুয়াশাই তাদেরকে রক্ষা করেছিল বার্তাকের জংলীদের কবল থেকে। শয়তান নুরবক্সকে হাতের মুঠোয় পেয়েও কুয়াশা তাকে আঘাত করেনি। অসহায় শত্রুকে আঘাত করতে তার বিবেকে বেধেছিল।

ঘড়ি দেখলো শহীদ। রেডিয়াম দেয়া ঘন্টার কাঁটাটা রাত তিনটের ঘরে জ্বল জ্বল করছে। রিভলভারটার খোঁজে এদিক-ওদিক তাকালো। কোথাও দেখতে পেলো না সেটা। তারপর উঠে দাঁড়াতে গিয়ে উঃ করে বসে পড়লো হঠাৎ! তার পা'টা ভয়ানক ভাবে মচকে গেছে। মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল সে, তাই তখন পায়ের আঘাতের কথাটা ভুলেই গিয়েছিল।

কষ্ট হচ্ছিলো খুব, তবু অতি কষ্টে বাম পায়ের ওপর ভর করে উঠে দাঁড়ালো সে। তারপর ঝুঁকে পড়ে রিভলভারটার খোঁজে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এদিক সেদিক হাতড়ে বেড়াতে লাগলো। বেশ কতক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর পাওয়া গেল সেটা।

রিভলভারটা পকেটে পুরে ধীরে ধীরে বাংলোর দিকে হাঁটতে লাগলো শহীদ।

পাঁচ

দিগভ্রান্ত মেষশাবকের মতো এদিক ওদিক তাকাচ্ছে কামাল। গভীর জঙ্গল তার চারপাশে। পায়ে চলার পথগুলো এখনও দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। কিন্তু ক্লান্তিতে তো বটেই, ভয়েতেও সে পথের কোনো একটিকে ধরে এগিয়ে যেতে সাহস পাচ্ছে না সে। আজ সারাদিন কিছুই খাওয়া হয়নি তার। খিদেতে এমনিতেই কাহিল হয়ে পড়ার কথা, আর সীমাহীন হাঁটাহাঁটি করেছে সে। ক্লান্তিতে শরীর যে অবশ হয়ে আসতে চায় তার। ইচ্ছে করছে শুয়ে পড়ে। খেতে না পাক, অন্তত শরীরটাকে কিছুটা বিশ্রাম দেয়া দরকার। কিন্তু এখন সে কথা ভাবাই যায় না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। এমন সময় গভীর জঙ্গলে ক্লান্ত-শ্রান্ত-ক্ষুধার্ত মানুষের শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম করার বাসনা বিলাসচিন্তার সামিল। নিশাচর জানোয়াররা বের হয়ে আসবে একটু পরেই। এমন অসহায় শিকার পেলে বর্তে যাবে তারা। মহোৎসব শুরু হয়ে যাবে তাদের মধ্যে। ছিঁড়ে, কামড়ে, চুষে, ঠুকরে ভবলীলা সাঙ্গ করে দেবে তার চিরতরে।

আপাততঃ একটা উঁচু ডালে উঠে বসবে ভাবলো কামাল।

এমন সময় দূরাগত একটা শব্দ কানে ভেসে এলো কামালের। ঢোল-মাদলের শব্দ হচ্ছে। শব্দটা আসছে উত্তর দিক থেকে। ক'মহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে রইলো কামাল। তারপর শব্দটা লক্ষ্য করে পায়ে চলা একটা পথ ধরে হাঁটতে লাগলো সে।

মাত্র ক'পা এগিয়েছে কামাল, এমন সময় নারীকণ্ঠের তীব্র আর্তচিৎকার শুনে থমকে দাঁড়ালো সে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়েই ছুটতে শুরু করলো শব্দটা লক্ষ্য করে। কিছুদূর গিয়ে দেখতে পেলো একজন লোক আদিবাসী একটি যুবতীকে ধরে আছে শক্ত করে, আর একজন লোক মেয়েটির মুখ কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেলার চেষ্টা করছে। কামাল দেখেই বুঝলো লোক দুজন আদিবাসী নয়।

কালবিলম্ব না করে কামাল অগ্রসর হলো ওদের দিকে।

লোক দুজনও ইতিমধ্যে কামালকে দেখতে পেয়েছে। তাদের একজন যুবতীকে শক্ত করে ধরে রেখে কি যেন বললো অপরজনকে। অপরজন রুখে দাঁড়ালো হিংস্রভঙ্গীতে কামালের দিকে। কামাল ছুটে গিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়লো লোকটার ওপর। সরে দাঁড়ালো লোকটা তার আগেই। কামাল টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল মাটিতে। লোকটা কামালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল আবার, কিন্তু কামাল সরে গেল খানিকটা মাটিতে গড়িয়ে, তারপর এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালো।

লোকটিও ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সে এগিয়ে আসার আগেই কামাল প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারলো লোকটির চোয়ালে। ঘুসি খেয়ে খানিকটা দূরে ছিটকে পড়লো লোকটা। এমন সময় কামাল লক্ষ্য করলো আদিবাসী যুবতীটিকে ছেড়ে দিয়ে অপর লোকটি তার দিকে তেড়ে আসছে। ইতিমধ্যে প্রথম আক্রমণকারীও এসে পড়েছে। লোকটা এগিয়ে আসছে এবার সতর্কপায়ে ধীরে ধীরে। ঘুসি মারার ভঙ্গি করে কামাল প্রথম আক্রমণকারী লোকটিকে লক্ষ্য করে এগোতে লাগলো, কাছাকাছি গিয়ে কিন্তু তীব্র একটি লাথি মারলো আচমকা লোকটার তলপেটে। পরমুহূর্তে দ্বিতীয় আক্রমণকারী লোকটা ছুটে এসে পড়লো কামালের ওপর। কামাল সামান্য একটু সরে গিয়ে কেবল একটা পা বাড়িয়ে ধরে ল্যাঙ মারলো কায়দা করে। হোঁচট খেয়ে লোকটা মাটিতে পড়ে যেতেই কামাল লাফিয়ে পড়লো তার ওপর। তারপর এলোপাথাড়ি ঘুসি চালালো লোকটির চোয়াল–নাক–চোখ লক্ষ্য করে। লোকটার বাধা দেবার ক্ষমতা যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে বলে মনে হলো কামালের তখন সে দেখলো প্রথম আক্রমণকারীটি আবার মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় লোকটিকে এবার ছেড়ে দিলো কামাল। ছাড়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করলো। কামাল আশ্চর্য হয়ে দেখলো প্রথম আক্রমণকারীও রণে ভঙ্গ দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে।

চোখ তুলতে কামাল দেখলো একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে ভিত চকিত দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকিয়ে আছে আদিবাসী যুবতীটি। একটু আগে যারা মার খেয়ে পালিয়ে গেল তারা মেয়েটির শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেছিল। সে সময়মত এসে পড়েছিল বলেই মেয়েটি রক্ষা পেয়েছে।

'মোকে ভয় পাসনি রে তুই,' কামাল আন্তরিকতাপূর্ণ গলায় বলে উঠলো, 'চল্ তোকে আমি সঙ্গে করে তোদের গাঁয়ে পৌঁছে দিই—কেমন?'

মেয়েটি তার ভাষা যথাযথ বুঝলো কিনা কে জানে। কিন্তু কামালের কথা শুনে সে

যে আশ্বস্ত হয়েছে, তার যে ভয় কেটে গেছে সে কথা তার চোখ-মুখের ভঙ্গি দেখেই অনুমান করতে পারলো কামাল।

কামাল এগিয়ে গেল এবার মেয়েটির দিকে। বললো, 'দাঁড়িয়ে রইলি কেন, চল্ আমি তোকে পৌঁছে দিই।'

আন্তরিক দৃষ্টিতে তাকালো মেয়েটি কামালের দিকে। কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বললো না। তারপর হাঁটতে লাগলো ধীরে ধীরে। কামালও হাঁটতে লাগলো তার পাশাপাশি।

ঢোল-মাদলের শব্দ আরও প্রবল হয়ে লাগছে কানে। নাম-না জানা আরও কতো বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

চলতে চলতে যুবতীটি কখন দাঁড়িয়ে পড়েছে খেয়াল করেনি কামাল। হঠাৎ যুবতীর কণ্ঠস্বর শুনে থমকে দাঁড়ালো সে।

'কুথায় থাকিস রে তুই? ওই পাহাড় ধারে?' যুবতী প্রশ্ন করলো।

হেসে কামাল উত্তর দিলো, 'ঠিক বলেছিস তুই, পাহাড়ের ধারে বাংলোয় থাকি আমি।'

আদিবাসী যুবতী প্রশ্ন করলো আবার, 'তুই কবে এসেছিস, বাবু?'

কামাল হেসে আঙুলের কড়ি গুণে বললো, 'আজ ন'দিন হলো।' তারপর আবার বললো, 'তোর নাম কি বললি না যে?'

'বেলেসা নাম আছে গো। তুই?'

প্রশ্নটা ধরতে পারলো না কামাল। বেলেসা খিল খিল করে হেসে উঠলো গোলমালের প্রবল শব্দকে ছাপিয়ে।

'তোর নাম পুছ করলাম, বাবু?'

কামাল এবার বললো, 'রশীদ নাম আছে গো।'

আবার হেসে উঠলো বেলেসা। হাসতে হাসতে কামালের গায়ে গড়িয়ে পড়বে যেন।

আরও খানিকটা এগিয়ে যেতেই ওরা একটা খোলা জায়গায় এসে পৌঁছলো। খানিকটা দূরে আদিবাসীদের মাটির কুটির নজরে পড়লো। বেলেসা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলো। সারা মুখ তার প্রবল রাগে উষ্ণ হয়ে উঠেছে। দ্রুত এগিয়ে চললো সে কামালের আগে আগে।

মাড়াই উৎসব শুরু হয়েছে আদিবাসীদের। চাষের মরশুম শুরু হলেই এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে বেজে ওঠে টোরী—মোষের শিঙের মতো একরকম শিং। কয়েকদিন পরপর শোনা যায় মান্দ্রী ঢোলের ডুগু ডুগু। ঢোল-মাদল জানিয়ে দেয় কবে কোথায় মাড়াই বসবে। আদিবাসীরা জড়ো হতে থাকে সেখানে। বাৎসরিক মেলা বসে, খেলাধুলো হয়; খানা-পিনা, হৈ-হল্লার প্লাবন বয়ে যেতে থাকে। আর নাচ তো আছেই, আদিবাসী যুবক-যুবতী, ছেলে-বুড়ো সবাইয়ের জন্যে।

আতাকু সর্দারকে দেখতে পেলো কামাল। বেলেসা ছুটে গিয়ে আতাকুকে জড়িয়ে

ধরে কেঁদে উঠলো শব্দ করে। আতাকু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে কামালের দিকে তাকালো। তারপর কি যেন জিজ্ঞেস করলো বেলেসাকে। বেলেসা মুখ খুলে কান্নাজড়িত কণ্ঠে কি যেন বলতে লাগলো তাকে। মশালের লালচে আলোয় কামাল দেখলো বুড়ো আতাকুর মুখটা ক্রমেই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে রাগে। চোখ দুটো তার ভাঁটার মতো জ্বলছে। কামাল ভাবলো, আতাকুর কে হয় বেলেসা? বেলেসার মাথায় হাত দিয়ে আতাকু সস্নেহে এক একটা কথা জিজ্ঞেস করছে, আর বেলেসার উত্তরগুলো মন দিয়ে শুনতে চেষ্টা করছে।

ওদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে চারদিকে তাকালো কামাল। আদিবাসীরা গাছের গুঁড়িতে মশাল জ্বেলে রেখেছে অজস্র। কারও কারও হাতেও রয়েছে জ্বলন্ত মশাল। .

নাচ হচ্ছে একটু দূরে। কামালের দিকে পিছন ফিরে চক্রাকারে বসে রয়েছে আদিবাসীরা। সমভূমির মাঝখানে রয়েছে একটি বিরাটকার শ্বেতপাথর। পাথরটাকে ঘিরেই নাচছে আদিবাসীরা। পাহাড়ের নিচেই এই গ্রামটি। ছোট্ট পাহাড়। পাহাড়ের মাথাতেও মশাল জ্বলছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে অদ্ভুত রকমের সব প্রিচিং স্টোন।

নাচ চলছে পুরোদমে। কারও মুখে টুঁ শব্দ নেই।

আতাকু বেলেসাকে নিয়ে অভিবাদনের ভঙ্গিতে সামনে এসে দাঁড়াতে কামাল তার সংবিত ফিরে পেলো যেন। অবাক না হয়ে পারলো না কামাল। আতাকুকে সে প্রথমে দেখেছে বাংলোয়। তখন বুড়ো লোকটা কি দারুণ রেগে ছিলো। তখন লোকটা এমন কি অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথাটা পর্যন্ত নোয়ায়নি। অথচ বেলেসার কাছে সব কথা শুনে লোকটা কৃতজ্ঞতা বোধ করছে কামালের ওপর। কামাল ভাবলো এরা উপকারীর মর্যাদা দিতে জানে।

আতাকু কামালের সঙ্গে কথা বলার সময় বেলেসা দ্রুত পায়ে চলে গেল একদিকে। একটু পরে একটা কলাপাতা আর কি যেন নিয়ে এলো বেলেসা। ইঙ্গিতে বেলেসা কামালকে মাটির ওপর হাঁটু ভাঁজ করে বসতে বললো। কামাল বুঝলো, খেতে দেয়া হবে তাকে। খিদেটা জেগে উঠলো তার। ইঁদুর সেদ্ধ, কন্দমূল আর ওলসির ঝোল নয় তো? তাহলেই সর্বনাশ।

কামাল ভাবছিল, না খেলে বেলেসা নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হবে। ভরসা করে বসে পড়লো তবু। তারপরই দেখলো, বেলেসার হাতে এক ছড়া পাকা কলা।

কামালকে মুখ তুলে তাকাতে দেখে বেলেসাও বসে পড়লো তার পাশে। আতাকুও বসলো। একটি একটি করে কলার খোসা ছাড়িয়ে বেলেসা কলাপাতার ওপর রাখছে। কোনো লৌকিকতা না করে ক্ষুধার্ত কামাল খেতে শুরু করলো রাহুর মতো।

ছয়

হাঁটতে পারছে না আর শহীদ। পায়ের যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে তার। বাংলো এখনো বেশ খনিকটা দূরে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অতি ধীরে হাঁটছিল সে। হঠাৎ অতি মাত্রায়

সজাগ হয়ে উঠলো তার শ্রবণেন্দ্রীয়। সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে তাকালো সে অজানা আশঙ্কায়। অন্ধকার ভেদ করে কিছুই দেখতে পেলো না। কিন্তু স্পষ্ট শব্দ শুনতে পেলো, কে যেন দ্রুত হেঁটে আসছে এদিকেই। কোনমতে একটা গাছের আড়ালে আশ্রয় নিলো শহীদ। কয়েক মুহূর্তে পরেই সে দেখতে পেলো একটা লোককে ঠিক তার দু'হাত দূর দিয়ে যেতে। লোকটা শহীদকে পিছনে রেখে আর ক'পা এগোতেই চিনতে পারলো শহীদ। চিনতে পেরেই অকূলে কূল পেলো যেন সে। মুখে মৃদু একটু হাসি ফুটিয়ে গাছের আড়াল থেকে সরে এসে বিকৃত কণ্ঠে সে বলে উঠলো, 'আর এক পা এগোলেই মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো, মিস্টার রশীদ। দুহাত ওপরে তুলে দাঁড়ানো হোক!'

বিদ্যুৎ বেগে ঘুরে দাঁড়ালো কামাল প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে। কিন্তু পরক্ষণেই মৃদু হেসে উত্তর দিলো, 'প্রতারিত হয়েছো, বন্ধু, তোমার রিভলভারের ট্রিগার টিপে দেখতে পারো···আমার জন্য ওতে একটিও বুলেট নেই।'

দুজনেই হেসে উঠলো এক সঙ্গে। হাসি থামতে শহীদ বললো, 'পথ হারিয়েছিলি নিশ্চয়?'

'এমন হারিয়ে যেন রোজই যাই!' কামাল উদাস কণ্ঠে বললো, 'আর তুই আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলি নিশ্চয়?'

শহীদ বললো, 'আমার পা মচকে গেছে। ধরে ধরে বাংলোয় নিয়ে চল আগে, তারপর সব শোনাবো তোকে।'

'আমারও অনেক কিছু শোনাবার আছে, কামাল বললো, 'কিন্তু তোর পা মচকাল কেমন করে?'

চিন্তিতস্বরে শহীদ বললো, 'সে সব পরে শুনবি।'

গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠে হঠাৎ কামাল বলে উঠলো, 'তোকে চমকে ওঠার মতো একটা তথ্য আমি দিতে পারি শহীদ।'

শহীদ কোনো কৌতূহল প্রকাশ না করে কামালের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললো, 'আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তো সে তথ্য আমার জানা। তবে, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিলে তুই যে তথ্য জানিয়ে আমাকে চমকে দিতে চাইছিস সেটা আমিই তোকে জানিয়ে নিরাশ করে দিতে পারবো কিনা বুঝতে পারবো তখন।'

কামাল বললো, 'কি তোর প্রশ্ন?'

'তুই কি আলখেল্লাধারী কোনো ছায়ামূর্তিকে দেখতে পেয়েছিস আজ?'

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কামাল বললো, 'হ্যাঁ পেয়েছি। তবে···'

'তবে,' শহীদ গম্ভীর কণ্ঠে বললো, 'তুই কুয়াশাকে দেখতে পেয়েছিস এই কথাই বলতে চাস তো?'

'কামাল, আই হ্যাভ নো ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট! আমি যাকে দেখেছি সে কুয়াশা ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না। কিন্তু তুই কুয়াশাকে কখন দেখলি?'

মৃদু হেসে শহীদ বললো, 'আমি অবশ্য ঘটনাচক্রে অনুমান করেই স্থির সিদ্ধান্তে

পৌঁছেছি। সব কথা পরে শুনিস।'

ততক্ষণ ওরা বাংলোর একেবারে কাছাকাছি এসে পৌঁছেছিল। ড্রাইভার তিতু মিয়ার ঘরটার কাছে গিয়েই দুজনে একসঙ্গে থমকে দাঁড়ালো হঠাৎ। ডানদিক থেকে ভেসে এলো সেই রহস্যময়ী নারীর পাগলকরা খিল খিল হাসির আওয়াজ।

একটা গাছের আড়ালে আশ্রয় নিলো শহীদ ও কামাল। অপ্রত্যাশিতভাবে, খানিকটা দূর থেকে ভেসে এলো একটা মানুষের গলা, ফিসফিস কণ্ঠে লোকটি বললো, 'অফিসার ব্যাটার ঘুম কতক্ষণে ভাঙবে কে জানে! আজ প্রায় একমাস হয়ে গেল গুরুজীর সঙ্গে দেখা হয়নি। এদিকে এমন হঠাৎ করে এতগুলো মানুষ যে কোথা থেকে এলো, কিছুই বুঝতে পারছি না। ব্যাটাদের প্রাণে ভয় নেই একটুও। যে কোনো উপায়েই হোক, গুরুজীকে খবরটা পৌঁছাতে হবে।' অন্ধকারে আরও একজনের ফিসফিস গলা শোনা গেল, 'জানিস, ওদের এক ব্যাটাকে আজ শেষই করে ফেলতাম। কিন্তু একমুহূর্ত আগে দলের সর্দারটাই বুঝি এসে হাজির হলো। আমি পিছনে ছিলাম বলে আমার গায়ে গুলি লাগেনি, নয় তো…'

প্রথমজন বললো, 'আমার হাতটা ছড়ে গেছে শুধু। গুলিটা লেগেছিল ছুরির ফলায়। কিন্তু শাকিলের দুটো হাতই কেটে বাদ দিতে হবে।'

দ্বিতীয়জন বললো, 'গুরুজীর সঙ্গে দেখা করে ভালমত চিকিৎসার ব্যবস্থা না করতে পারলে শাকিলকে হয়তো বাঁচানোই যাবে না।'

কিছুক্ষণ কারও কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না আর।

ইতিমধ্যে খিল খিল হাসিটা একবার থেমে গিয়ে এবার বাম পাশ থেকে শুরু হয়েছে। একটু পরে আবার শোনা গেল প্রথমজনের অধৈর্য কণ্ঠস্বর, 'অফিসার ব্যাটা বের হচ্ছে না কেন বলতো? ভয়েই মরে যাচ্ছে না তো?'

দ্বিতীয়জনের গলা শোনা গেল, 'তবে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে রে! যেমন করেই হোক ওদের দুজনকে ঘর থেকে সরিয়ে আনতে হবে।' প্রথমজন বললো, 'তুই কিন্তু দোস্ত ওরা ঘর ছেড়ে বেরুলেই পাহাড়ে চলে যাবি। ঠিক পনেরো মিনিট পর আমি ঘরের ভেতর ঢুকে পড়বো যেমন করে পারি। দেখিস, শিকল টানতে যেন দেরি করিস না। তুই দেরি করলে কিন্তু আমি ধরা পড়ে যাবো।'

দ্বিতীয়জন বললো, 'তুই কিছু ভাবিস না দোস্ত, আমি ঠিক পনেরো মিনিটের মধ্যেই শিকল ধরে টান দেবো।'

এরপর আর কারও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

নারীকণ্ঠের খিল খিল হাসিটা বাংলোর চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন সময় অন্ধকারে লোক দুজনার পায়ের শব্দ শোনা গেল। শহীদ ও কামাল শব্দ শুনে বুঝতে পারলো বাংলোর দিকেই আরও খানিকটা এগিয়ে গেল ওরা।

কিছু বলবার জন্য মুখ খুলেছিল কামাল, কিন্তু সে মুখ খুলবার আগেই অচিন্তনীয় একটা ব্যাপার ঘটে গেল। অন্ধকারে ভেসে এলো শহীদের উদ্দেশ্যে একটা ভারি

কণ্ঠস্বর, 'লোকগুলোকে কোনমতেই ভিতরে ঢোকার সুযোগ দিও না শহীদ, ওদেরকে শেষ না করে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দাও শুধু।'

স্তম্ভিত রোমাঞ্চিত শহীদ অস্ফুটে বললো, 'কুয়াশা, তুমি!'

পরক্ষণেই বাংলোর চারপাশটা উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। কুয়াশা ফুলঝুরির মতো একটি জ্বলন্ত আতসবাজি বাংলোর সামনে ছুঁড়ে দিয়েছে। সে আলোয় দেখা গেল দুজন লোক শহীদের ঘর লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালো। আর একমুহূর্ত দেরি না করে ফায়ার করলো শহীদ। গুলির শব্দে বিমূঢ়তা কাটিয়ে লোক দুজন পড়িমরি করে ছুটতে আরম্ভ করলো।

বারান্দার ওপর এককোণে দাঁড়িয়েছিল আর একজন—দেখেই চেনা গেল লোকটা গফুর।

আতসবাজিটা তখনও জ্বলছে বাংলোর চারপাশটা উদ্ভাসিত করে। নারীকণ্ঠের খিল খিল হাসিটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। নিস্তব্ধ বনভূমিতে শোনা গেল পলায়নপর লোকগুলোর পায়ের শব্দ। কুয়াশার উদ্দেশে তাকালো শহীদ পিছন ফিরে। কিন্তু কুয়াশা তখন সেখানে নেই!

শহীদ ডেকে উঠলো, 'কোথায় তুমি, কুয়াশা?'

হঠাৎ নিভে গেল বাতিটা। কুয়াশার সাড়া মিললো না।

সকাল হয়ে যাবে আর কিছুক্ষণ পর। শহীদ চেয়ারে বসে গভীর চিন্তাচ্ছন্ন মুখে কামালকে বললো, 'এবার বল দিকি এতো রাত অব্দি কোথায় ছিলি—কুয়াশার পরিচয়ই বা কেমন করে পেলি?'

কামাল পথ হারিয়ে ফেলার কথা থেকে বেলেসার ইজ্জত রক্ষা করার ঘটনা সবিস্তারে উল্লেখের পর জানালো যে, সে আতাকুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসতে চেয়েছিল আদিবাসীদের নাচ গান কিছুক্ষণ দেখাশোনার পর। কিন্তু বেলেসার অনুরোধে সে ফিরে আসতে পারলো না। বেলেসা বললো নাচ-গান আর কিছুক্ষণ পরই আজকের মতো থেমে যাবে, তখন কামালকে বাংলোয় পৌঁছে দেবার জন্যে কয়েকজন লোক ঠিক করে দেবে তারা। কামাল বেলেসার প্রস্তাবে রাজি হয়েছিল। নাচ-গান শেষ হতে কয়েকজন লোক সঙ্গে করে ফিরে আসছিল কামাল। এমন সময় হঠাৎ কুয়াশার সরোদ বাজনায় হতবাক হয়ে যায় সে। এদিকে বাজনা শুনে আদিবাসী লোকগুলো তাকে ফেলে ছুটে পালায়। কুয়াশা নিমগ্ন ছিলো সুর সাধনায়। বাজাচ্ছিল মালকোষ।

কিছুক্ষণ পর বাজনা বন্ধ হয়ে গেল। কামাল দেখলো একটা কালো আলখেল্লাধারী বিশাল মূর্তি কয়েক গজ দূরের একটি গাছ থেকে লাফ দিয়ে পড়লো। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে ধীরস্থির পদক্ষেপে।

কামালের সব কথা শেষ হয়ে যাবার পরও তার বকবকানি থামলো না। যুবতী বেলেসার কথা থেকে থেকেই সে শোনাচ্ছিল আবেগভরে।

গভীর চিন্তার অতল তলে ডুবে গিয়েও শহীদ কামালের মন বুঝতে পেরে ক্ষণিকের জন্য না হেসে পারলো না। শহীদের ধ্যানমগ্ন মুখাবয়ব দেখে কোনো একসময় লজ্জিত হয়ে কামাল বেলেসার কথা বলা বন্ধ করলো।

পরবর্তী কয়েকটা দিন কামালকে প্রায়ই অনুপস্থিত দেখা গেল বাংলোয়। শহীদ কিন্তু ঘর ছেড়ে রাতে একবারের জন্যও বের হয় না। বাংলোর আশেপাশে এই কয়দিনে প্রতি রাতেই নারীকণ্ঠের অস্বস্তিকর খিল খিল হাসি শোনা যেতে লাগলো। কিন্তু শহীদকে একটুও বিচলিত হতে দেখা গেল না।

দিনের বেলা প্রায় প্রত্যেকদিনই শহীদ একবার করে বেরিয়ে যায় পাহাড়ের দিকে। সে সময়টুকুর জন্য ঘরে তালা মেরে যেতে ভোলে না সে। একাই যায়। গফুরকে বারবার সতর্ক করে দিয়ে যায় সাবধানে থাকতে।

ড্রাইভার তিতু মিয়াকে সেদিনকার রাতের ঘটনার পর আর দেখা যায়নি বাংলোতে। কামালের প্রশ্নের উত্তরে শহীদ বলেছিল, 'তিতু মিয়া যে ছদ্মবেশ ধারণ করে আছে সে তা আগেই অনুমান করেছিল একটা বিসদৃশ ঘটনা থেকে। আদিবাসী সর্দার আতাকু যেদিন বাংলোয় এসেছিল সেদিনই ধরা পড়ে যায় তিতু মিয়া শহীদের চোখে। তিতু মিয়া বলেছিল, এখানে সে সাত মাস ধরে আছে। তাহলে আতাকু তিতু মিয়াকে চিনতে পারলো না কেন? তাছাড়া, শহীদের মনে আরও আগে সন্দেহ হয়েছিল তিতু মিয়াকে সে যেন কোথায় দেখেছে। অবশ্যি, বিশালবনে কুয়াশার অস্তিত্বের কথা জানার পর তার স্মরণশক্তি আর ফাঁকি দেয়নি তাকে। ছদ্মবেশী তিতু মিয়া ছিলো আসলে কুয়াশারই বিশ্বস্ত অনুচর—মান্নান। এর আগে অবশ্যি তিতু মিয়া নামের একজন ড্রাইভার বিশালপুরে ছিলো, কিন্তু সে তিতু চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে কয়েক মাস আগে। মিস্টার হোসেনের ডায়েরী থেকে সে কথা বিশালবনে আসার পরের দিনই জানতে পেরেছিল শহীদ।

মাড়াই উৎসব চলছে আদিবাসীদের গ্রামে। কামাল বেলেসার আকর্ষণে রাতদিন পড়ে আছে সেখানে। শহীদ সব বুঝতে পেরেও কিছু বলে না কামালকে। শুধু এক-আধটা কথা বলে ঠাট্টা করে কখনো-সখনো। কামাল চটে উঠে আপত্তি করতে চায় শহীদের মন্তব্যে। শহীদ কিছু না বলে শুধু সবজান্তার হাসি হাসতে থাকে। তাতে কামাল রেগে যায় আরও।

একদিন কিন্তু হাসি-খুশি মুখ নিয়ে গুণ গুণ করে গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে কামালকে বাংলোয় ফিরতে দেখা গেল না। সকালবেলা গিয়েছিল কামাল বেলেসাদের গ্রামে। ফিরলো দুপুরেই।

কামালকে কেমন উত্তেজিত দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো শহীদ। ঘরে ঢুকে কামাল বললো, 'সাংঘাতিক ব্যাপার হয়েছে, শহীদ। গত রাতে আতাকু সর্দার কয়েকজন অপরিচিত সভ্য লোককে ধরে বেঁধে রেখেছিল। লোকগুলো নাকি ওদের

দেবতার গুহায় প্রবেশ করতে চেষ্টা করেছিল। মোট তিনজন লোককে দেখতে পেয়েছিল ওরা। একজন নাকি রাতেই ওদেরকে ফাঁকি দিয়ে ঢুকে গেছে সেই গুহায়।

'যে দুজনকে ওরা ধরে বেঁধে রেখেছিল তারাও আজ সকালবেলা পালিয়েছে বাঁধন খুলে। আশ্চর্যের কথা কি জানিস, আভাকুদের দেবতা হচ্ছে বিরাট একটি দশহাত লম্বা অজগর সাপ। তুমুল হৈ-চৈ পড়ে গেছে ওদের মধ্যে! বেলেসার কাছে সব শুনে খবরটা তোকে জানাবার জন্য ছুটে এসেছি। ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হচ্ছে না তোর কাছে?'

অন্যমনস্ক কণ্ঠে শহীদ বললো, 'কি মনে হচ্ছে না হচ্ছে সে কথা পরে হবে—কিন্তু কয়েকটি কথা অবশ্যই জানা দরকার। আচ্ছা, বলতে পারিস, আদিবাসীদের গাঁ থেকে গুহাটা কতো দূরে?'

কামাল বললো, 'খুব বেশি হলে পঁচিশ গজ।'

শহীদ বললো, 'গুহাটা নিশ্চয়ই পাহাড়ের ওপর?'

'হ্যাঁ।'

'ভিতরের দিকে অন্ধকার?'

''সুড়ঙ্গ মতো চলে গেছে পাহাড়ের ভিতর দিকে, কিছুদূর অব্দি দেখা যায়, তারপরেই অন্ধকার।'

'সুড়ঙ্গটা কোন্‌দিকে মুখ করে এগিয়েছে?'

'উত্তর দিকে।'

শহীদ চিন্তিত স্বরে বললো, 'তার মানে আমাদের বাংলোর দিকেই।'

'হ্যাঁ।'

ক'মিনিট কাটলো নীরবতার মধ্যে। হঠাৎ কামাল বললো, 'ওদের দেবতা অজগরটা সম্পর্কে আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে। আমাদের ঘরে যে অজগরটা পাওয়া গিয়েছিল ওটা সেটাই নয় তো?'

শহীদ বললো, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতা বিশালবনের ফরেস্ট অফিসারের বাংলোর চারপাশে জমাট বেঁধে রয়েছে। রাত আন্দাজ আড়াইটা হবে। ঘুমের ঘোরে মড়ার মতো বিছানায় পড়ে থাকার সময় এটা। শহীদের ঘরের ভিতর কোনো শব্দ নেই। বাতিটা জ্বলছে নিবু নিবু। শহীদ একাই আছে ঘরে। কামাল গেছে আদিবাসীদের মাড়াই উৎসবে। নিঝুম পড়ে আছে বাংলোটা। ঘুমের ঘোরে গফুরের নাক ডাকার শব্দ শুধু শব্দহীন রাতের সমাহিত পরিবেশে মাঝে মাঝে নিবিড় একটা কাঁপন তুলছে।

শহীদের বিছানায় মশারির অভ্যন্তরে দৃষ্টি যায় না। এমন সময় দেখা গেল ঘরের চারকোণা পাথরের মেঝের মাঝখান থেকে একটি বড় পাথর নিঃশব্দে এক বিঘত খানেক নিচে নেমে গিয়ে একপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল। পাথরটা সরে যেতেই একটা সুড়ঙ্গ দেখা গেল। পরক্ষণেই কালো কাপড়ে ঢাকা গোল মতো কি যেন একটা উঠে এলো

সুড়ঙ্গের মুখে। আরও খানিকটা উঠে এলো বস্তুটা, আরও খানিকটা। এবার দেখা গেল, গোল মতো বস্তুটি একটি মাথা, মানুষের মাথা। সুড়ঙ্গটার ভিতর দিক থেকে ধীরে ধীরে উঠতে লাগলো মিশমিশে কালো কাপড়ে ঢাকা একটি ছায়ামূর্তি। ছায়ামূর্তির সম্পূর্ণ শরীরটা বের হয়ে আসতে দেখা গেল তার হাতে চৌকোণ একটি ছোটো বাঁশের কাঠির তৈরি খাঁচা। খাঁচাটির ভিতর বিষাক্ত একটি মাকড়সা নড়াচড়া করছে সর্বক্ষণ। ছায়ামূর্তি ঘরের মাঝখান থেকে সরে গিয়ে কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ। তার চোখ দুটো নিষ্পলক, জ্বলছে যেন। মাকড়সার খাঁচাটা হাতে নিয়ে শহীদের বিছানার দিকে এগোলো সে। মশারির মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালো চোরের মতো, ক্ষণিকের জন্য মশারির পাতলা পর্দার ওপর চোখ রেখে ভিতরটা দেখে নিয়ে সন্তুষ্টির হাসি হাসলো। তারপর দ্রুত বসে পড়লো খাটের পাশে। অতি সাবধানে খুলে ফেললো হাতে ধরা খাঁচাটার তালা। তারপর এক হাতে মশারির কোণটা তুলে খাঁচাটা ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে খুলে দিলো দরজাটা একটা সুতো টেনে। বিষাক্ত মাকড়সাটা খাঁচা ছেড়ে শহীদের বিছানার ওপর নেমে যেতেই ছায়ামূর্তি সরে এলো খাটের পাশ থেকে। মশারির ভিতর থেকে একটি যন্ত্রণাকাতর অস্ফুট শব্দ শোনার জন্য কালো মূর্তির কান সজাগ হয়ে উঠলো। চোখ দুটো ক্ষুধার্ত হায়েনার মতো জ্বলতে লাগলো অন্ধকারে। এমন সময় আচমকা শোনা গেল শহীদের কঠিন গলা, 'হ্যাণ্ডস আপ!'

দেখা গেল বুকশেলফের পাশ থেকে এক পা সামনে এগিয়ে এসে রিভলভার হাতে দাঁড়িয়ে আছে শহীদ খান। শহীদের কণ্ঠস্বর শুনেই বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল আগন্তুক। শহীদকে রিভলভার তাক করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আস্তে আস্তে দুহাত মাথার ওপর তুলে দাঁড়ালো।

দেখেই বোঝা যায় লোকটা বিপুল শক্তির অধিকারী। আরও দু'কদম এগিয়ে এলো শহীদ। দৃষ্টি তার এক মুহূর্তের জন্যও আগন্তুকের দিক থেকে অন্যত্র সরে যায়নি।

শহীদকে ঘরের মাঝ বরাবর এগিয়ে আসতে দেখে মৃদু একটা ব্যঙ্গের হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল লোকটার মুখ থেকে। ভয়ঙ্কর দর্শন, ক্ষতবিক্ষত মুখ লোকটার। অসহায় অবস্থায় ধরা পড়ে যাওয়া সত্ত্বেও মুখে ভয়-ভাবনার লেশ মাত্র প্রকাশ পাচ্ছে না।

শহীদ শ্লেষাত্মক ভাষায় কিছু বলতে গিয়ে মুখ খোলবার আগেই একটা মোটা লোমশ হাত সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এসে শহীদের পা দুটো পেঁচিয়ে ধরে হেঁচকা টান মারলো। কিছু বলবার আগেই হুমড়ি খেয়ে মেঝের ওপর পড়ে গেল শহীদ। রিভলভারটা তখনও শক্ত হাতে ধরে ছিলো শহীদ। কিন্তু আগন্তুক লোকটা যেন এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলো। মুখ থুবড়ে পড়তেই সবুট একটা লাথি তার ডান হাতের ওপর এসে লাগলো, হাত থেকে ছিটকে গেল রিভলভারটা।

সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে মোটা লোমশ হাতটা যে রকম নিঃশব্দে বের হয়ে এসেছিল সে রকম নিঃশব্দেই আবার ঢুকে গেছে ভিতরে।

শহীদ উঠে বসার আগেই লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। কয়েক সেকেণ্ড

পরে ভয়ঙ্কর দর্শন লোকটা এলোপাতাড়ি ঘুসি চালালো শহীদের মুখ লক্ষ্য করে। শহীদ দুপায়ের বেড় দিয়ে হ্যাঁচকা টানে ছুঁড়ে ফেলে দিলো লোকটাকে। পরমুহূর্তে দুজনে একই সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো মেঝের ওপর।

শহীদ দেখলো, লোকটার হাতে ঝলকাচ্ছে একটা তীক্ষ্ণমুখ ভোজালী। শহীদকে নিরস্ত্র দেখে কুৎসিত হাসিতে ভরে উঠলো লোকটার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগে ভরা মুখ। এক পা এক পা করে এগিয়ে আসতে লাগলো লোকটা শহীদের দিকে। তারপর আচমকা শহীদের বুক লক্ষ্য করে ভোজালীসুদ্ধ ঝাঁপিয়ে পড়লো। শহীদ ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলেছিল পূর্বাহ্নেই। সে হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো, তারপর লোকটার হাঁটুতে দু'হাত দিয়ে মৃদু ভাবে এমন একটা আঘাত করলো যে পরমুহূর্তে দেখা গেল লোকটা পাথরের দেয়ালে গিয়ে আছাড় খাচ্ছে। ভোজালীটা লোকটার হাত থেকে খসে পড়েছে। দুজনারই নাগালের বাইরে রইলো সেটা। শহীদ উঠে দাঁড়াতে লোকটাও তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালো। আবার এগিয়ে আসতে লাগলো সে এক পা এক পা করে শহীদের দিকে।

শহীদ বুঝতে পারছিল, লোকটা বিপুল শক্তির অধিকারী। এতক্ষণ লড়ার পরেও লোকটার কিছু হয়নি যেন। লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে সে, এখনও শুরু করেনি। শহীদ ভাবলো, সময় নিয়ে ওকে ক্লান্ত করে পরাজিত করার আশা দুরাশা মাত্র। এ ক্ষেত্রে দ্রুত আক্রমণ এবং প্রচণ্ড আঘাত হানতে পারবে যে, জিত হবে তারই। দেরি না করে চিন্তাটাকে কাজে পরিণত করলো শহীদ।

লোকটা এগোচ্ছে, আর এক পা এগোতেই, শহীদ ঝাঁপিয়ে পড়লো লোকটাকে লক্ষ্য করে। প্রথম ঘুসিটা লাগলো ওর তলপেটে। কিছু বুঝতে না দিয়ে পর পর আরও দুটো ঘুসি চালালো শহীদ ওর মুখ লক্ষ্য করে। আঘাত করার মাত্রাতিরিক্ত নেশা তখন পেয়ে বসেছে শহীদকে। এলোপাতাড়ি ঘুসি চালাচ্ছে তখন সে লোকটার শরীরের বিভিন্ন জায়গায়। আচমকা শহীদ বুঝতে পারলো লোকটা তাকে পেঁচিয়ে ধরে খাটের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রাম করলো শহীদ খাটের কাছ থেকে সরে থাকতে। লোকটার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে পলকের জন্যে শিউরে উঠলো সে। বিছানার ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে বিষাক্ত মাকড়সাটা। কামড়ালে আর রক্ষা নেই, সঙ্গে সঙ্গে ভবলীলা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু লোকটার অক্টোপাসের মতো প্যাঁচ থেকে মুক্তি পেলো না শহীদ। বিছানার ওপর ফেলে দিলো তাকে লোকটা। শহীদও ছাড়বার পাত্র নয়। লোকটাকে সে দু'হাতে জাপটে ধরে রাখলো শক্ত করে। তারপর শুরু হলো ধস্তাধস্তি। প্রতি মুহূর্তে শহীদ আশঙ্কা করছিল মাকড়সার কামড়ের। সে খাটের কিনারায় পড়ে আছে, আর লোকটা প্রাণপণ চেষ্টা করছে শহীদের প্যাঁচ থেকে ছাড়া পেতে। হঠাৎ শহীদ বুঝতে পারলো লোকটা এক হাত দিয়ে মশারির দড়ি ছিঁড়বার চেষ্টা করছে, সুযোগটা ব্যবহার করার জন্য একমুহূর্ত মাত্র অপেক্ষা করতে হলো শহীদকে। মশারির দড়িটা ছেঁড়ার শব্দ হতেই শহীদ এক ধাক্কায় অনেকটা কাত করে ফেললো নিজের শরীরটাকে। কয়েক মুহূর্ত পাশাপাশি অবস্থান করলো দুজনে। ঠিক সেই

সময়েই মাকড়সাটা আট পা ফেলে ফেলে শহীদের ঠিক পিঠের কাছাকাছি এসে পড়লো। আরও দু'ইঞ্চি এগিয়ে এলেই কামড় দেবে মাকড়সাটা। শহীদ জানতেও পারছে না কি ভয়ঙ্কর ঘটনা এখুনি ঘটে যেতে পারে। এমন সময় লোকটি শহীদকে আবার পূর্ববৎ চিত করে শুয়েই দিলো এক ধাক্কায়। শহীদ অনুভব করলো তার পিঠের নিচে কি একটা যেন চেপে চটকে গেল। কিন্তু অনুভব শক্তি তখন সে একটু একটু করে হারিয়ে ফেলছে। যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। শ্বাস নিতে পারছে না কোনমতে। আক্রমণকারীর লোহার মতো শক্ত হাত তার কণ্ঠনালী চেপে ধরেছে। শক্তিহীন, নির্জীব, নিঃসাড় হয়ে পড়ছে সে। তার হাত দুটো আক্রমণকারীর পেশল বাহু থেকে খসে পড়লো ধীরে ধীরে। হাত দুটো খসে পড়তেই শহীদকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো লোকটি। শহীদের শরীরটা একটু সরিয়ে দেখলো, মাকড়সাটা চেপ্টে মরে গেছে একেবারে। ভয়ঙ্কর হিংস্রতায় লোকটি মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিলো বোজালিটা। শহীদের দিকে দু'পা এগিয়েই কিন্তু থমকে দাঁড়ালো সে। পাশের ঘরের দরজা খুলে কে যেন ভিতরে ঢুকছে। মাঝখানের দরজাটা খুলে গেল। লোকটি এক মুহূর্ত দেরি না করে এক লাফে সুড়ঙ্গটার ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। পরক্ষণে চৌকোণা পাথরটাও অদৃশ্য স্থান থেকে বেরিয়ে যথাস্থানে জোড়া লেগে গেল।

ঘরের ভিতর উত্তেজিত মুখে একটা মোটা লাঠি হাতে গফুর এসে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে।

শহীদ কামালকে আতাকু সর্দারের কাছে পাঠিয়েছিল। আগামী পরশুদিন রাত এগারোটার সময় কয়েকজন সাহসী লোক দরকার। লোকগুলোকে নিয়ে কামাল ওদের দেবতার গুহায় প্রবেশ করবে। কামাল আতাকু সর্দারকে সব কথা বুঝিয়ে দিয়েছে। বলেছে, ওদের দেবতা অজগর সাপটিকে হত্যা করেছে কয়েকজন দুষ্ট লোক। কামাল আতাকুকে বুঝিয়েছে, লোকগুলো আসলে ডাকাত। ওদের দেবতার গুহা দিয়ে প্রবেশ করলে ডাকাতগুলোকে হাতে নাতে-পাকড়াও করা যায়। লোক জোগাড় করে দিতে রাজি হয়েছে আতাকু সর্দার নির্দ্বিধায়।

সর্দার লোক জোগাড় করে দিতে রাজি এই খবরটা নিয়ে বাংলোয় ফিরে আসছিল কামাল। বেলেসাও সঙ্গে ছিলো। সে কামালকে খানিকটা এগিয়ে দেবার জন্য আসছিল।

কথা বলতে বলতে এগোচ্ছিল ওরা। হঠাৎ দু'জন লোক ঝোপের আড়াল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো ওদের ওপর। একজন লোক বেলেসাকে ধরার চেষ্টা করতেই বেলেসা 'উইস' বলে আর্তচিৎকার করে ছুটতে আরম্ভ করলো। পিছন পিছন লোকটিও ধাওয়া করলো।

দ্বিতীয় আক্রমণকারী কামালকে মাটিতে ফেলে দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ অসহায় করে রাখলো। সম্বিত ফিরে পেয়ে কামাল উঠতে চেষ্টা করলো। কিন্তু উঠে দাঁড়াবার আগেই

সে দেখতে পেলো লোকটি একটি ছোরা তার দিকে উঁচিয়ে ধরে উদ্ধত ভঙ্গিতে দু'পা ফাঁক করে প্রায় বুকের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে।

কামাল উঠেছিল। তার বুকের ধুকপুকুনিও বেড়ে গিয়েছিল। যে কোনো মুহূর্তে তীক্ষ্ণফলা ওই ছোরা তার বুকে আমূল বিদ্ধ করে দেবে লোকটি, এই আশঙ্কায় সে কাঁপতে লাগলো।

কিন্তু ব্যাপারটা ঘটলো সম্পূর্ণ অন্যরকম।

আচমকা পিছন দিক থেকে গাছের একটা মোটা ডালের প্রচণ্ড ঘা খেয়ে কামাল মাথা ঘুরে পড়ে গেল মাটিতে।

বেলেসাকে ধরতে না পেরে ফিরে এসেছিল যে লোকটি সে-ই পিছন দিক থেকে কামালের মাথায় হঠাৎ আঘাত করেছিল।

জ্ঞান ফিরে আসতে কামাল দেখলো একটা পাথরের গুহায় তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে আষ্টেপৃষ্ঠে। দুজন গুণ্ডার মতো লোক কথা বলছে নিচু কণ্ঠে। এমন সময় সম্পূর্ণ অভাবিত একটি কাণ্ড ঘটলো। গুহা মুখে আবির্ভূত হয়ে রিভলভার হাতে মিস্টার খোন্দকারকে পাগলের মতো হেসে উঠতে দেখা গেল। আশ্চর্য চোখে তাকালো কামাল। গুণ্ডার মতো দেখতে লোক দুটিও প্রথমে চমকে উঠলো, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে পরস্পর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করে ধীরে ধীরে এগোতে লাগলো মিস্টার খোন্দকারের দিকে। মিস্টার খোন্দকার তখন উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন লোক দুটির অবাধ্যতা দেখে।

'আর এক পা-ও এগিয়ো না শয়তানেরা, তাহলেই গুলি করবো।' বার বার গলা ফাটিয়ে কথা কটি বলে চলেছেন তিনি।

কিন্তু লোক দুটি কর্ণপাত করলো না তাঁর কথায়। হিংস্র জানোয়ারের মতো শিকার ধরার ভঙ্গিতে তারা এগোতেই থাকলো। কিছুই বুঝতে পারছিল না কামাল, কিন্তু পরক্ষণেই শিউরে উঠলো সে। দেখলো, মিস্টার খোন্দকারের তলপেট লক্ষ্য করে নিষ্ঠুর শয়তান দুজন ছোরা মারছে ঘন ঘন। এমন জঘন্য হত্যাকাণ্ড দেখার কথা কামাল চিন্তাও করতে পারে না।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মিস্টার খোন্দকারের শরীরটা পড়ে গেল মাটিতে। তারপরও ছোরার কোপ পড়তে লাগলো মিস্টার খোন্দকারের শরীরের যত্রতত্র।

জালে পড়া অসহায় সিংহের মতো গর্জাতে লাগলো কামাল। বিশ্রী গালাগাল বের হতে লাগলো তার মুখ থেকে। 'কুত্তার বাচ্চারা, তোমাদের শাস্তি পেতে হবে মানুষ খুন করার জন্যে—তা ভুলো না।'

একজন গুণ্ডা আরেকজনের দিকে তাকিয়ে হত্যার নেশায় বলে উঠলো, 'পাগলটার সঙ্গে এই শালাকে খতম করে দিই?'

অন্যজন বললো, 'খবরদার! গুরুজী তাহলে মুশকিল বাধাবে। তার চেয়ে মাথায় ছোরার বাঁটের ঘা মেরে অজ্ঞান করে দে শালাকে।'

ছোরা হাতে এগিয়ে এলো অপরজন। ছোরার বাঁটের প্রচণ্ড আঘাতে কামালের

মুখটা যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠলো, গলা দিয়ে শব্দ উঠলো, 'আঁ–আঁ–আঁ…।'

'হাঃ! হাঃ! হাঃ!'

দু'জন গুণ্ডার কুৎসিত হাসির শব্দের ভিতর আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেললো কামাল।

সাত

সন্ধ্যাবেলা গফুর এসে খবর দিলো কয়েকজন কাঠুরে শহীদের সঙ্গে দেখা করতে চায়। দ্রুত বের হয়ে এলো শহীদ ঘর থেকে। দেখলো, দু'জন কাঠুরের ছদ্মবেশে দু'জন পুলিসকে সঙ্গে নিয়ে মি. সিম্পসন বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মি. সিম্পসনও ছদ্মবেশী কাঠুরে সর্দার সেজে এসেছেন। চিনতে পেরে মৃদু একটা হাসিতে অভ্যর্থনা জানাবার কাজটি সারলো শহীদ। প্রত্যুত্তরে ছদ্মবেশী সিম্পসনের ঠোঁটেও একটা মৃদু হাসি পলকের জন্য খেলে গেল। তারপর কিছু বলবার জন্য এক পা এগিয়ে মুখ খুলবার আগেই গফুরের কড়া ধমক খেয়ে কাঁচুমাচু হয়ে চুপ করে গেলেন। গফুর মি. সিম্পসনকে চিনতে পারেনি। বললো, 'সামনে এগোচ্ছো কেন হে, যা বলবার ওখানে থেকেই বলো। সাহেব বুঝতে পারবেন।'

'হুজুর,' মি. সিম্পসন শহীদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'গাছ কাটার লোক আমরা, যদি কোনো কাজ পাই সেই আশায় এসেছি চিন্তাপুর থেকে, কাজকাম অনেকদিন হলো পাই না, তাই হুজুরের কাছে প্রার্থনা…'

শহীদ কিছু বলবার আগেই গফুর সাফ বলে দিলো, 'যাও এখন, কাজ-টাজ হবে না। এই সন্ধ্যেবেলা উনি এলেন গাছ কাটতে, ইয়ার্কি আর কি!' হাসি চেপে শহীদ বললো, 'না, না, বশির আলী, গাছ কাটার লোকের দরকার আছে। তুমি চা দাও দিকি আমাকে এক কাপ, আমি ওদেরকে কাজের কথাটা বুঝিয়ে বলি।'

বাহাদুরী করার সুযোগটা মাঠে মারা গেল দেখে গফুর আর কথা না বাড়িয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

মি. সিম্পসন এবার নিচু গলায় বললেন, 'এতো তাড়াতাড়ি তোমার টেলিগ্রাম পাবো আশা করিনি শহীদ, তোমার কৃতিত্ব দেখে আনন্দ অনুভব করছি।'

শহীদ মৃদু হেসে বললো, 'অনেক আগে সবকিছু মিটে যাওয়া উচিত ছিলো মি. সিম্পসন। তা যাকগে, আজ রাতেই সব রহস্যের উদঘাটন হবে।'

মি. সিম্পসন নিচু গলায় আবার বললেন, 'কতদূর কি জানতে পেরেছো সেটা শুনতে অধৈর্য না হয়ে পারছি না, শহীদ।'

শহীদ বললো, 'কয়েকটি আনুষঙ্গিক ব্যাপার ছাড়া মূল বিষয়বস্তুর কিছুই স্পষ্ট করে জানতে বা বুঝতে পারিনি এখনও আমি। তবে মূল রহস্যের সমাধান বের করার জন্যে যা জানার দরকার তা জানা হয়েছে। আজ রাতেই আপনার হাতে তুলে দিতে পারবো হত্যাকারীদের, এটুকু বলতে পারি।'

মি. সিম্পসন আর কিছু বললেন না। তার মুখে প্রশংসাসূচক হাসি দেখা দিলো। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'কামাল কোথায়?'

চিন্তিত স্বরে শহীদ বললো, 'কামালকে পরশু থেকে পাওয়া যাচ্ছে না, মিস্টার খোন্দকারও নিরুদ্দেশ হয়েছেন কাল থেকেই।'

'তুমি কোনো খোঁজ করোনি!'

'সম্ভাব্য সব জায়গাতেই অনুসন্ধান করেছি, কোথাও ওদের হদিস পাইনি। মি. খোন্দকারের জন্য আমার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। আজ রাতেই…'

এমন সময় গফুর আবার বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। বললো, সাহেব, চা দিয়েছি আপনার।

শহীদ ঘরে ফিরে যেতে গফুর ছদ্মবেশী মি. সিম্পসনের সঙ্গে তাচ্ছিল্যভরে কথা বলতে শুরু করলো।

কাঁটায় কাঁটায় রাত এগারোটা। পাহাড়ের উপর দ্রুত উঠে এলো শহীদ গফুরকে নিয়ে। একটা প্রকাণ্ড বড় পাথরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ওরা। শহীদ পকেট থেকে দুজোড়া রবারের গ্লাভস বের করলো দ্রুত। নিজে এক জোড়া পরে আর এক জোড়া গফুরকে পরে নিতে বললো।

তারপর বড় পাথরটার একটা ফোকরে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনলো একটা মোটা শিকল। শিকল ধরে সজোরে টান দিতেই আরও কিছুটা বের হয়ে এলো সেটা। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল হাত খানেক লম্বা ইঞ্চি চারেক চওড়া ফোকরটার ভেতর থেকে সড়াৎ করে বেরিয়ে এলো একটা লোহার কালো লিভার। লিভারটা ধরে ওপর দিকে ঠেলে তুলে দিলো শহীদ। তারপর গফুরের হাতে একটা রিভলভার ধরিয়ে দিয়ে জায়গাটা পাহারা দেবার কথা বুঝিয়ে বলে দ্রুত নেমে এলো পাহাড় থেকে।

গফুর একটা পাথরের আড়ালে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে পাহারা দিতে লাগলো লিভারটা।

মিস্টার সিম্পসন ও তাঁর লোকজনকে ঘরের ভিতরের সুড়ঙ্গটার মুখে রেখে একা এগিয়ে যাচ্ছে শহীদ। সুড়ঙ্গটা সঙ্কীর্ণ একটা পথ। শক্ত পাথরের উপর দিয়ে ক্রেপসোলঅলা জুতো পরে নিঃশব্দে এগোচ্ছে শহীদ। কোনো কিছুর সঙ্গে ধাক্কা লাগার আশঙ্কায় অতি সন্তর্পণে পা ফেলতে হচ্ছে তাকে। সুড়ঙ্গটা যেন শেষ হতেই চায় না। হাঁটছে তো হাঁটছেই। দু'দিকে পাথরের এবড়োখেবড়ো দেয়াল। মাথার ওপরেও অসমতল পাথরের ছাদ। শহীদ ভাবলো, ঠিক পাহাড়ের নিচে এসে পড়েছি এতক্ষণে। কিন্তু আর কতদূর? কোন পাতালপুরীতে গিয়ে শেষ হয়েছে এই পথ? আর মিনিট পাঁচেক পর শহীদ দেখতে পেলো একটু আলোর ম্লান আভাস। আলোর উৎসমুখটা দেখতে না পেলেও শহীদ বুঝতে পারলো কম পাওয়ারের বৈদ্যুতিক বালব্ জ্বলছে কোথাও। সতর্ক পায়ে হাঁটতে লাগলো

শহীদ। আলোটার কাছাকাছি পৌঁছতে ফাঁকা একটা জায়গা দেখতে পাওয়া গেল। ফাঁকা জায়গাটার চারপাশে ভাঙা, আধভাঙা পাথরের চাঙ্ পড়ে আছে। মৃদু হলুদাভ আলোয় শহীদ কাউকে দেখতে পেলো না। কোনো শব্দও আসছে না কোনো দিক থেকে। এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে গেল শহীদ। পাথরের আড়ালে আড়ালে থেকে সামনে এগোতে লাগলো সে।

পাথরের আড়ালও শেষ হয়ে গেল এক সময়। দেখা গেল সামনেই একটা ঘর। ঘরটা অসমতল পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে তৈরি করা হয়েছে। থমকে দাঁড়িয়েছিল শহীদ। ঘরের ভিতর থেকে কোনো শব্দ শোনার আশায় সে কান পেতে রইলো। কিন্তু না, কোনো দিকে কোনো শব্দ হচ্ছে না। ঘরের দরজাটা কোন্‌দিকে হবে ভেবে পেলো না শহীদ। তবু আন্দাজের উপর নির্ভর করে ডানদিক লক্ষ্য করে পা বাড়ালো সে। একটু এগোতেই একটা দরজা দেখতে পেলো। গাছের কাণ্ড দিয়ে অদ্ভুত উপায়ে তৈরি করা হয়েছে দরজাটা। জানালাহীন ঘরটার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে একটু চাপ দিতেই ফাঁক হয়ে গেল দরজাটা। সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ঢুকলো না শহীদ। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো সে। তারপর নিঃশব্দে ঢুকে পড়লো।

অন্ধকার ঘরে ঢুকে নরম কি যেন একটা বস্তুর ওপর পা পড়তেই থতমত খেয়ে দু'পা সরে গেল শহীদ। রিভলভারটা এক হাতে শক্ত করে চেপে ধরে পেন্সিল টর্চটা বের করে ঘরের মেঝেতে আলো ফেলতেই একটি মানুষের মৃতদেহ দেখে চমকে উঠলো সে। একনজর দেখেই বুঝতে পারলো মাত্র কিছুক্ষণ আগে লোকটিকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। ঘরের চারদিকটা যথাসম্ভব দেখে নিয়ে শহীদ হঠাৎ কি মনে করে ঘরের মাঝ বরাবর এগিয়ে গেল। ঘরের মাঝখানে ম্যানহোলের মতো একটা গর্ত দেখতে পেলো সে। গর্তটার মুখ থেকে কয়েকটা সিঁড়ি নেমে গেছে নিচের দিকে। ইতস্ততঃ না করে শহীদ নামতে লাগলো সিঁড়ি বেয়ে।

সিঁড়ির শেষপ্রান্তে সরু একটা পথ, কিছুদূর মাত্র গেছে পথটা, তারপর একটা ঘরের জানালা দেখা যাচ্ছে। ঘরের ভিতরের উজ্জ্বল আলো বাইরেও এসে পড়েছে। নিঃশব্দে জানালাটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো সে। কিন্তু ঘরে কোনো মানুষের অস্তিত্ব দেখতে পেলো না। অবশ্য বিস্মিত হবার মতো অনেক কিছুই রয়েছে ঘরটার ভিতরে। স্বনামধন্য কোনো পুরোদস্তুর প্রতিষ্ঠানের একটা ল্যাবরেটরী যেন ঘরটা। নানা প্রকার দুষ্প্রাপ্য এবং মূল্যবান বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ঘরটায় ঠাসা।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল শহীদ। এমন সময় একটা অস্পষ্ট শব্দ ঢুকলো তার কানে। এদিক-ওদিক তাকালো শহীদ। কিন্তু শব্দটার কোনো হদিস করতে পারলো না। তারপর ডানদিক লক্ষ্য করে জানালাটার কাছ থেকে সরে এসে এগোতে লাগলো গুটি গুটি। আর কয়েক পা এগিয়েই অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো শহীদ।

দেখলো, তার সামনে দু'জন লোক আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা অবস্থায় মেঝের ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে।

বিস্মিত ভাবটা কাটিয়ে উঠে আবার সামনে এগোতে লাগলো শহীদ। সে এখানে না আসতেই কে তার পথ পরিষ্কার করে রেখেছে, সে কথা ভেবে অবাক হলো সে।

আরো কিছুক্ষণ চলার পর বিশাল একটা হলঘরের সামনে এসে পৌঁছলো শহীদ। জনপ্রাণীর চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পাওয়া গেল না কোথাও। হলঘরটার ভিতর থেকে কার যেন ধমকের গলা শোনা যাচ্ছে। দরজা একটা রয়েছে বটে, কিন্তু সেটা বন্ধ। আর দরজা কিংবা জানালা কোথাও আছে কি না খুঁজে বের করার জন্য হলঘরের দেয়াল ধরে এগোতে লাগলো শহীদ।

কিছুক্ষণ পর একটি খোলা দরজার সামনে এসে পড়লো শহীদ। খোলা দরজা পথে অতি উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছে বাইরে। দু'পা এগিয়ে খোলা দরজা দিয়ে সতর্ক পায়ে হলঘরটার ভিতর ঢুকে পড়লো ও। সামনেই রয়েছে কয়েকটা বিরাট বড় কাঁচের জার। সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে আরও খানিকটা এগোলো শহীদ। তারপর শরীরটাকে একটা থামের আড়ালে লুকিয়ে রেখে মুখ বাড়ালো শব্দ লক্ষ্য করে। উজ্জ্বল বাতির নিচে কয়েকজন লোককে দেখে চিনতে পেরে ভয়ানক চমকে উঠলো শহীদ। স্তম্ভিত হয়ে গেল সে! এ-ও কি সম্ভব!

দশ-বারোজন লোকের মধ্যে তিনজনকে চিনতে পারলো সে। মৃত্যু, জ্বরা এবং রোগের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে এ সব শত্রুকে পরাজিত করার দুঃসাহসিক সংগ্রামে মেতে থেকে কুয়াশা কি ভীষণ অসাধ্য পরিশ্রম করে সৃষ্টি করেছিল তার জীবনের একমাত্র কাম্য বস্তু—একটি সত্যিকার চিরযুগজয়ী থিসিস্। বিশ্বাসঘাতকতা করে সেই অমূল্য থিসিসের অর্ধেকটা নিয়ে পালিয়েছিল নূরবক্স, তারপর আরও অর্ধেকটা সে হাতিয়ে নেয় কুয়াশার ভক্ত শিষ্য শক্তির কাছ থেকে। সেই জঘন্য চরিত্রের নূরবক্সকে এখানে দেখতে পাবে কল্পনাও করতে পারেনি শহীদ। আর দেখতে পেলো ড. ক্লিনসবার্গকে। ড. ক্লিনসবার্গ কুয়াশার বিশ্বস্ত বিজ্ঞান-সাধক। একটা লোহার মঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে রেখে ড. ক্লিনসবার্গের হাত দুটো পিছমোড়া করে একটা থামের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। কামালকেও দেখতে পেলো শহীদ একটি থামের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা অবস্থায়।

নূরবক্স ড. ক্লিনসবার্গের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে গর্বিত ভঙ্গিতে। এতক্ষণ ধরে বোধহয় সে ড. ক্লিনসবার্গকেই ধমকাচ্ছিল। ঠিক তাই। আবার নূরবক্স কথা বলে উঠলো উদ্ধত ভঙ্গিতে, 'ভাবছো কি ক্লিনসবার্গ, তোমার জন্যে মাত্র দু'টো রাস্তাই খোলা আছে। আবার বলছি হয় আমার কথামত কাজ করো, না হয় তিলে তিলে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে খতম হতে হবে তোমাকে!'

দৃঢ় কণ্ঠ শোনা গেল ড. ক্লিনসবার্গের, 'আমার একটিমাত্র উত্তর আছে—আমি কুয়াশার জন্য মরতে হয় মরবো, তবু তোমার মতো বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে কোনো আপোষ করবো না।'

নূরবক্স পাগলের মতো হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে বললো, 'কুয়াশা? সে এখন

থিসিসের শোকে পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছে। তার কথা আর বলে কি লাভ, সে এখন ঢোঁড়া সাপ বৈ আর কিছু নয়। আর আমি, আমিই হবো তার থিসিস অনুয়ায়ী সাধনা করে জয়ী—পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে একমাত্র আমিই হবো অমর।'

ড. ক্লিনবার্গ উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'মানবজাতির কলঙ্ক তুমি, প্রভুভক্ত যে কোনো কুকুরও তোমার চাইতে পবিত্র চরিত্রের অধিকারী।'

ড. ক্লিনসবার্গের কথা শেষ হবার আগেই সপাং করে একটা চাবুক এসে লাগলো তার মুখে। দাঁত কিড়মিড় করে নুরবক্স তার একজন অনুচরকে হুকুম দিলো, 'আগুন জ্বালিয়ে দাও ওখানে।'

ড. ক্লিনসবার্গকে যে লোহার মঞ্চে বেঁধে রাখা হয়েছিল তার নিচে কাঠ জড়ো করে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হলো। ড. ক্লিনসবার্গের মুখের কষা বেয়ে রক্তের ধারা ঝরে পড়তে লাগলো বুকের ওপর ফোঁটা ফোঁটা।

প্রচণ্ড রাগে কাঁপছিল শহীদের সর্বশরীর। সে যদি গুলি করে, তবে পালটা গুলিতে কাঁচের জারগুলো ভেঙে গিয়ে রাসায়নিক দ্রব্যে আগুন লেগে যাবে নির্ঘাৎ। তাছাড়া এতগুলো লোকের সঙ্গে সে একা যুঝেও উঠতে পারবে না। অথচ, ড. ক্লিনসবার্গের উপর নির্যাতন এখন ক্রমেই চরমে পৌছবে। শহীদ কি করবে ভেবে ঠিক করতে পারছিল না।

এমন সময় হঠাৎ মেশিন গানের ঠা-ঠা-ঠা শব্দে হতভম্ব হয়ে গেল শহীদ। নুরবক্স ছাড়া আর ছ'জন অনুচর এক পলকের মধ্যে ঢলে পড়লো মাটিতে।

নাটকীয় ব্যাপার নিঃসন্দেহে। শহীদ ভাবলো, কিন্তু এই নাটকের নায়ক কে? পরক্ষণেই একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর হলঘরের অদৃশ্য অংশ থেকে ভেসে এলো, 'মাথার উপরে হাত তুলে দাঁড়াও, নুরবক্স। আমি তোমার মৃত্যুদূত, কুয়াশা। থিসিসের জন্য পাগল হয়ে আছি আমি! প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এমন শাস্তি তোমাকে দেবো যে তা দেখে মানুষ শিউরে উঠবে। সে ব্যবস্থাও সারা হয়েছে। এখন শুধু থিসিসটা পেতে হবে আমায়। তারপর…'

খুট করে পিছনে একটা শব্দ হতেই শহীদ চকিতে পিছন ফিরে গুলি করলো। একটা লোক খোলা ভোজালি হাতে এগিয়ে আসছিল তাকে লক্ষ্য করে। একটি মাত্র আর্ত চিৎকার করে পড়ে গেল লোকটা।

রিভলভারের শব্দ মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই শহীদ শুনতে পেলো তার উদ্দেশে কুয়াশার কণ্ঠস্বর, 'নির্ভয়ে এগিয়ে যাও, শহীদ। ড. ক্লিনসবার্গের নিচে লোহা গরম হয়ে উঠেছে।'

উদ্যত রিভলভার হাতে আত্মপ্রকাশ করলো শহীদ। নুরবক্সের পিছনে এসে দাঁড়াতেই কুয়াশাকে দেখতে পেলো সে। কালো আলখেল্লা পরিহিত বিশাল মূর্তি, মেশিনগান হাতে অটল পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। আচমকা কুয়াশার পিছনে দৃষ্টি পড়লো তার। একটি লোক পিছন থেকে উঁচিয়ে ধরেছে মোটা একটি লোহার রড

কুয়াশার মাথা লক্ষ্য করে। অস্ফুট একটা শব্দ বের হলো শহীদের মুখ থেকে। শহীদের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা টের পেল কুয়াশা। ঘুরে না দাঁড়িয়ে এক হাতে মেশিনগানটা সামলে পিছন দিকে একটা লাফ দিয়ে আরেক হাতে কুয়াশা জড়িয়ে ধরলো আক্রমণোদ্যত লোকটিকে। তারপর অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় লোকটিকে মাথার উপর তুলে নিয়ে জোরে ছুঁড়ে দিলো ঘরের এককোণে। আশাতীত অঘটন ঘটে গেল নিমেষের মধ্যে। সেই সঙ্গে শহীদের রিভলভারটাও গর্জে উঠলো নুরবক্সের হাত লক্ষ্য করে। কুয়াশার ছুঁড়ে দেয়া লোকটা একটা বিরাট বড় কাঁচের জারের উপর গিয়ে পড়লো। জারের উপরের কাঁচটা ভেঙে লোকটা ভিতরে পড়তেই দপ্ করে একটা শব্দ হয়েই আগুন ধরে গেল। এদিকে কুয়াশার অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে নুরবক্স পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনছিল একটি রিভলভার। শহীদ গুলি করলো ঠিক যখন নুরবক্স রিভলভারটার অর্ধেকটা বের করে আনতে পেরেছে। গুলিটা নুরবক্সকে আঁচড়ও কাটলো না, শুধু রিভলভারটা পকেট থেকে বের হয়ে ছিটকে পড়লো দূরে।

জ্বলন্ত মানুষটাকে একবার দেখে নিয়ে কুয়াশা নুরবক্সের সামনে দাঁড়িয়ে কঠিন গলায় উচ্চারণ করলো, 'আমার থিসিসটা কোথায় রেখেছিস্, শয়তান?'

দু'হাত মাথার উপর তুলে দাঁড়িয়েছিল নুরবক্স: সেই অবস্থাই অকস্মাৎ হাঃ হাঃ করে হাসিতে ফেটে পড়লো সে। পাগলের মতো দেখাচ্ছিল নুরবক্সকে। ধরা পড়ে গিয়ে নুরবক্স কি পাগল হয়ে গেল? নাকি পালিয়ে যাবার সুযোগ তৈরি করবার জন্যে এটা একটা চাল?

গুরুগম্ভীর গলায় কুয়াশা আবার বললো, 'আমার থিসিস কোথায়?'

হঠাৎ হাসি থামালো নুরবক্স। চিৎকার করে বলে উঠলো সে, 'থিসিস! থিসিস চাও, না?'

আবার নুরবক্সের উন্মত্ত হাসিতে ভরে উঠলো ঘর।

হাসি বন্ধ হতেই কুয়াশার গলা কঠিনতর হয়ে গমগম করে বেজে উঠলো আবার, 'শেষবারের মতো জানতে চাইছি, থিসিস কোথায় রেখেছিস, নরাধম?'

চিবিয়ে চিবিয়ে নুরবক্স যেন ব্যঙ্গ করে বলে উঠলো, 'সত্যি, থিসিসটার খোঁজ এবার তোমাকে তাহলে দিতে হয়। তা ব্যাপারটা কি জানো, কুয়াশা, থিসিসটা তুমি নিজের হাতেই জাহান্নামে পাঠিয়েছ, বুঝলে কিছু?'

আবার হেসে উঠলো নুরবক্স উৎকট শব্দে।

এমন সময় ড. ক্লিনসবার্গ বলে উঠলেন, 'আমাকে এখান থেকে সরান তাড়াতাড়ি, আমি আর পারছি না সহ্য করতে।'

দ্রুত পায়ে ড. ক্লিনসবার্গের দিকে এগোলো শহীদ। ড. ক্লিনসবার্গের মুখ যন্ত্রণায় নীল হয়ে উঠেছে। কিন্তু তা ছাড়াও হতাশায় মাথাটা ঘাড় থেকে নুয়ে পড়তে চাইছে যেন। বাঁধন খুলে দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই ড. ক্লিনসবার্গের চোখের কোণে পানি দেখে বিস্মিত হলো শহীদ। মঞ্চ থেকে নেমে কান্নাজড়িত কণ্ঠে ড. ক্লিনসবার্গ কুয়াশার উদ্দেশে

বলেন, 'ব্যাপারটা ঠিক তাই ঘটেছে, স্যার! আপনি যে লোকটিকে কাঁচের জারের ভিতর ছুঁড়ে দিলেন সেই লোকটির কাছেই ছিলো থিসিসটার মাইক্রোফিল্ম। মূল থিসিসটা অনেক আগেই পুড়িয়ে ফেলেছে নুরবক্স।' ড. ক্লিনসবার্গের কথা শেষ হতেই অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতার মধ্যে কয়েক মুহূর্ত কাটলো শহীদের।

কুয়াশা সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়ে গগনবিদারী কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো— 'খোদা…আ…অ…'

কাঁপতে লাগলো কুয়াশা। কয়েক মিনিট কেটে গেল শোকাভিভূত নিস্তব্ধতায়। এমন সময় অনেক মানুষের মিলিত একটি হৈ-চৈ এর শব্দ কানে এসে লাগলো ওদের।

পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে নুরবক্স। কুয়াশার চিৎকার শুনে তার মতো জঘন্য চরিত্রের লোকও কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই কুয়াশার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'নুরবক্সকে আমি নিজের হাতে শাস্তি দেবো, শহীদ। ওকে আমি নিয়ে যাই।'

মেশিনগান হাতে এগিয়ে এলো কুয়াশা। হলঘরের একটা অংশে তখন যেন দোজখের আগুন জ্বলছে। কুয়াশা নুরবক্সকে বেঁধে ফেলে টেনে নিয়ে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে এমন সময় শহীদ বলে উঠলো, 'ওদিকে যেয়ো না, কুয়াশা, মি. সিম্পসন আছেন।'

কুয়াশা হাসিমুখে শহীদের দিকে তাকালো। তারপর অন্তরঙ্গ কণ্ঠে বললো, 'না শহীদ, তুমি যাকে মি. সিম্পসন বলে জানো তিনি এখন বাংলোর গ্যারেজে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় গজরাচ্ছেন। তার সেপাইগুলোর হালও একই হয়েছে। ওদের এই দুরবস্থার জন্য অবশ্য আমিই দায়ী। বাংলো ঘরের সুড়ঙ্গের মুখ পাহারা দিচ্ছে এখন আমারই লোকজন। মুচকি হাসলো শহীদ। কুয়াশা আবার বললো, 'চলি বন্ধু, আবার আমরা মিলিত হবো।'

নুরবক্সকে নিয়ে চলে গেল কুয়শা। কুয়াশার গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলো শহীদ শ্রদ্ধাবনত দৃষ্টিতে।

সংবিত ফিরে এলো শহীদের, নিকটেই অনেক মানুষের হৈ-চৈ শুনে। শোরগোল করতে করতে এগিয়ে আসছে কারা যেন। শহীদ বুঝতে পারলো, লোকগুলো আদিবাসী। ক'মুহূর্ত পরেই একটা দরজা দিয়ে আদিবাসী সর্দার আতাকুকে দেখা গেল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে। পিছনে রয়েছে আতাকুর মেয়ে বেলেসা এবং আরো অসংখ্য আদিবাসী।

বিরাট হলঘরের ভিতর ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়েছিল ওরা। তারপর বেলেসা হঠাৎ সকলকে ছাড়িয়ে কামালের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করতে করতে সবাই কামালের দিকে ছুটে গেল। বেলেসাকে কামালের বাঁধন খুলে দিতে তৎপর হয়ে উঠতে দেখা গেল।

আর কিছুক্ষণ পর কামালকে সঙ্গে নিয়ে ছুটতে ছুটতে সুড়ঙ্গপথ বেয়ে বাংলোতে উঠে এলো শহীদ। ঘরে কাউকে দেখতে পেলো না সে। শহীদ অবশ্য কাউকে দেখতে

পাবে আশা করেনি। ছুটলো এরপর দুজনে গ্যারেজের দিকে। ত্রস্ত হাতে ওরা মি. সিম্পসনের বাঁধন খুলে দিতেই তিনি রাগে গজরাতে গজরাতে কি যেন বলতে চাইলেন। কিন্তু তখুনি কার যেন একটা অস্পষ্ট আর্তচিৎকার ওদের কানে এসে প্রবেশ করলো। হঠাৎ কামাল বলে উঠলো, 'নুরবক্সকে জীবিত ধরতে হলে এবং কুয়াশাকে হাতে-নাতে ধরতে হলে আমার সঙ্গে আসুন, মি. সিম্পসন।'

কথা ক'টি বলেই ছুটলো কামাল শব্দ লক্ষ্য করে। মি. সিম্পসন আর বৃথা বাক্য ব্যয় না করে কামালের অনুগামী হলেন। তাঁর দেখাদেখি সেপাইগুলোও। শহীদ এক মুহূর্ত থমকে থেকে কি যেন ভেবে ওদের পিছু নিলো।

বাংলোর ডানদিকে, চার-পাঁচ শ' গজ দূরে একটি খাদ। আর্তচিৎকারটা সেদিক থেকেই ভেসে এসেছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা খাদের কাছে এসে পৌঁছালো। খাদের নিচে বয়ে চলেছে খরস্রোতা পার্বত্য নদী। ঝুঁকে পড়ে কল্পনাতীত একটা দৃশ্য দেখতে পেলো ওরা। কুয়াশা বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এমন অত্যাশ্চর্য ব্যবস্থা করছে দেখে ওরা বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ওরা দেখলো, খাদের নিচে তৈরি করা হয়েছে ঠিক যেন একটি নাগরদোলা। পানির তোড়ে অনবরত ঘুরে চলেছে সেটা। নাগরদোলার প্রচলিত আসনগুলোর পরিবর্তে দেখা যাচ্ছে কয়েকটা লোহার পাতের মতো, তার একটিতে নুরবক্সকে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে। অনেক উপরে একটি মাচারমতো তৈরি করা হয়েছে। আগুন জ্বলছে তাতে দাউ দাউ করে। নাগরদোলার অদ্ভুত ধরনের মোটা লোহার পাতগুলো একটি একটি করে নেমে যাচ্ছে নিচে, পানির কয়েক হাত নিচে। তারপর আবার উঠে এসে জ্বলন্ত মাচাটার ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। তারপর আবার নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে। একই ভাবে নুরবক্সও আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা অবস্থায় নেমে যাচ্ছে কয়েক হাত পানির নিচে, আবার উঠে এসে মাচার আগুনে ঝলসাচ্ছে বার বার।

হাত তিরিশেক নিচে মাচার আগুনের লালচে আলোয় বীভৎস ব্যাপারটা দেখতে পেলো ওরা। তখন নুরবক্সের আর্তচিৎকার আর শোনা যাচ্ছে না। কুয়াশার চিহ্নমাত্র ওরা খুঁজে পেলো না কোথাও। শুধু পার্বত্য নদীর খলখল হাসি শোনা যেতে লাগলো। ওদের কারও মুখে কোনো কথা ফুটলো না।

আট

রিজার্ভ করা একটা রেলের কামরায় চড়ে ফিরছিল কামাল, শহীদ আর গফুর। মি. সিম্পসন বেশালবনেই রয়ে গেছেন। জরুরী কয়েকটা কাজ বাকি আছে সেখানে।

বিষণ্ন হৃদয়ে শহীদ ভাবছিল, ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হচ্ছিলো সে, একজনকে অকালমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি বলে। কামাল প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল শহীদের দিকে, বললো, 'কই শুরু কর।'

শহীদ বললো, 'তোর কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে বল, উত্তর দিচ্ছি অল্প কথায়।'

একটু চিন্তা করে কামাল বললো, 'মি. খোন্দকারের ব্যাপারটা আমার কাছে এখনও রহস্যই রয়ে গেছে, শহীদ।'

'মিস্টার খোন্দকারের মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী।'

শহীদ কামালকে চমকে দিয়ে শুরু করলো, 'মি. খোন্দকার ছিলেন বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক। কিছুদিন আগে ভদ্রলোকের মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দেয়। ভদ্রলোক ইংরেজি ডিটেকটিভ উপন্যাসের খুব ভক্ত পাঠক ছিলেন। দিন-রাত ওইসব ক্রাইম উপন্যাস পড়ে পড়ে তিনিও নিজেকে ডিকেটটিভ বলে ভাবতে শুরু করেন।'

কামাল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এ সব তুই জানলি কেমন করে?'

'মি. খোন্দকারের ঘর তল্লাশি করে একটা ঠিকানা পাই আমি। সেই ঠিকানায় চিঠি লিখে আমি সব জানতে পারি।'

কামাল আবার প্রশ্ন করলো, 'নুরবক্সের লোক প্রতিদিন রাতে হাউই ছুঁড়তো সঙ্কেত জানাবার জন্যে, তাই না?'

শহীদ বললো, 'হ্যাঁ। নুরবক্সের পাঁচজন লোক ছিলো পাতালপুরীর বাইরে। প্রতিদিন বাংলোর বাতি নিভে যাবার একঘন্টা পর আকাশে হাউই ছোঁড়বার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তাদের।'

'কেন?'

'সঙ্কেতটার অর্থ হলো, অফিসাররা ঘুমিয়েছেন। সঙ্কেতটা নুরবক্সের পাতালপুরী থেকেও দেখা যেতো। তারপর দরকার বোধ করলে, অফিসারকে ভয় দেখাবার জন্যে বা তার বিছানায় বিষাক্ত মাকড়সা ছেড়ে দিয়ে হত্যা করবার জন্যে ঘরের পাথর সরিয়ে উঠে আসতো নুরবক্সের লোক।'

কামাল বললো, 'তা হলে পাহাড়ের উপর শিকল এবং লিভার থাকার মানে? ভিতর থেকেও তো লিভার সরিয়ে পথ করে নেবার বন্দোবস্ত ছিলো।'

শহীদ বললো, 'বাইরে থেকে পাতালপুরীতে নুরবক্সের সঙ্গে দেখা করার জন্য এই ব্যবস্থা। বাইরের পাঁচজনের ওপর ভার ছিলো ফরেস্ট অফিসারকে ভয় দেখানো, রাতে সঙ্কেত জানানো, এবং বিশেষ কোনো খবর থাকলে বাংলোর ভিতর দিয়ে সুড়ঙ্গ পথে গিয়ে নুরবক্সের সঙ্গে দেখা করে সব জানানো।'

কামাল বললো, 'বুঝলাম। আর নারীকণ্ঠের ওই খিল খিল হাসিটা নিশ্চয়ই টেপ করা?'

'হ্যাঁ।'

'কামাল প্রশ্ন করলো, 'নুরবক্স ফরেস্ট অফিসারদেরকে একের পর এক হত্যা করে যাচ্ছিলো কেন, তা আমার কাছে স্পষ্ট নয় এখনও।'

শহীদ বললো, 'অত্যন্ত সহজ এর উত্তর। নুরবক্সের যাতায়াতের একমাত্র সহজ পথ ছিলো বাংলোর ঘরটার মধ্যে দিয়েই। দ্বিতীয় আর একটি পথ সে ব্যবহারোপযোগী

করেছিল অজগর সাপটিকে হত্যা করে। কিন্তু এই পথটা ব্যবহার করা সম্ভব ছিলো না কোনো ক্রমেই। আদিবাসীরা তা হতে দিতো না কখনো। ফরেস্ট অফিসারেরা ঘরে থাকার ফলে নুরবক্স ও তার লোকজনরা নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারতো না। তার জন্যেই এই হত্যাকাণ্ড।'

শহীদের কথা শেষ হতেই কামরায় নেমে এলো অটুট নীরবতা। শুধু চলন্ত ট্রেনের একঘেয়ে আওয়াজ বিরামহীন বাজতে থাকলো কানে।

কুয়াশা ১১

এক

শীতের সকাল।

একটু আগে শহীদ, কামাল, মহুয়া ও লীনা একসঙ্গে নাস্তা সেরেছে। নাস্তা খাওয়া শেষ হতেই মহুয়া আর লীনা গেছে পাশের বাড়ির জিনা আপার কাছে উলের নতুন ডিজাইন শিখতে—আসলে পরচর্চা করতে। শহীদ পা পর্যন্ত গরম চাদরে আবৃত করে রোদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছে। তার হাতে একটা ফাইল। বিশালবন থেকে ফিরে শহীদ আবার তার ব্যবসায় মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছে। কামাল তার একমাত্র অংশীদার—ব্যবসাতেও। শহীদের বাড়িতে কামালের যাতায়াত তাই আগের মতোই অব্যাহত আছে।

নতুন একটা প্রোডাক্ট চালু করার আগে নমুনা হিসেবে বাজারে কিছু ছাড়া হচ্ছে। ফাইলটাতে সে সম্পর্কে নানান তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গভীর মনোযোগ সহকারে ফাইলটা তাই পড়ছিল শহীদ।

কামাল তার সামনে বসেছিল। সে তেপয়ের ওপর লীনার সদ্য কেনা পাঠ্যপুস্তকগুলো নেড়েচেড়ে দেখছিল।

শহীদের হাতে একটা বল-পয়েন্ট কলম। সে মাঝে মাঝে ঝুঁকে পড়ে ফাইলটাকে কায়দা করে ধরে জরুরী জায়গাগুলোতে দাগ দিচ্ছিলো।

এমন সময় গফুর একটা খাম হাতে করে ঘরে ঢুকলো। দাদামণির দিকে তাকালো সে একবার। তারপর হাতের খামটার দিকে। মুখ নিচু করে ভাবলো কি যেন। কাজের সময় দাদামণিকে বিরক্ত করতে চায় না সে। এমন সময় শহীদের ডাক শুনে চমকে উঠলো গফুর।

'গফুর!'

'বলো, দাদামণি।'

'তোর হাতে ওটা কি?'

'চিঠি, দাদামণি।'

'দে!' ফাইল থেকে মুখ না তুলেই ডান হাতটা গফুরের দিকে বাড়িয়ে দিলো শহীদ।

গফুর ওর হাতে ফিকে হলুদ রঙের খামটা তুলে দিতেই রোদের আলোতে খামের

ভিতরে চিঠিটার অবস্থান দেখে নিয়ে সাবধানে মুখটা ছিঁড়ে ফেললো শহীদ। তারপর খামের ভেতর থেকে দু'আঙুলের সাহায্যে চিঠিটা বের করে পড়তে শুরু করলো।

চিঠি পড়তে পড়তে শহীদের কপালের চামড়া কুঁচকে উঠলো। একটু পর চোয়ালের দু'দিকের মাংসপেশীও কঠিন হয়ে উঠলো যেন।

কামাল শহীদের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করছিল। সহজে বিক্ষুব্ধ বা বিচলিত হওয়ার পাত্র শহীদ নয়। কামাল এ কথা ভালো করেই জানে। সে তাই উদ্বিগ্ন না হয়ে পারলো না।

'কি ব্যাপার শহীদ?' কামাল উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

শহীদ কোনো কথা না বলে চিঠিটা কামালের দিকে বাড়িয়ে দিলো শুধু।

চিঠিটা নিম্নরূপ ঃ

প্রিয় শহীদ,

বিশেষ একটি জরুরী ব্যাপারে তোমার সাহায্য কামনা করে এই চিঠি লিখছি।

আমার একমাত্র পুত্র টুটুলকে কে বা কারা কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে। আমার বাড়ির আশপাশ থেকেই ওকে কিডন্যাপ করা হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। পুলিস এ পর্যন্ত ব্যাপারটার কোনো সুরাহা করতে পারেনি।

লোক মুখে এবং সংবাদপত্রে তোমার কীর্তি কাহিনীর কথা আমি অনেক শুনেছি। আমার ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞানগরিমা এবং কর্মনিপুণতায় তোমার মতো আর একটিও চোখে পড়েনি।

টুটুলকে উদ্ধার করার ব্যাপারে আমি তোমার সাহায্য কামনা করি। আশা করি, পুত্রশোকাতুরকে তুমি হতাশ করবে না।

ইতি
ড. আবু সুফিয়ান
জালালাবাদ

'তা তুই কি করবি এখন?' চিঠি পড়া শেষ হতেই শহীদের দিকে তাকিয়ে কামাল জিজ্ঞেস করলো।

'স্যারের অনুরোধ আমি উপেক্ষা করতে পারবো না।' শহীদ হাতের ফাইল আর কলমটা সামনে তেপয়ের ওপর রেখে চেয়ার থেকে পা দুটো নামিয়ে বসলো, 'তুই তো জানিস, উনি আমাকে কি স্নেহই না করতেন। প্রফেসর সুফিয়ানের কাছে আমি কতো দিক দিয়ে কতো ভাবে যে ঋণী, তোকে বলে বোঝাতে পারবো না। ভেবেছিলাম স্যারের ঋণ বুঝি এ জীবনে আর শোধ করতে পারবো না। এখন একটা সুযোগ পেয়েছি স্যারের সেবা করার। এমন সুযোগ কি আমি হেলায় হারাতে পারি? তুই-ই বল?'

'তাহলে কখন রওনা হচ্ছি আমরা জালালাবাদে?' কামাল আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করলো।

আমরা নয় বন্ধু। শহীদ হাসিমুখে মাথা নেড়ে বললো, 'এবার আমি একাই যাবো। তোর ওপর এবার ব্যবসা খবরদারী করার ভারটা দিয়ে যাবো ভাবছি।'

'এই কি তোর শেষ কথা?' অভিমান ফুটে ওঠে কামালের মুখে।

'তুই হঠাৎ এমন সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়লি কেন বলতো?' শহীদ কামালের আহত মুখভাবের দিকে তাকিয়ে বলে, 'ব্যবসাটাও তো কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়।'

'থাক, তোকে আর ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে না।' কামাল মাঝপথেই শহীদকে থামিয়ে দেয়, 'আমি বুঝেছি।'

কথাটা বলে পর্দা ঠেলে ঘরের বাইরে চলে যায় কামাল। শহীদ ওর যাওয়ার দিকে লক্ষ্য করে হাসতে থাকে। ভাবে, সত্যি কামালটা মাঝে মাঝে এমন অবুঝ হয়ে ওঠে। কিন্তু শহীদ তার সিদ্ধান্তে অটলই থাকে। কামালকে সে এবার সঙ্গে নেবে না কোনমতেই। একজনের অবর্তমানে বিজনেস যাতে লাটে উঠে না যায় সেজন্যে আর একজনকে অবশ্যই থাকতে হবে ঢাকায়।

মনে মনে ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলে শহীদ। তারপর গলা ছেড়ে হাঁক দেয়, 'গফুর।'

খানিক পর দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় গফুর, 'বলো, দাদামণি।'

'শোন, কাছে আয়।' শহীদ বলে, 'আজ রাতে আমি একটু বাইরে যাবো। তুই বিছানাপত্তর সব বেঁধে রাখ দিকি। আর শোন, সাড়ে সাতটার সময় একটা ট্যাক্সি ডেকে আনবি। বলবি, স্টেশন যায়েগা, কেমন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে বের হয়ে যায় গফুর।

টেলিফোনে রেলের সীট রিজার্ভ করে রেখেছিল শহীদ। স্টেশনে ট্যাক্সি থেকে নেমে মুটের মাথায় স্যুটকেস আর হোল্ডঅল চাপিয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে এগোতে থাকে সে। জালালাবাদ এক্সপ্রেস মাত্র কিছুক্ষণ আগে 'ইন' করেছে, ছাড়বে আর মিনিট সাতেক পর।

প্ল্যাটফর্মে বেজায় ভিড়। ভিড়ের মাঝখানে রাস্তা করে সামনে এগোনো মুশকিল। শহীদ ব্যস্ত হয়ে ওঠে। সঙ্গের মুটেটার ওপরও তার বিরক্তি প্রবল হয়ে ওঠে। ব্যাটা যেন নবাব পুত্তুর, আর একটু জোরে পা চালায় না কেন, ভাবছিল শহীদ।

এমন সময় প্ল্যাটফর্মের দূরপ্রান্তের একটা লাইটপোস্টের নিচে চোখ পড়তেই মুখভাব কঠিন হয়ে ওঠে শহীদের। লাইটপোস্টের নিচে একটা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে। মাথায় ফেল্ট ক্যাপ, মুখে চুরুট। তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের ফাঁকে চুরুটটা কায়দা করে ধরে ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়ছে লোকটা। ট্যাক্সি থেকে নেমে ড্রাইভারকে ভাড়া দেবার সময়ও লোকটাকে দূর থেকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছিল শহীদ। তখন অবশ্য ব্যাপারটার প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু, এই মুহূর্তে লোকটা তার দিকে উদ্দেশ্যহীন ভাবে অমন একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে সত্যিই অবাক হলো শহীদ।

আর কয়েক মিনিট পরই ট্রেন ছেড়ে দেবে। সুতরাং শহীদ আপাততঃ কামরাটা খোঁজায় মনোযোগ দিলো। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে, ভাবলো সে। আরও মিনিট খানেক সময় ব্যয় করার পর নির্দিষ্ট কামরাটি খুঁজে পেলো শহীদ। রেলওয়ের ট্যাগে লেখা নাম আর নম্বর দেখে মুটেকে মোট তুলতে বলে সে উঠে পড়লো। ট্যাগে আরও একজন যাত্রীর নাম লেখা ছিলো। কিন্তু শহীদ তাতে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। নিজের নাম খুঁজে পেয়েছে এই তার পক্ষে যথেষ্ট।

স্যুটকেস্‌টা সীটের নিচে ঠেলে দিয়ে হোল্ডঅলটা বাঙ্কের উপর পেতে নিলো শহীদ। ব্যাঙ্কে শুলে ট্রেনের দোলাটা লাগে কম। শোবার সুবিধা। তাই এই ব্যবস্থা।

ট্রেন ছাড়বার শেষ হুইসল পড়তে আর দেরি নেই। শহীদ একটা সিগারেট ধরিয়ে প্ল্যাটফর্মের বাইরে তাকালো। তার কামরায় আরও একজন যাত্রীর আসার কথা। সে এলো না কেন সে কথাই ভাবছিল শহীদ। হয়তো জরুরী কোনো কাজে আটকে গেছেন ভদ্রলোক, শহীদ ভাবলো, কিংবা, বলা যায় না স্টেশনে পৌঁছবার পথে হাসপাতালের ইমার্জেন্সী ওয়ার্ডেই হয়তো কাতরাচ্ছেন এখন ভদ্রলোক। আজকাল শহরে অ্যাকসিডেন্টের যা হিড়িক পড়েছে, কিছুই বলা যায় না নিশ্চিত ভাবে।

এমন সময় পূর্বোক্ত সেই লোকটাকে তার কামরার দিকে হন্তদন্ত হয়ে এগোতে দেখে অবাক না হয়ে পারলো না শহীদ। সঙ্গে গার্ড রয়েছে ট্রেনের। খুব সম্ভব নিজের কামরাটা খুঁজে পাচ্ছে না বলেই লোকটা গার্ডের শরণাপন্ন হয়েছে। কিংবা এটা হয়তো নিছক একটা ভান। আসলে লোকটার উদ্দেশ্যই খারাপ।

যা ভেবেছিল তাই। তার কামরার সামনেই এসে দাঁড়ালো লোকটা। গার্ড ট্যাগটার ওপর চোখ বুলিয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে বললো, 'এই কামরাতেই আপনার সীট, মি. জাফর।'

'থ্যাঙ্ক ফর দি ট্রাবল ইয়ু টুক।' ফেল্ট ক্যাপ মাথায় ভদ্রলোক গার্ডের দিকে হেসে কথাটা বলে হ্যাণ্ডেল ধরে কামরায় উঠে পড়লো।

শহীদ একপাশে সরে দাঁড়ালো। সে লক্ষ্য করলো লোকটার সঙ্গে পরনের কাপড়-চোপড় ছাড়া আর কিছুই নেই।

দীর্ঘ একটা হুইসল বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রদানবটা ধীরে ধীরে চলতে শুরু করলো। প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর ক্রমশঃ যেন ভয়তাড়িত কোনো জন্তুর মতো দ্রুত বেগে ছুটতে শুরু করলো সেটা।

ঢাকা স্টেশন পেরিয়ে বেশ কিছুদূর এগোবার পর শহীদ সরে এলো দরজা থেকে। তাকালো একবার শেষ মুহূর্তের যাত্রীটার দিকে। তারপরই অভাবিত একটা কাণ্ড করে বসলো সে। দরজা থেকে ছুটে এসে আগন্তুক যাত্রীটার ফেল্ট হ্যাটটা খামচে ধরে চুলসুদ্ধ টুপিটা খুলে নিলো তার মাথা থেকে। আগন্তুক ভদ্রলোক নিজের সীটে বসে পায়ের ওপর পা তুলে নিজস্ব ভঙ্গিতে চুরুট টানছিলেন। এমন একটা ব্যাপার যে ঘটতে পারে সে কথা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। শহীদ তার টুপিসুদ্ধ পরচুলাটা খুলে নিতেই ভদ্রলোক

আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলেন প্রায়, 'এই শহীদ, আস্তে!'

'তুই বুঝি সামান্য একটা পরচুলা আর হাভানা একটা চুরুটের দৌলতেই আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবি ভেবেছিস, না কামাল?' শহীদ মাথা দুলিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললো।

'কিন্তু তোকে যে শুরুতেই একটা ব্লাফ দিতে পেরেছি সেটা আশা করি অস্বীকার করতে পারবি না?' কামাল হাসিমুখে বললো।

'না, তা অস্বীকার করবো না। কিন্তু তুই ধরা পড়েছিস তোর কণ্ঠস্বরের জন্য। গার্ডকে ধন্যবাদ না জানালে হয়তো তুই কিছুক্ষণ তোর ছদ্মবেশ বজায় রাখতে পারতিস। আমার সজাগ কানকে ফাঁকি দেয়া তোর কাজ নয়।' কথাটা বলে সবজান্তার হাসি হাসে শহীদ।

'তাহলে, আমাকে সঙ্গে নিতে তোর আপত্তি নেই, কি বলিস?'

'এখন সে-প্রশ্ন অবান্তর। হাজার হোক, প্রাণাধিক বন্ধুকে তো আর চলন্ত ট্রেন থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারি না।'

'আচ্ছা, ট্রেন তো জালালাবাদে পৌঁছবে ভোর রাতে, তখন কি ড. সুফিয়ানকে বিরক্ত করা উচিত হবে আমাদের?' কামাল জিজ্ঞেস করে।

'আমরা তো স্যারের বাসায় উঠবো না। আমরা উঠবো হোটেল ডি-করোনেশনে। আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি, অকুস্থল থেকে সামান্য দূরত্ব বজায় রেখেই অনুসন্ধান কাজ চালানো বুদ্ধিমানের কাজ। তাতেই সুবিধা বেশি।'

'তার মানে?' কামাল বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করে।

'মানে খুবই সোজা।' শহীদ কোটের পকেট থেকে আজকের খবরের কাগজটা বের করে একেবারে কামালের নাকের কাছে ধরে, 'দেখ, এখন তোর পড়তে অসুবিধা হচ্ছে তো? কিন্তু নির্দিষ্ট একটা দূরত্ব বজায় রাখলেই পড়তেও সুবিধা হবে, আর চোখের ওপর স্ট্রেইনও কম পড়বে, ঠিক বলিনি কথাটা আমি?'

'ঠিক।' কামাল মৃদু কণ্ঠে উত্তর দেয়। 'তোর তুলনা হয় না!'

দুই

রাত শেষ হয়ে আসছে।

বরাবরের অভ্যাসমত নামাজ পড়ার জন্য ঘুম ভেঙে যেতে পাশের খাটের দিকে চোখ পড়তেই চোখমুখে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো আয়েশা বেগমের। তার মানে, আজও সারা রাত ড. সুফিয়ান ল্যাবরেটরিতেই কাটিয়ে দিলেন। চাপা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো আয়েশা বেগমের বুক থেকে।

নামাজ পড়া শেষ হতে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে গেলেন আশেয়া বেগম। চাকর

বাকরেরা এখনও কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি। বারান্দা পেরিয়ে ল্যাবরেটরির দিকে নজর পড়তে দূর থেকেই উজ্জ্বল বাতিটা চোখে পড়লো তাঁর। ঘরের দরজার পাল্লা দুটো হাট করে খোলা। দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে আয়েশা বেগম দেখতে পেলেন, টেবিলের ওপর মাথা ঠেকিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন ড, সুফিয়ান।

বেদনায় বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো আয়েশা বেগমের। নিজের অজান্তেই পা বাড়িয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ মেঝেতে কি দেখে ভয়ানক ঘাবড়ে গেলেন তিনি। পরক্ষণেই একটা আর্তচিৎকার বের হয়ে এলো তাঁর গলা থেকে। ভয়ের ভীষণ তাড়া খেয়ে চকিতে পিছিয়ে এলেন কয়েক পা। চোখ দুটো ভয় বিস্ময় আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো তাঁর।

হোটেল ডি-করোনেশনের ছাব্বিশ নম্বর সুইটের টেলিফোনটা ঝনঝন শব্দে আর্তনাদ করে উঠতেই ঘুম ভেঙে গেল শহীদের। টেলিফোনের শব্দ শুনে লেপের তলা থেকে মুখ বের করে তাকালো কামাল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শহীদের দিকে তাকাতেই শহীদ বললো, 'টেলিফোনের আর্তনাদ শুনে তোর কিছু মনে হচ্ছে না, কামাল?'

কামাল মাথা নাড়লো।

লেপের তলা থেকে ডান হাতটা বের করে রিসিভারটা তুলে নিতে নিতে শহীদ বললো, 'টেলিফোনের শব্দ কানে গেলেই আমি বুঝতে পারি খবর শুভ না অশুভ। হ্যালো...' আচমকা লেপটা এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে বিছানার উপর উঠে বসলো শহীদ। কানের ওপর রিসিভারটা চেপে ধরে মনোযোগ দিয়ে অপর প্রান্তের কথা শোনবার ফাঁকে ফাঁকে ... শোনা গেল তাকে, '...স্যার বলছেন? ...অ্যাঁ? ...আপনার ল্যাবরেটরির মেঝেতে...চেনেন না আপনি? ...পুলিসে খবর দেননি এখনও...একটু অপেক্ষা করুন তাহলে। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাবো, কি বলছেন, আপনি কিছুই বুঝতে পারছেন না? ...নিশ্চয়ই। ইতিমধ্যে ল্যাবরেটরিতে কাউকে ঢুকতে নিষেধ করুন।'

'কি ব্যাপার?' শহীদ রিসিভারটা ছাড়তেই কমাল উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা পড়েছে।' শহীদ গম্ভীর কণ্ঠে বললো, 'ড. সুফিয়ানের ল্যাবরেটরিতে একটি যুবতী মেয়ের লাশ পাওয়া গেছে আজ ভোর রাতে।'

'বলিস কি!' কামাল আশ্চর্য কণ্ঠে বলে, 'ভদ্রলোকের অবস্থা তো সঙ্গীন হয়ে উঠেছে তাহলে। আমি বুঝতেই পারি না, দুনিয়ায় এতো লোক থাকতে নিরীহ এই বৈজ্ঞানিকের ওপর এতো বিপদ নেমে আসছে কেন।'

'এটা তো খুব পুরানো কথা, ভালো মানুষেরাই তো সবচেয়ে বেশি দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে,' শহীদ বলে, 'কিন্তু তত্ত্ব কথার সময় এখন নয়, তুই তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে দেখি, আমাদেরকে এখুনি স্যারের বাড়িতে যেতে হবে।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে শহীদ ও কামাল হোটেল ডি-করোনেশনের

বাইরে এসে দাঁড়ালো। বাইরে অপেক্ষমাণ একটা বেবিট্যাক্সি কট কট আওয়াজ তুলে ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো। কোনরকম ইতস্ততঃ না করে উঠে পড়লো ওরা বেবিতে। তারপর ড্রাইভারের উদ্দেশে বললো, 'মনিপুর রোড চলো।'

মিটার ডাউন করে ড্রাইভার স্টার্ট দিলো গাড়িতে। শহীদ বাসিমুখে একটা সিগারেট ধরিয়ে বসে রইলো চুপচাপ বাইরের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ বেবিট্যাক্সির লুকিং-গ্লাসের দিকে নজর পড়তে তার যেন মনে হলো চকিতে দৃষ্টি সরিয়ে নিলো ড্রাইভারটি। মনে মনে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলো শহীদ। আবার বাইরের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে আচমকা চোখ রাখলো লুকিং-গ্লাসটায়। ধরা পড়ে গেছে এবার লোকটা। স্পষ্ট দেখলো শহীদ, লোকটার দুটো চোখ তার দিকে স্থির নিবদ্ধ। চোখাচোখি হতেই চকিতে দৃষ্টিটা সরিয়ে নিলো লোকটা।

মনিপুর রোড ধরে ছুটছিল গাড়িটা। মাইল তিনেক লম্বা মনিপুর রোড। রোডের শেষ প্রান্তে ডঃ সুফিয়ানের বাড়ি। মাঝপথেই কিন্তু গাড়ি থামিয়ে ফেললো ড্রাইভার।

নিবিষ্ট মনে কি যেন ভাবছিল শহীদ। গাড়ি থেমে যেতে নামতে গেল সে। এমন সময় কামাল বলে উঠলো, 'এখানে তো নয়। এই ড্রাইভার গাড়ি থামালে কেন হে? তেল নেই নাকি?'

তোতলাতে লাগলো ড্রাইভারটা। 'তে-তেল আছে সাহেব···কিন্তু, মানে, যাবেন কোথায় আপনারা? মনিপুর রোড বললেন না? এটাই তো মনিপুর রোড।'

গম্ভীর গলায় শহীদ বললো, সেটা তোমাকে বলে দিতে হবে নাকি, অ্যাঁ? এটা মনিপুর রোডই, কিন্তু মনিপুর রোড তো এখানেই শেষ নয়, তোমার কি মনে হয়?'

'জ্বী, হুজুর! আমি মনে করেছিলাম···'

কথা শেষ না করেই ড্রাইভার আবার স্টার্ট দিলো গাড়িতে। শহীদ আর কোনো কথা না বলে বাইরে দৃষ্টি ফেলে জায়গাটা দেখে নেয় এক ফাঁকে।

'থামো এখানে।'

শহীদের আদেশে ড্রাইভার ড. আবু সুফিয়ানের আর্কিমিডিস লজ-এর সামনে গাড়িটা দাঁড় করায়। মিটার দেখে পয়সা দিতে গিয়ে শহীদ লক্ষ্য করলো লোকটা ড. সুফিয়ানের বাড়ির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। ধমকে উঠলো শহীদ, 'এই মিয়া! হয়েছে কি তোমার? পয়সা নেবে না নাকি?'

'এই যে, হুজুর।'

ঘাবড়ে গিয়ে লোকটা শহীদের হাত থেকে পাঁচ টাকার নোটটা নেবার জন্য হাত বাড়ালো। কি মনে করে শহীদ টাকাসুদ্ধ হাতটা সরিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলো, 'ঘন্টা খানেক অপেক্ষা করতে পারবে তুমি? আমরা আবার ফিরে যাবো হোটেলে।'

লোকটা ইতস্ততঃ না করে উত্তর দিলো, 'পারবো, হুজুর।'

আর কোনও কথা না বলে শহীদ ও কামাল আর্কিমিডিস লজ-এর গেটের দিকে এগিয়ে গেল।

খোলাই ছিলো গেটটা। গেট ছাড়িয়ে ভিতরে ঢুকতেই ওরা দেখতে পেলো ড. সুফিয়ান দাঁড়িয়ে রয়েছেন উঁচু বারান্দায়। আয়েশা বেগমও রয়েছেন একটু দূরে। চাকর-বাকরেরা বারান্দার নিচে ভীত দৃষ্টিতে শহীদ ও কামালের দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে।

শহীদকে দেখে বারান্দা থেকে নেমে এলেন ড. সুফিয়ান। তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মুখ খোলার আগেই শহীদ বললো, 'আপনার টেলিফোনটা বোধ হয় উপর তলায়?'

ড. সুফিয়ান বললেন, 'হ্যাঁ।'

শহীদ বললো, 'পুলিসে ফোন করে নিচে নেমে আসুন আপনি। তারপর লাশটা দেখবো আমি।'

উপর তলায় চলে গেলেন ড. সুফিয়ান। মিনিট দু'তিন পরই নেমে এলেন নিচে।

শহীদের দিকে তাকাতেই শহীদ বললো, 'আপনার সব কথা পরে শুনবো, স্যার। তার আগে ল্যাবরেটরিতে চলুন, যেখানে মৃতদেহটা রয়েছে।'

চিন্তিত কণ্ঠে ড. সুফিয়ান বললেন, 'চলো।'

ল্যাবরেটরি রুমের দিকে হাঁটতে হাঁটতে শহীদ বললো, 'আপনার কথা এখুনি শুনতে চাইনি বলে কিছু মনে করবেন না, স্যার। পুলিসকে সব জানাতে হবে। তখনই সব শুনতে পাবো আমি। একই বক্তব্য শুধু শুধু দুবার করে যাতে না বলতে হয়...'

বাধা দিয়ে ড. সুফিয়ান বললেন, 'আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড। আমি কিছু মনে করিনি, শহীদ।'

ড. সুফিয়ানের ল্যাবরেটরি রুমটা বেশ বড়। একটা বড় টেবিল ঘরটার এককোণে। টেবিলের বামপাশে একটা টেবিল ল্যাম্প। সারা টেবিলটায় ছড়ানো রয়েছে বই, প্যাড, পেন্সিল। কয়েকটা বইয়ের পাতা খোলা। চেয়ারের ওপর একটা গরম চাদর অগোছাল ভাবে ঝোলানো, ফোনটা মেঝেতে লুটাচ্ছে। সমস্ত ঘর জুড়ে মাইক্রোস্কোপ, কাঁচের জার, টেস্টটিউব, হিটার ছড়ানো ছিটানো রয়েছে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশটা দেখে নিয়ে ঘরের ভিতর পা রাখলো শহীদ সন্তর্পণে। মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখলো গুলটেক্সের একটা নতুন চাদর জড়ানো একটি যুবতীর নিঃসাড় শরীর। বুক অবধি চাদরটা জড়ানো। মুখ, চুল, গলা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মেয়েটার। দেখে মনে হয় বিশ-বাইশ বছর বয়েস হবে। মুখটা দেখে সহজেই আন্দাজ করা যায় যুবতী সত্যিই খুব সুন্দরী। চাদর জড়ানো শরীরটার আভাস দেখেও বোঝা যাচ্ছে যুবতী স্বাস্থ্যবতী ছিলো। একটু যেন বেশিই। তবে দৃষ্টিকটু বলা যায় না। স্বাস্থ্যবতী বলতে যা বোঝায় তার বেশি নয়। মুখমণ্ডল গোলাকার মেয়েটির, ববছাঁট চুল।

ঝুঁকে পড়ে দেখল শহীদ, কিন্তু হাত দিয়ে কিছু ছুঁলো না সে। খানিকক্ষণ নিচু হয়ে দেখার পর টেবিল থেকে ল্যাম্পটা এনে গলাটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলো। তারপর ফিস্‌ফিস্ করে কামালকে বললো, 'গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে মেয়েটিকে।'

কামালও ফিস্‌ফিস্ করে কি যেন বললো শহীদকে। শহীদ কিন্তু তার কথায় মনোযোগ দিতে পারলো না। লাশটির ওপর ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সে তখন। দেখতে দেখতে মাটি থেকে তুলে নিলো সে চাদরটার একাংশ। জায়গাটা সাদা মতো এবং ভিজে। নাকে ঠেকিয়ে কি যেন শুঁকে উঠে দাঁড়ালো শহীদ। তার মুখ দেখে মনে হলো অদ্ভুত কিছু একটা দেখে সে বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না কিছুতেই। শহীদ উঠে দাঁড়াতেই বাইরে পুলিসের জীপ এসে দাঁড়াবার শব্দ শোনা গেল।

'আমার দেখা শেষ।' ল্যাবরেটরি ছেড়ে বের হয়ে আসতে আসতে শহীদ বললো। ইতিমধ্যে পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টর মি. হোজা বারান্দায় এসে পৌঁছেছেন। দূর থেকে শহীদকে দেখতে পেয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এলেন তিনি।

'আরে, সাহেব, এ যে দেখছি আমাদের বিশ্ববিখ্যাত শার্লক…'

বাধা দিয়ে শহীদ বললো, 'থাক, থাক, নিজেকে আর ঠকাতে চেষ্টা করবেন না দয়া করে।'

বেশ কিছুদিন আগে শহীদ খানের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার জন্য মিস্টার হোজার প্রমোশন বন্ধ ছিলো তিন বছর। মি. হোজার খোঁচার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে অসুবিধা হলো না তাই শহীদের।

মি. হোজা শহীদের কথা বুঝতে না পারার ভান করে তার মেদবহুল কোমরে দুহাত ঠেকিয়ে হাসিমুখে প্রশ্ন করলেন, 'এটা আবার কি রকম হেঁয়ালী ভরা কথা হলো, মানে বুঝলাম না।'

কামাল সামনে এগিয়ে এসে উত্তর করলো, 'কথাটার মানে হলো, আপনারা কি আর খুশি মনে শহীদ খানকে অসাধারণ মেধাবী শার্লক হোমসের সাথে তুলনা করেন? মনে মনে নিশ্চয়ই ঈর্ষা হয়, তাই মাত্রাতিরিক্ত বাহাবা দিলেই শহীদ খান ধরতে পারে ব্যাপারটা আর কিছু নয়, ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স, ঈর্ষা ঢাকার অপকৌশল মাত্র।'

পরিবেশ ভুলে গলা ফাটিয়ে হেসে উঠলেন মি. হোজা। সে হাসি থামতেই চায় না আর। কোনরকমে যখন সামলে নিলেন, তখন শহীদ অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। বারান্দা থেকে তার দৃষ্টি কখন বাড়ির গেটের দিকে আটকে গেছে কেউ জানে না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কি যেন দেখছে সে।

মি. হোজা বললেন, 'কি ব্যাপার মি. শহীদ, এনিথিং রং?'

'ওহ্, নো।'

শহীদ মৃদু হেসে উত্তর দিলো মি. হোজার প্রশ্নের। তারপর বললো, 'আপনার কাজ সেরে নিন আপনি। আমি যা দেখার দেখে নিয়েছি আগেই। আমি ড. সুফিয়ানের কাছ থেকে এখনও কিছু শুনিনি, একই সঙ্গে শুনবো ভাবছি।'

'ভালো কথা। ডাক্তার রহমান এবং ফটোগ্রাফার এখুনি পৌঁছে যাবে। যা দেখার দেখে নিয়ে একটা কনস্টেবলকে পাহারায় বসিয়ে রেখে এখুনি আসছি আমি।'

মি. হোজা একজন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে ল্যাবরেটরির উদ্দেশে পা বাড়ালেন। ড. সুফিয়ান, শহীদ ও কামালকে ড্রইংরুমে বসতে বলে মি. হোজার অনুগামী হলেন। ফিরে এলেন দশ মিনিটের মধ্যেই।

চা-পান ইত্যাদির পর মি. হোজা প্রশ্ন করলেন, 'এখন বলুন ড. সুফিয়ান, মৃতদেহ আপনিই কি প্রথম দেখতে পান?'

'না, আমার স্ত্রী প্রথম দেখেন। তাঁর চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে যায়। প্রথমে কিছুই বুঝতে পারিনি আমি। তারপর আমার স্ত্রীর দৃষ্টি অনুসরণ করে মেঝের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে যাই।'

সঙ্গে সঙ্গে মি. হোজা প্রশ্ন করেন, 'ঘুম ভেঙে যেতেই মৃতদেহ দেখতে পেলেন আপনি?'

ড. সুফিয়ান ইন্‌স্‌পেক্টরের সন্দিগ্ধ প্রশ্নে একটু অবাক হন। তারপর ছোট্ট করে উত্তর দেন 'হ্যাঁ।'

'কিভাবে সেটা সম্ভব?' আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন মি. হোজা।

'কেন, আমি কি ভুল বলছি?' রীতিমত অবাক হন ড. সুফিয়ান।

'লাশ পাওয়া গেল আপনার ল্যাবরেটরিতে, আর ঘুম ভাঙতেই আপনি দেখতে পেলেন মেঝের উপর লাশ, এ-ও কি কখনও সম্ভব ড. সুফিয়ান?'

ভুল বোঝাবুঝিটা ধরতে পেরে শহীদ কিছু বলতে যাচ্ছিলো। তার আগেই ড. সুফিয়ান বলে উঠলেন, 'গতরাতে কাজ করতে করতে ল্যাবরেটরিতেই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'তাই বলুন।'

মি. হোজা যেন একটা রহস্য উন্মোচন করতে পেরে শহীদের দিকে তাকিয়ে তৃপ্তির হাসি হাসেন। তারপর প্রশ্ন করেন, 'মেয়েটি কে? মানে, মেয়েটি সম্পর্কে আপনি কি জানেন বলুন।'

ড. সুফিয়ান ধীর কণ্ঠে বলেন, 'কিছুই জানি না আমি। মেয়েটি সম্পর্কে কিছু জানা তো দূরের কথা মেয়েটিকে আমি জীবনে কখনও দেখিনি পর্যন্ত।'

মি. হোজা তাঁর মুদ্রাদোষে আওড়ালেন, 'এও কি সম্ভব?'

'মানে?' ড. সুফিয়ান বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করেন।

মি. হোজা তাড়াতাড়ি বলেন, 'কিছু মনে করবেন না, আপনাকে কিছু বলিনি। আচ্ছা ড. সুফিয়ান, আপনার আত্মীয়-স্বজন বা চেনা-শোনা কোনো বাড়ির মেয়ে বলে একে স্মরণ করতে পারেন কি না দেখুন তো?'

ড. সুফিয়ান একটু ভেবে বললেন, 'কাউকে একবার দেখলে কি সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়া সম্ভব? তাছাড়া মেয়েটি অপূর্ব রূপসী। ও মুখ একবার দেখলে অনেকদিন মনে থাকারই কথা। তাছাড়া, এখানে আত্মীয়-স্বজন বলতে আমার কেউ নেই-ও।'

'আপনার স্ত্রী?'

'আমার স্ত্রী?' তাহলে আমিও চিনতাম।

'গতকাল রাতে কখন আপনি ল্যাবরেটরিতে ঢোকেন?'

'ঘড়ি দেখিনি আমি, তবে রাত আন্দাজ আটটা হবে।'

'তারপর আর বের হননি একবারও?'

'না।'

'রাতে খাবার সময়ও নয়?'

'না। কাসেমকে খাবার পাঠিয়ে দিতে বলেছিলাম।'

'কাসেম কে?'

'আমার চাকর।'

'কখন সে খাবার পৌঁছে দেয় আপনাকে?'

'সাড়ে ন'টার সময়।'

মি. হোজা একটু দম নিয়ে আবার শুরু করেন, 'খাওয়া শেষ হতে বাসন-কোসন নিতে এসেছিল কে?'

'কাসেমই।'

'সেটা কখন বলতে পারেন?'

ড. সুফিয়ান একটু ভেবে উত্তর দিলেন, 'রাত একটার কম নয়।'

মি. হোজা ভ্রূ-কুঁচকে প্রশ্ন করেন, 'কাসেম অতো রাত পর্যন্ত আপনার এঁটো বাসন নিয়ে যাবার জন্যে জেগেছিল? কিংবা ইতিমধ্যে সে কি করছিল? এঁটো বাসন তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় কি রাত একটা? এও কি সম্ভব?'

ড. সুফিয়ান ব্যাপারটা খোলাসা করে বলেন, 'আসলে সাড়ে ন'টার সময় আমাকে খাবার দিলেও আমি তখুনি খাইনি। খিদে পেতে কাজ বন্ধ করে যখন খেতে শুরু করি তখন রাত বারোটা। আমার একটা বাজে অভ্যাস আছে—খেতে বসেও বই নিয়ে থাকি। গতরাতে খেতে খেতে বই পড়ছিলাম বলে বেশ সময় লাগে। খাওয়া শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পরই কাসেম এঁটো বাসন নিয়ে যায়। তখন রাত আন্দাজ একটাই হবে। ওকে আমি ছোটবেলা থেকেই জানি। খুব ভালবাসে ও আমাকে। রাতে আমার কখন কি দরকার হয় ভেবে প্রায়ই অনেক রাত পর্যন্ত ও জেগে থাকে। গতকালও ছিলো। গতকাল এঁটো বাসন নিয়ে যাবার সময় ও আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল চা বা কফি করে দেবে কি না। বলেছিলাম, আমার কিছু লাগবে না। তারপর ওকে ডেকে একটা ধমকও দিয়েছিলাম এতো রাত পর্যন্ত জেগে থাকার জন্যে। তখুনি গিয়ে শুয়ে পড়তে বলেছিলাম। মাথা নেড়ে ও চলে যেতে আমি আবার কাজে মগ্ন হয়ে পড়ি। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই।'

ড. সুফিয়ান থামতে মি. হোজা প্রশ্ন করেন, 'কাসেমের সঙ্গে রাত আন্দাজ একটায় কথা বলার সময় ল্যাবরেটরির মেঝেতে আপনি কিছু দেখেননি?'

'না।'

'আচ্ছা রাত ক'টা নাগাদ আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বলতে পারেন ড. সুফিয়ান?'

'ঠিক জানি না, তবে দুটো আড়াইটা হবে বোধ হয়। ক'দিন থেকে ভালো করে ঘুম হচ্ছে না আমার, খুবই ক্লান্ত ছিলাম আমি।'

মি. হোজা প্রশ্ন করেন, 'কোনরকম শব্দ গতরাতে সন্দিগ্ধ করেনি আপনাকে?'

'স্মরণ করতে পারছি না, তবে শুনিনি বোধ হয়। শুনলে ভুলে যাবো কি করে?'

'আপনার কোনো শত্রু আছে, ড. সুফিয়ান?'

নির্দ্বিধায় উত্তর দিলেন ড. সুফিয়ান, 'না!'

মি. হোজা এবার ঘুরিয়ে প্রশ্ন করেন, 'আপনাকে বিপদে ফেলে কারো লাভ হয়ে যাবে বা কেউ খুশি হবে আপনার সর্বনাশ হতে দেখলে, এমন কোনো লোক আছে?'

ড. সুফিয়ান এবার গভীর চিন্তায় ডুবে যান। তারপর ভাঙা গলায় বলেন, 'আমার ধারণায় কেউ নেই, অর্থাৎ তেমন কাউকে আমি চিনি না। কিন্তু, জানেনই তো আপনারা, আমার টুটুলকে কে বা কারা কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে। তার কোনো হদিস তো আপনারা করতে পারলেন না। সে কথা স্মরণ করে বলতে বাধ্য আমি—আমাকে বিপদে ফেলে নিশ্চয়ই কারো লাভ আছে। আমার ছেলের জন্য দু'লক্ষ টাকা চেয়েছে—এটা তো প্রত্যক্ষ লাভ। কিন্তু এ ব্যাপারে কার কি উদ্দেশ্য তার আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

এতক্ষণ শহীদ আর কামাল একটি কথাও বলেনি। ড. সুফিয়ান থামতে শহীদ বললো, 'আমি দুটি মাত্র প্রশ্ন করতে চাই, স্যার। আমার প্রথম প্রশ্ন হলো, জালালাবাদে আপনি কাকে কাকে চেনেন?'

'পরিচিত বলতে জালালাবাদে আমার তেমন কেউ নেই। নির্জনে নিজের রিসার্চ করবো বলে আমি এখানে এসে উঠেছি আজ বছর দুয়েক হলো। অবশ্য, ইদানীং আমার পূর্ব পরিচিত এক ভদ্রলোক জালালাবাদে এসেছে, বোধহয় ছবির শূটিং করতে। সাবির চৌধুরী নাম, আমার এককালের বন্ধু বলতে পারেন, অনেকদিন হলো ওর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই আমার।'

'ব্যাপারটা খুলে বলতে পারেন, স্যার?'

কোনো প্রকার ইতস্ততঃ না করে ড. সুফিয়ান বললেন, 'উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নয়। কলেজে আমরা একসঙ্গে পড়েছি, এই পর্যন্ত। পরবর্তী জীবনে আমি যখন প্রফেসর ছিলাম ও তখন ছায়াছবির পরিচালক। মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হতো, কিন্তু তার বেশি আর কিছু নয়। একদিন হঠাৎ রাস্তায় ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। কুশলাদি বিনিময়ের পর যে যার পথে চলে যাওয়াই স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু ওর একটা নতুন ছবি রিলিজ হয়েছে তখন। আমাকে ধরে রাখলো ছবিটা দেখার জন্যে। ছবি আমি দেখতাম না তা নয়। তবে ইংরেজি ছবি ছাড়া বাংলা বা উর্দুতে রুচি ছিলো না তেমন। রাজি হতে চাইনি সাবিরের অনুরোধে। ও কিন্তু ছাড়েনি আমাকে। জোর করে ধরে নিয়ে গেল সিনেমা হলে। কিছুতেই নিস্তার মিললো না ওর হাত থেকে।

'কিন্তু অর্ধেকটা দেখার আগেই মেজাজ খিঁচড়ে গেল আমার। স্থূল যৌন আবেদন, নিছক ভাঁড়ামি, অসামঞ্জস্যপূর্ণ সংলাপ, ত্রুটিপূর্ণ বেশ-বাস পরিবেশ নির্দেশনা ইত্যাদি ধৈর্য ধরে দেখা আমার কাছে শাস্তি কঠিন বলে মনে হতে লাগলো। সম্পূর্ণ ছবিটা না দেখেই হল থেকে বের হয়ে আসতে চাইলাম আমি। সাবির কিন্তু আমাকে বেরুতে দিলো না। আটকে রাখলো। ছবির পরের অংশটুকু কদর্য-কুৎসিত, এককথায় জঘন্য। তবু শেষ পর্যন্ত দেখতে হলো। হল থেকে বেরিয়ে মুখে যা এলো তাই বলে গালাগাল দিলাম এইসব ছবির নির্মাতাদের। সাবিরও ছেড়ে কথা বলেনি। ওর কথা হলো, টাকা রোজগারই আসল কথা। তাছাড়া, জনসাধারণ নাকি এই জাতীয় ছক বাঁধা ছবিই ভালবাসে। তুমুল কথা কাটাকাটির পর রেগে মেগে আগুন হয়ে যে যার পথে রওনা হয়েছিলাম । এই ঘটনার কিছুদিন পর আমি শহর রাজধানী ত্যাগ করে জালালাবাদে চলে আসি। তারপর থেকে ওর সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি।'

ড. সুফিয়ান থামতে একটু পর শহীদ বললো, 'মি. সাবির এখানে এসেছেন কতদিন হয় বলতে পারেন?'

'সঠিক জানি না, মাস দেড়েক হবে হয়তো।'

'আপনি জানলেন কিভাবে সাবির সাহেব জালালাবাদে এসেছেন?' প্রশ্ন করলেন মি. হোজা।

'আমার স্ত্রীর কাছ থেকে।'

'আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো,' শহীদ কিছুটা ইতস্ততঃ করে বললো, 'আপনি কি গতকাল ড্রিঙ্ক করেছিলেন—দিনে বা…'

শহীদের কথা শেষ হতেই ড. সুফিয়ান ব্যথিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, এ কি বলছো, শহীদ। আমি জীবনে কখনও মদ ছুঁইনি।'

ড. সুফিয়ানের কথা শেষ হতে মি. হোজা বললেন, 'আমার আর জিজ্ঞেস করবার কিছু নেই, ড. সুফিয়ান। এবার মিসেস সুফিয়ানকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। তারপর একে একে চাকরগুলোর জবানবন্দী নেবো।'

ড. সুফিয়ান উঠে দাঁড়ালেন কিছু না বলে। তারপর ক্লান্ত পদে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

মিসেস সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও কিছু পাওয়া গেল না। চাকর-বাকরদের কাছ থেকেও এমন কিছু পাওয়া গেল না। কেউ কোনো শব্দ শোনেনি। বাড়ির গেট যথাযথ বন্ধ ছিলো। দেড়টার পর কেউ জেগে ছিলো না। কাসেমকে নানাভাবে জেরা করা হলো, কিন্তু রাত দেড়টার পর সে ঘুমিয়ে পড়ে। এর আগে বাড়ির কোথাও কোনো সন্দেহজনক কিছু তার নজরে ঠেকেনি। কাসেম ছাড়া আরও দুজন চাকর আছে এ বাড়িতে। সকলেই অনেক দিনের পুরানো। সন্দেহজনক বলে কাউকে মনে হলো না। সবাই খুব ভয় পেয়েছে বলে মনে হলো। তবে কাসেম বললো, গত পরশু সে সিনেমার শ্যটিং দেখতে গিয়েছিল বর্ধমান হাউসে। সেখানে একজন মহিলাকে দেখেছিল সে দূর

থেকে। মেয়েটির ববছাঁট চুল তা সে লক্ষ্য করেছিল। কিন্তু ল্যাবরেটরিতে আবিষ্কৃত লাশটা সেই মহিলারই কিনা তা সে বলতে পারলো না। মোট কথা নিহত মেয়েটি সম্পর্কে কোনো তথ্যই জানা গেল না।

শহীদ শুধু কাসেমকে একটা প্রশ্নই করলো, 'সাবির চৌধুরী কোথায় এসে উঠেছেন বলতে পারো?'

কাসেম মাথা নেড়ে বললো, 'বর্ধমান হাউসে।'

'সেটা কোথায়?'

'মনিপুর রোডেই, সবাই চেনে বাড়িটা।'

আর কোনো কথা না বলে পর্যায়ক্রমে ড. সুফিয়ান ও হোজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শহীদ ও কামাল 'আর্কিমিডিস লজ' থেকে বেরিয়ে বেবিট্যাক্সিতে চড়ে বসলো।

তিন

বেবিট্যাক্সিতে বসে প্রভাতী কাগজের একজন ফিরিওয়ালাকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখে একটা কাগজ কিনে নিলো শহীদ। কাগজটা উল্টে পাল্টে দেখতে দেখতে ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে বললো, 'বর্ধমান হাউস চেনো তো?'

'জ্বী, সাব।'

'আমাদেরকে সেখানেই নিয়ে চলো আপাততঃ।'

মাথা নেড়ে ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিলো।

মিনিট পনেরো পর বর্ধমান হাউসের সামনে গাড়ি থামাতে বলে নেমে পড়লো শহীদ ও কামাল।

কামাল চারদিকে তাকাতে তাকাতে শহীদকে বললো, 'ঘন্টা দেড়েক আগে বেবি-ট্যাক্সির ড্রাইভারটা এখানেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল না?'

শহীদ সে কথার উত্তর না দিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বললো, 'দেখো তো, আমার লাইটারটা তোমার গাড়ির সীটে পড়ে আছে কিনা?'

কথাটা বলে শহীদ আবার গাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলো।

'এই যে, সাব।' ড্রাইভার রুপালী লাইটারটা সীট থেকে তুলে শহীদের দিকে বাড়িয়ে ধরলো।

শহীদ পকেট থেকে মুখ মোছবার অছিলায় রুমালটা বের করে লাইটারটা ড্রাইভারের হাত থেকে নিয়ে কায়দা করে পেঁচিয়ে পকেটে ভরে ফেললো সঙ্গে সঙ্গে। তারপর পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে ড্রাইভারের হাতে দিয়ে বললো, 'এখন তুমি যেতে পারো, আমাদের ফিরতে দেরি হবে।'

ড্রাইভার আশাতিরিক্ত ভাড়া পেয়ে আনন্দে গদগদ হয়ে গেছে এমন মুখ করে লম্বা একটা সালাম দিয়ে চলে গেল।

কামাল হতবাক হয়ে শহীদকে লক্ষ্য করছিল। ফিরে আসতে জিজ্ঞেস করলো, 'তুই ড্রাইভারটার হাতের ছাপ সংগ্রহ করলি কেন?'

'দরকার আছে, তাই।' শহীদ সংক্ষেপে উত্তর দিলো। তারপর কাগজটা কামালের দিকে বাড়িয়ে ধরে একটা ছোট্ট খবরের দিকে ইঙ্গিত করে বললো, 'পড়ে দেখ।'

কামাল একবার শহীদের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বুঝবার চেষ্টা করলো। তারপর কাগজটা নিচু করে ধরে পড়তে পড়তে এগোতে লাগলো সামনে। খবরটা নিম্নরূপ ঃ

"১৫ই ডিসেম্বর ঃ গত শুক্রবার অর্থাৎ ১২ই ডিসেম্বর ঢাকা হইতে মিস পাপিয়া নাম্নী একজন মহিলা নাট্যশিল্পী নিখোঁজ হইয়াছেন। ঢাকার অদূরে একটি বাগান-বাড়িতে দলবদ্ধভাবে পিকনিক করিতে গিয়ে তিনি আর ফিরিয়া আসেন নাই। সঙ্গী-সাথীদের একজনের কাছে শুধুমাত্র উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, তিনি পিকনিক হইতে ফিরিবার পথে কোনো এক আত্মীয়ার বাড়িতে বেড়াতে যাইবেন। তারপর তাহার আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নাই। মহিলার বয়স চব্বিশ। তিনি স্বাস্থ্যবতী। মুখমণ্ডল গোলাকার। উচ্চতা পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি। কোনো সহৃদয় ব্যক্তি যদি নিম্ন ঠিকানায় মিস পাপিয়ার সন্ধান দিতে পারেন…ইত্যাদি ইত্যাদি।"

খবরটা পড়া শেষ করে কিছু বুঝতে না পেরে কামাল মুখ তুলে তাকালো শহীদের দিকে। শহীদ তখন বর্ধমান হাউসের গেট ছাড়িয়ে ঢুকে পড়েছে ভিতরে। কামাল দ্রুত পা চালালো কাগজটা বগলদাবা করে।

ছোট্ট সবুজ মাঠটা পার হয়ে শহীদ বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। একমুহূর্ত কি ভাবলো দাঁড়িয়ে। তারপর দরজার সামনে থেকে পিছিয়ে এসে আবার ঘাসের উপর নেমে দাঁড়ালো। তারপর সম্মুখবর্তী ঘরটার পানি নিষ্কাশনের ছোট্ট ফোকরটা থেকে পানি গড়িয়ে পড়তে দেখে এগিয়ে গিয়ে কি যেন শুঁকলো সে জোরে জোরে শ্বাস টেনে। কামাল ততক্ষণে শহীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ শহীদ ড্রেনের পাশে বসে পড়ে কি যেন দেখলো। তারপর কামালের দিকে তাকিয়ে বললো, 'নিশ্চয়ই মদের গন্ধ নাকে গেছে তোর?'

কামাল কিছু বলবার আগেই সম্মুখবর্তী ঘরটার দরজা হঠাৎ খুলে গেল। দরজার সামনে ভিজে ঝাড়ু হাতে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক।

'কাকে চান?'

শহীদ বুঝতে পারলো ঘর ধুচ্ছিলো লোকটা, চাকর-বাকর হবে হয়তো। কামাল উত্তর দিলো, 'সাবির সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'আসুন।'

লোকটা ঘরের ভিতরে শহীদ ও কামালকে ঢুকতে বলে সরে গেল একদিকে। ঘরে

ঢুকে শহীদ দেখলো ঘরটা ধোয়া শেষ হয়েছে এখুনি। কিন্তু ঘরের ভিতর একটা উৎকট দুর্গন্ধ ছড়িয়ে আছে তখনও।

'চৌধুরী সাহেব কোথায়?'

'আছেন, পাশের ঘরে,' লোকটা বললো।

'বলো, আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

চলে গেল লোকটা ঝাঁটা হাতে।

লোকটা চলে যেতে শহীদ আচমকা নিচু কণ্ঠে কামালকে বললো, 'খাটের ওপর তোষক রয়েছে কিন্তু চাদরটা নেই কেন বলতো?'

শহীদের বক্তব্য কানে যেতেই কামাল চমকে উঠলো রীতিমত। দেখলো, সত্যি সত্যিই খাটটার ওপর তোষক আছে, বালিশও আছে দুটো বিশৃংখলভাবে রাখা, কিন্তু চাদর বা ওই জাতীয় কিছু নেই।

'কে আপনারা?'

বিরক্তিপূর্ণ একটা কণ্ঠস্বর শুনে ফিরে তাকালো শহীদ ও কামাল। একটা লোক এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের ভিতর মাঝখানের পর্দা ঝোলানো খোলা দরজাপথে। অত্যন্ত সুপুরুষ চেহারার লোক। স্বাস্থ্যবান। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, পরনে লম্বা ঢোলা পায়জামা, পায়ে জমিদারী নাগরা। মুখে একটা সদ্য ধরানো সিগারেট। মাথার চুলগুলো কোঁকড়ানো এবং যত্ন করে ব্রাশ করা। কিন্তু ভদ্রলোকের চোখ দুটো লাল।

একদৃষ্টিতে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে থেকে শহীদ বললো, 'আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে পারলে আনন্দিত হবো।'

ভ্রু কুঁচকে বিরক্তি না চেপেই ভদ্রলোক বলে ওঠেন, 'জানতে পারি, আপনারা কে?'

'আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খান আর আমার সঙ্গের ইনি…'

'বলতে হবে না আর।' হাত নেড়ে শহীদকে থামিয়ে দিয়ে বলে ওঠেন সাবির চৌধুরী, 'কিন্তু আমার সঙ্গে কথা বলতে চান? কি চান আপনারা?'

শহীদ ধীর কণ্ঠে বলে, 'ব্যস্ত হবেন না, মি. চৌধুরী। সময়ে সব জানতে পারবেন। এখন যদি আপনি আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দেন...'

একমুহূর্ত কি যেন ভাবলেন মি. সাবির চৌধুরী, তারপর অপেক্ষাকৃত অনুত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'বলুন, কি জানতে চান?'

'জালালাবাদে আপনি কতদিন হলো এসেছেন? উদ্দেশ্য কি?'

'মাস দেড়েক হবে। আমার নতুন ছবি এপার-ওপারের শূটিং উপলক্ষে জালালাবাদে এসেছি আমি।'

'বৈজ্ঞানিক ড. আবু সুফিয়ানকে চেনেন আপনি?'

শহীদ লক্ষ্য করলো মুহূর্তের জন্য মি. চৌধুরীর মুখ ভয়ে সিঁটকে গেল। অবশ্য

সহজ গলায় স্বাভাবিক ভাবেই উত্তর দিলেন তিনি, 'চিনি।'

সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করলো শহীদ, 'আপনি আপনার শত্রু বলে মনে করেন ড. সুফিয়ানকে?'

'মানে?' রীতিমত চমকে উঠে বলেন মিস্টার চৌধুরী।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে শহীদ প্রশ্ন করে, 'আপনি কাল রাতে ড্রিঙ্ক করেছিলেন, তাই না?'

পাথরের মতো শক্ত মনে হয় মি. চৌধুরীর মুখ। আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকেন তিনি শহীদের দিকে। সময় না দিয়ে আবার প্রশ্ন করে শহীদ, 'আপনার সঙ্গে শূটিং উপলক্ষে ক'জন মহিলা আর্টিস্ট এসেছেন মি. চৌধুরী?'

'পাঁচজন।'

'তাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন যাঁর বব-ছাঁট চুল?'

'আছে।' বেশ সহজ কণ্ঠেই উত্তর দেন মি. চৌধুরী।

'আপনার পক্ষে নিশ্চয়ই জানা অসম্ভব নয় এখন তিনি কোথায় আছেন?'

এমন সময় দ্রুতপায়ে একজন যুবতী বাইরের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে মি. চৌধুরীর উদ্দেশে বলে ওঠে, 'আবার তুমি টাকা দিয়েছো শয়তানটাকে। বারবার বলেছি আব্বাকে সব কথা আমরা জানিয়ে দিই চলো। তারপর যা হবার হবে—কিন্তু তুমি···'

হঠাৎ চমকে উঠে থেমে যান যুবতী শহীদ আর কামালকে দেখতে পেয়ে। শহীদ দেখলো, প্রচণ্ড উত্তেজনায় যুবতীটি রীতিমত হাঁফাচ্ছে, অত্যন্ত লোভনীয় দেহবল্লরীর অধিকারিণী যুবতীটি। বব-ছাঁট চুল। শহীদ ভাবলো, যুবতীটি কোনো বড়লোকের দুলালী।

বিচলিত না হয়ে মি. চৌধুরী দু'পা এগিয়ে গেলেন যুবতীটির দিকে। তারপর বললেন, 'টাকা তো আমি দিইনি।'

হঠাৎ যুবতীর নাক সিঁটকে ওঠে। কিসের যেন গন্ধ নাকে যেতে কঠিন হয়ে ওঠে তার মুখ।

'তুমি কাল শূটিং থেকে মাতাল হয়ে ফিরেছো, না? মদ আর খাবে না, বলেছিলে না?' কঠিন গলায় বলে যুবতী।

'এবারের মতো ক্ষমা করে দাও,' থিয়েটারি ঢঙে বলে ওঠেন মি. চৌধুরী, 'বিশ্বাস করো আমার কথায়, আর কখনও ও জিনিস ছোঁবো না। এই তোমার মাথা ছুঁয়ে বলছি।' মি. চৌধুরী সত্যি মাথা ছুঁয়ে কথা ক'টি বলেন। 'কিন্তু, কি করি বলো, শূটিং-এ যাবার সময় এমন গায়ে পড়ে ঝগড়া করলে তুমি যে মেজাজটা দারুণ খিঁচড়ে গেল।'

উসখুস করছিল কামাল। এবার হঠাৎ খুক খুক করে কেশে ওঠে। কাশির শব্দে ঘুরে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে মি. চৌধুরী বলে ওঠেন, 'এই যে আমার বব-ছাঁট মহিলা।

চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছেন। আর কিছু প্রশ্ন আছে আপনাদের?'

'আপাততঃ' শহীদ বলে, 'মনে রাখুন শব্দটা—আপাততঃ, আর তেমন কিছু জিজ্ঞাস্য নেই আমাদের। শুধু জানতে চাই গতকাল রাতে কোথায় ছিলেন আপনি? কখন বাড়ি ফিরেছেন?'

হাসিমুখেই উত্তর দেন মি. চৌধুরী, 'গতকাল প্রায় সারারাত আউটডোর শূটিং উপলক্ষে ব্যস্ত ছিলাম আমি। বাড়ি ফিরেছি আপনারা এখানে আসার ঘন্টাদুয়েক আগে।'

শহীদ আচমকা বলে ওঠে, 'তারপর আপনার ঘুমাতে যাওয়া উচিত ছিলো না?'

একটুও অপ্রতিভ না হয়ে মি. চৌধুরী বলেন, 'ঘুমাতেই যাচ্ছিলাম কয়েকটা কাজ সেরে, এমন সময় আপনারা যে আবার বিরক্ত করতে হাজির হবেন কে জানতো!'

শহীদ মৃদু হেসে বললো, 'যাবার আগে আপনাকে অন্ততঃ একটা খবর দিয়ে যাই। ড. সুফিয়ানের ল্যারেটরিতে একটা যুবতীর মৃতদেহ পাওয়া গেছে। গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে যুবতীটিকে। যুবতীটির চুল বব-ছাঁট। মৃতদেহটির সঙ্গে অবশ্য অপরাধী নিজ পরিচয় প্রকাশ করার জন্য কয়েকটি মূল্যবান বস্তুও পাঠিয়ে দিয়েছে। নিরাশ হবার মতো আমাদের কিছুই নেই।'

শহীদের কথা বলার মাঝে মি. চৌধুরীকে কিছুটা উদ্বিগ্ন দেখায়। শহীদের কথা শেষ হতে তিনি বলেন, 'তাই নাকি! আশ্চর্য ব্যাপার তো! তা যুবতীটি কে?'

গম্ভীর গলায় শহীদ বলে, 'এখনও অপরিচিতা।'

হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠে মি. চৌধুরী বলেন, 'মগ্নচৈতন্য রুচিশীল বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটরিতে যুবতী মেয়ের লাশ! বাহ্ বাহ্! কিন্তু মি. খান, বব-ছাঁট চুল হলেও আপনি যে সন্দেহ করে এখানে এসেছিলেন তা নিরসন হয়ে গেল নিশ্চয়ই আপনার দৃষ্টিতে। আসুন, পরিচয় করিয়ে দিই—ইনি মিস শাহবাজী। ওসেনা শাহবাজী। আমার ছবির প্রযোজক মি. ফারুক শাহবাজীর কন্যা। শূটিং উপলক্ষ্যেই এসেছেন। এনারও বব-ছাঁট চুল। কিন্তু চোখের সামনেই তো দেখতে পাচ্ছেন, সশরীরে জীবিত ইনি, এবং সতেজও বটে।'

মি. চৌধুরীর কথা বলার ভঙ্গিতে একটা বিদ্রূপাত্মক টান রয়েছে।

শহীদ বললো, 'আপনাকে উপদেশ দেবো ভদ্রভাবে কথা বলা শিখতে, নয়তো অযথা বিপদে পড়তে পারেন।'

কথা ক'টি বলে ওসেনা শাহবাজীর সঙ্গে পরিচয়পর্ব অসমাপ্ত রেখেই বেরিয়ে এলো শহীদ। কামালও পিছু নিলো ওর।

গেটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে শহীদ দেখতে পেলো, যে লোকটা তাদেরকে ঘরে ডেকে বসিয়েছিল সে কমপাউণ্ডের এদিক-ওদিক কি যেন খুঁজছে। সামনে গিয়ে শহীদ জিজ্ঞেস করলো, 'কি খুঁজছো হে অমন করে?'

'একটা বোতল।'

কথাটা বলে ফেলেই চকিতে তাকালো লোকটা শহীদের দিকে। তারপর হঠাৎ যেন নিজেকে সামলে নেবার ভঙ্গিতে বললো, 'কই, না তো!'

লোকটার অপ্রতিভ ভাব দেখে হেসে ফেললো কামাল। কিন্তু আর কিছু না বলে ওরা বের হয়ে এলো গেটের বাইরে।

চার

শহীদ ও কামালকে মি. হোজা তাঁর অফিসরুমে প্রবেশ করতে দেখে চিৎকার করে উঠলেন, 'কি করি বলুন তো সাহেব! জালালাবাদ যে হঠাৎ খুনীদের আড্ডা হয়ে উঠলো।'

'কি হলো আবার?' প্রশ্ন করলো শহীদ।

মি. হোজা সমান তেজে বলে ওঠেন, 'আবার একটা খুন হয়েছে, সাহেব, এই তো এলাম সেখান থেকে।'

মি. হোজার কথা শুনে শহীদ মনে মনে বললো, আমি এ রকম কিছু একটা ঘটবে ভেবেছিলাম।

'ব্যাপারটা গোড়া থেকে বলুন শুনি,' শহীদ বললো।

মি. হোজা বেশ গুছিয়ে কথা বলার সুযোগ পেয়ে নড়েচড়ে বসে শুরু করলেনঃ

'থানায় পৌছেই একটা জরুরী ফোন পেলাম লিটন রোড থেকে। অমনি ছুটতে হলো। গিয়ে দেখলাম একটা মোটর গাড়ি। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে গাড়িটা, ভিতরে একটা লাশ। লাশটা সম্পূর্ণ অগ্নিদগ্ধ, চেনার উপায় নেই মেয়ে না পুরুষ। তবে, প্রায় অক্ষত একপাটি জুতো পাওয়া গেছে গাড়ির বাইরে। জুতোটা মেয়েলোকেরই বটে। গাড়ির নম্বর-টম্বর কিছু বোঝা যায়নি।

শহীদ জিজ্ঞেস করলো, 'লিটন রোডটা এখান থেকে কতদূরে?'

'তা প্রায় মাইল দশেক হবে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শহীদ বললো, 'আচ্ছা, মি. হোজা, গত কয়েকদিনের মধ্যে কোনো মহিলা নিখোঁজ হয়েছেন এই মর্মে থানায় কেউ কোনো ডায়েরী করেছে কিনা বলতে পারেন?'

ধূর্ত হাসি হেসে মি. হোজা বললেন, 'ঠিক ধরেছেন। তবে গত কয়েকদিন আগে নয়, ডায়েরীটা করা হয়েছে আজই—মাত্র কিছুক্ষণ আগে।' ড. সুফিয়ানের বাড়িতে যে লাশটা পাওয়া গেছে তার সঙ্গে হুবহু বর্ণনা মিলে যাচ্ছে এই নিখোঁজ মহিলার। আরও আশ্চর্য কি জানেন, খবরটা পেলাম আপনারই বর্তমান আস্তানা, হোটেল ডি-করোনেশন থেকে। মেয়েটির নাম মিস সুফিয়া।'

'কে খবরটা দিলো? নাম কি তার?'

মি. হোজা ডায়েরী-বুকটা দেখে বললেন, 'হোটেলের ম্যানেজার মি. মল্লিক খবরটা দিয়েছেন। মিস সুফিয়া হোটেলের ব্রিজ পার্টনার কাম ড্যান্সার ছিলো।'

'আজকের মতো আসি, মি. হোজা।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো শহীদ। তারপর পকেটের ভিতর হাত ঢুকিয়ে রুমাল জড়ানো লাইটারটা মি. হোজার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'এটা রাখুন। লাইটারটার ওপর একজনের আঙুলের ছাপ আছে। আমার বিশ্বাস ছাপটা কোনো দাগী আসামীর। আপনি পরীক্ষা করে ফলাফলটা যদি আমাকে জানান তাহলে ভালো হয়।'

মি. হোজা রুমালে জড়ানো লাইটারটা ড্রয়ারের ভিতর রেখে দিলেন। তারপর তেজী গলায় বলে উঠলেন, 'ফিংগারপ্রিন্টের রেজাল্ট আপনি পেয়ে যাবেন কালই, কিন্তু আরও যে আছে। মিস সুফিয়া যে চাদরে মোড়া ছিলো তার ভিতর থেকে একটা বড় সাইজের...'

শহীদ মৃদু হেসে হোজার কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠলো, 'একটা মদের বোতল, তাই না?'

হতবাক হয়ে মি. হোজা শহীদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'আপনি বুঝি আগেই দেখেছিলেন চাদরের ভিতর বোতলটা?'

মি. হোজার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে শহীদ জানতে চাইলো, 'ভালো কথা, পোস্ট-মর্টেমের খবর পেয়েছেন?'

'পেয়েছি। ডাক্তারের রিপোর্টে জানা গেছে মিস সুফিয়াকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। হত্যার সময় রাত দশটা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত।'

'দশটা থেকে মধ্যরাত।' আপন মনেই কথাটা আওড়াল শহীদ।

মি. হোজা বললেন, 'হোটেলেই তো ফিরবেন এখন? এক কাজ করুন মি. শহীদ, মিস সুফিয়া সম্পর্কে যাকে যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার দরকার, সেটা আপনিই করুন গিয়ে। আমিও আসবো একটু পরে, রিপোর্টগুলো লেখা শেষ করে।'

হেসে ফেলে শহীদ বললো, 'এমন একটা দায়িত্ব আমার ওপর চাপাচ্ছেন কেন?'

মি. হোজা মাথা নেড়ে বলে উঠলেন, 'অনুপযুক্ত লোক আমি বাছিনি, আমার কর্তা ব্যক্তিরা এর চেয়েও ভীষণ ভীষণ কাজের ভার আপনার হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত হন যখন...'

মি. হোজার বক্তব্য সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার আগেই শহীদ আর কামাল বের হয়ে আসে থানা থেকে।

হোটেলে ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে মিস সুফিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জবানবন্দী নিতে শুরু করে শহীদ। শহীদ ও কামালের সঙ্গে একসময় মি. হোজাও এসে যোগ দেন। তিনি সকলের জবানবন্দী লিখে নেন।

বিশেষ নারী-পুরুষের পরিচয় সমেত ওদের বক্তব্য এবং গতরাতে তারা কে কোথায় ছিলো তার একটা চিত্র দেয়া হলোঃ

হোটেল ম্যানেজার মি. মল্লিকঃ বয়স—আন্দাজ পঞ্চাশ। টাকমাথা, গোলগাল চেহারা। পরনে গ্যাবার্ডিনের স্যুট।

মি. মল্লিক জানালেন, 'মিস সুফিয়া তাঁর হোটেলে ব্রিজ পার্টনার কাম ড্যান্সার ছিলেন। তবে, মিস সুফিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু তিনি জানেন না। মিস জোবায়দার সহকারী ছিলেন উনি, মিস জোবায়দাই তাকে নিয়ে আসেন ঢাকা থেকে মাস দুই আগে।'

'মিস জোবায়দা কে?'

'মিস জোবায়দা আমাদের হোটেলের প্রদর্শনী নর্তকী। মিস সুফিয়ার দূর সম্পর্কের বোন তিনি।'

মিস্টার মল্লিককে শহীদ শুধু একটি প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা মি. মল্লিক, মিস সুফিয়ার চুল বব-ছাঁট ছিলো না, তাই না?'

আশ্চর্য কণ্ঠে মি. মল্লিক বলেন, 'বব-ছাঁট ছিলো না মানে? স্বচক্ষে দুমাস ধরে দেখছি তার মাথার চুল ঘাড়ের নিচে কখনও নামেনি।'

চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো শহীদের মুখে। বললো, 'ঠিক আছে।'

মিস জোবায়দাঃ ছাব্বিশ সাতাশ বছর বয়স। অত্যন্ত আকর্ষণীয় দেহবল্লরী। মিস সুফিয়া এঁর অধীনেই হোটেলে চাকরি করতেন। তিনি জানালেন, 'মিস সুফিয়া তার দূর সম্পর্কের বোন। ঢাকায় একটি হোটেলে ড্যান্সার ছিলো সে। মাস দুয়েক আগে তার পা মচকে যাওয়ায় প্রদর্শনী নাচের জন্যে হোটেল ডি-করোনেশনে এনেছিলেন তাকে। সেই থেকে সুফিয়া তাঁর সঙ্গে এই হোটেলেই রয়ে যায়। শহীদ জানতে চায়, গতরাতে মিস জোবায়দা শেষবার কখন দেখেছেন মিস সুফিয়াকে।'

'প্রথম প্রদর্শনী নাচের অনুষ্ঠানে।' মিস জোবায়দা উত্তর দেন, রাত সাড়ে দশটায় ফ্লোরে আসে সে। তখন আমি মিসেস রসুল বক্স ও মিসেস খোদাবক্সের সঙ্গে গল্প করছিলাম একটা টেবিলে। কিন্তু শেষবার সুফিয়াকে দেখেছি মি. শ্রীধরের সঙ্গে। প্রদর্শনী নাচ শুরু হবার খানিক পর মি. আবেদীন আমাদের টেবিলে এসে বসেন। এরপরই আমরা ব্রিজ খেলতে শুরু করি। ব্রিজ খেলার ফাঁকেই দেখেছিলাম মি. শ্রীধর সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছিলেন, আর সুফিয়া সিঁড়ি ভেঙে নেমে যাচ্ছিলো। তখন খুব সম্ভব এগারোটা-সোয়া এগারোটা বাজে। দ্বিতীয় প্রদর্শনী নাচের অনুষ্ঠান হবার কথা রাত বারোটায়। বারোটা বাজার কিছুক্ষণ আগে মি. সারোয়ার আমাকে এসে বলেন, সুফিয়াকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। আমি তাকে উপদেশ দিই, সুফিয়ার রুমে ফোন করতে। কিছুক্ষণ পর ফোনে সুফিয়াকে না পেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে আসেন মি. সারোয়ার।'

'মি. সারোয়ার কে?'

'হোটেলেরই লোক, মি. মল্লিকের সহকারী বলতে পারেন।'

'তারপর বলুন।'

'তখন আমি সুফিয়ার রুমে যাই। কিন্তু ঘরে তাকে দেখতে পাই না। আমি ভেবেছিলাম, কোনো লোকের সঙ্গে সে দেখা করতে গেছে হোটেলের বাইরে। খুব রাগ হয় আমার এই রকম দায়িত্বহীন কাজের জন্য। নাচের অনুষ্ঠান বাতিল করা হলে হোটেলের দুর্নাম হবে বলে মচকানো পা নিয়েই আমি নাচতে রাজি হয়ে যাই অগত্যা। রাত একটার সময় শেষ হয়ে যায় নাচ। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম আমি। তারপর নিজের কামরায় গিয়ে শুয়ে পড়ি, এবং ঘুমও নেমে আসে সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখে আমার। আজ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে জানতে পারি গতরাতে সুফিয়া হোটেলে ফিরে আসেনি।'

শহীদ বলে, 'ড. সুফিয়ানকে চেনেন আপনি?'

'না তো! কেন?'

'আজ সকালবেলা মিস সুফিয়ার মৃতদেহ পাওয়া গেছে ড. সুফিয়ানের ল্যাবরেটরিতে।'

শহীদ লক্ষ্য করে, মিস জোবায়দার চোখে মুখে ফুটে ওঠে অবিশ্বাসের চিহ্ন।

'সাবির চৌধুরীকে চেনেন নিশ্চয়?'

মিস জোবায়দা একটু যেন চমকে ওঠেন শহীদের প্রশ্নে। বলেন, 'না, চিনি না। ও নাম কোনদিন শুনেছি বলেও মনে হয় না।'

'কাউকে সন্দেহ করেন আপনি মিস সুফিয়ার হত্যাকারী বলে?'

'না, সত্যিই কি সুফিয়া খুন হয়েছে, মি. শহীদ?'

'গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে তাকে।'

'বলেন কি! সুফিয়া—খুন?'

মিস জোবায়দা চিৎকার করে ওঠেন প্রায়।

শহীদের মনে হয় তিনি যেন ইচ্ছা করেই মাত্রাতিরিক্ত উত্তেজনার ভাব দেখাচ্ছেন।

শহীদ বলে, 'লাশটা একবার আপনাকে দেখতে হবে, মিস জোবায়দা। আপনিই যখন তার একমাত্র আত্মীয়া।'

'বেশ বেশ, তা দেখবো বৈকি, দেখতে হবে যখন।'

মি. হোজা মিস জোবায়দাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান থানায়। লাশ দেখেই মিস জোবায়দা বলে ওঠেন, 'এই তো সুফিয়া!'

কথাটি বলে ভারাক্রান্ত মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি।

মিসেস রসুল বক্স। বয়স আটান্ন বছর। বিধবা। স্বামী কোটিপতি ব্যবসায়ী ছিলেন। একমাত্র মেয়ে এবং বড় ছেলে লণ্ডনে এক প্লেন অ্যাক্সিডেন্টে নিহত হয়েছেন বছর দশেক আগে। লণ্ডনে তাঁর ছোটো ছেলেটি স্কুলে পড়তো। সে-ও মারা গেছে ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে। তার জামাই তারবার্তা করে এই খবর দেন। দুঃখজনক প্লেন

অ্যাক্সিডেন্টের খবর শুনে তিনি পাগলিনীপারা হয়ে গিয়েছিলেন। তারপরই কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুতে বিছানা নেন তিনি। কিন্তু তাঁর মেয়ে এবং বড় ছেলে মারা গেলেও বিপত্নীক জামাই এবং স্বামীহীনা পুত্রবধূ এখনও বিয়ে করেনি। তারা এখনও তাঁর সঙ্গেই থাকে। শাশুড়ীকে প্রবোধ দেবার জন্য তাঁর জামাই একটা অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে। দেখাশোনার ভার তাঁর জামাইয়ের ওপরই। ইদানীং মিসেস রসুল বক্সের স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছিলো না বলে স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায় সমুদ্র-শহর জালালাবাদে এসেছেন তিনি। এখানে আসার পর একটা চমকপ্রদ কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছিল তাঁকে কেন্দ্র করে। মিস সুফিয়া নাকি তাঁর একমাত্র মেয়ে—যিনি দশ বছর আগে প্লেন অ্যাক্সিডেন্টে নিহত হয়েছেন, হুবহু তাঁর মতো দেখতে ছিলো। ইদানীং তাঁর পুত্রবধু ঢাকার এক ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টকে বিয়ে করার জন্য মনস্থির করে ফেলেছে এবং তাঁর জামাইও তাঁর প্রতি ততো মনোযোগী নয়। ঢাকাতে প্রায়ই থাকে না সে। মদ আর জুয়া নিয়েই সে মেতে থাকে বলে খবর পেয়েছেন তিনি। এদের কারও ওপরই তাঁর কোনো আশা নেই। তাই মিস সুফিয়াকেই তিনি পালিতা কন্যা হিসেবে গ্রহণ করবেন বলে মনস্থির করেছিলেন।

শহীদ জানতে চায়, 'মিস সুফিয়াকে পালিতা কন্যা হিসেবে গ্রহণ করতে চাওয়ায় আপনার জামাই বা পুত্রবধূ আপত্তি করেননি?'

মিসেস রসুল বক্স বললেন, 'ওদের আপত্তি করার কিছু নেই তো। আমার স্বামী ছেলে ও মেয়ে বিয়ে দেয়ার পর পাঁচ লক্ষ করে টাকা ওদের নামে জমা করে দেন ব্যাঙ্কে। আমার ছেলে এবং মেয়ের মৃত্যুর পর সে সব টাকা তো ওরাই পেয়েছে। আমার নামে ব্যাঙ্কে প্রায় পঞ্চাশ লাখ টাকা আছে, তাতে ওদের কারো কোনো অধিকার নেই। সে টাকা আমি যেমন ইচ্ছা ব্যয় করতে পারি, তাতে ওদের কিছু বলার থাকে কি? সুফিয়াকে আমি সব টাকা লিখে দিলেও তাতে ওদের মাথা-ব্যথার কোনো কারণ ছিলো না।'

শহীদ জানতে চায়, 'সত্যি সত্যি তেমন কোনো ইচ্ছা ছিলো নাকি আপনার?'

'হ্যাঁ, ছিলো। সুফিয়াকে বলেছিলাম, আমাকে যদি ও ধর্ম মা হিসেবে চায় তাহলে পনেরো লক্ষ টাকা আমি ওর নামে লিখে দেবো—অবশ্য সে টাকা ও খরচ করতে পারবে আমি মারা যাবার পর।'

'মিস সুফিয়ার নামে পনেরো লক্ষ টাকা লিখে দিতে চেয়েছিলেন আপনি মাত্র ক'দিনের পরিচয়ে। আপনার মনোভাবের কথা আর কেউ জানতো নাকি?'

'একটা কথা আমি বারবার বলতে চাই না, মি. শহীদ খান। বলেছি তো আপনাকে, সুফিয়া দেখতে ছিলো ঠিক আমার জাহানারার মতো। আর সুফিয়াকে পালিতা কন্যা হিসেবে গ্রহণ করার সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গিয়েছিল এটা সকলকে জানাতে আপত্তি থাকবে কেন? টাকার কথাও সবাই জানতো।'

মি. আবেদীনঃ পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়স হবে। মিসেস রসুল বক্সের মৃতা কন্যা জাহানারার স্বামী। হালকা পাতলা গড়ন। দেখে মনে হয় শান্তশিষ্ট। চোখ দু'টি চঞ্চল।

ইনি কল্যাণী অনাথ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। জানালেন, মিস সুফিয়া সম্পর্কে বিশেষ কিছুই অবগত নন তিনি। তবে তাঁর শাশুড়ী মৃতা মিস সুফিয়াকে পালিতা কন্যা হিসেবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর বলার কিছু ছিলো না। তবে ব্যাপারটা তাঁর ভালো লাগেনি, এ পর্যন্ত।

শহীদ বলে, 'আপনার আপত্তিটা কোথায় ছিলো, মি. আবেদীন?'

'একজন হোটেল ড্যান্সারকে পালিতা কন্যা হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারটা আমাদের সমাজে দৃষ্টিকটু ঠেকে।'

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে শহীদ জিজ্ঞেস করে, 'গতকাল ডিনারের পর মধ্য রাত পর্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন বলতে পারেন, মি. আবেদীন?'

শান্ত কণ্ঠেই জবাব দেন মি. আবেদীন, 'ডিনারের পর গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ানো আমার অনেকদিনের অভ্যাস। গতকাল সমুদ্রের দিকে গিয়েছিলাম।'

'তারপর কখন ফিরেছেন হোটেলে?'

'এগারোটার সময় আন্দাজ। তারপর আমি আমার শাশুড়ীর কাছে যাই। গল্প করছিলেন তিনি মিস জোবায়দা এবং মিসেস খোদাবক্সের সঙ্গে। আমাকে দেখে ওনারা ব্রিজ খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।'

'মিস সুফিয়াকে দেখেছিলেন তখন?'

'হ্যা, মিনিট কুড়ি পর তাকে আর দেখতে পাইনি।'

মি. আবেদীন ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর শহীদ কামালকে বলল, 'মিস সুফিয়াকে হত্যা করার পিছনে একটি উদ্দেশ্যের কথা কিন্তু জানা গেছে, কি বলিস?'

কামাল বলে, 'সেটা কী?'

শহীদ বলে, 'পনেরো লক্ষ টাকা।'

মিসেস খোদাবক্সঃ মিসেস রসুল বক্সের নিহত বড় ছেলের স্ত্রী। খোলামেলা স্বভাব। বয়স আন্দাজ ত্রিশ। সুদর্শনা।

জানালেন, মিস সুফিয়ার সঙ্গে তার একটা সখ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মিসেস রসুল বক্স মিস সুফিয়াকে পালিতা কন্যা হিসাবে গ্রহণ করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এ খবর তাঁরও জানা ছিলো। তবে এ ব্যাপারে তিনি গুরুত্ব দিয়ে কিছুই চিন্তা করেননি।

মি. শ্রীধরঃ স্থায়ী আবাস ঢাকায়। জালালাবাদে বেড়াতে এসেছেন। সঙ্গে একটা প্রাইভেট গাড়িও এনেছেন। শহীদের সঙ্গে কথা বলার শুরুতেই তিনি জানালেন তাঁর মোটর গাড়িটা পাওয়া যাচ্ছে না আজ সকাল থেকে।

শহীদ জানতে চাইলো, 'পুলিসে ফোন করেছেন এ ব্যাপারে?'

'না,' মি. শ্রীধর বললেন, 'মাত্র কিছুক্ষণ হলো ঘুম থেকে উঠেছি আমি।'

'মিস সুফিয়ার সঙ্গে গত রাতে দেখা হয়েছিল?'

'হয়েছিল।'

'কখন?'

'প্রথম নাচের পর।'

শহীদ বলে, 'ভালো কথা, আপনার গাড়িটা শেষবার কখন দেখেছিলেন আপনি?'

'তাতো বলতে পারছি না। একটু আগে গাড়ির খোঁজে নিচে গিয়ে দেখি গাড়ি নেই।'

'আমার মনে হয় খবরটা আপনার এখুনি পুলিসকে জানানো দরকার।'

পাঁচ

পরদিন বেলা দশটার সময় একটা ফোন এলো। শহীদ রিসিভার কানে তুলে নিলো।

'হ্যালো, শহীদ বলছি।'

'বাবা, আমি আয়েশা বেগম।'

'জ্বী, বলুন।' বিনীত কণ্ঠে বলে ওঠে শহীদ।

'প্রফেসর সাহেব আজ সকাল থেকে কেমন যেন হয়ে গেছেন। আনন্দে চিৎকার করতে করতে নিচে থেকে এসে উনি বলতে লাগলেন, জানো আয়েশা, টুটুলকে খুব শিগগিরই ফিরে পাবো আমরা! দুনিয়ার কোনো শক্তিই আর আমার টুটুলকে ধরে রাখতে পারবে না। কিছু বুঝতে না পেরে হতবাক হয়ে যাই আমি। কিন্তু সব কথা আমাকে খুলে বলার অনুরোধ করতে তিনি গুম মেরে যান। গম্ভীর হয়ে যায় তাঁর মুখ। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, এ খবর যেন কেউ না জানে। আমি বললাম, শহীদকেও বলবো না? তিনি বললেন, দরকার নেই শহীদের। টুটুলকে এমনিই ফিরে পাবো আমরা। তারপর আর কিছু না বলে হঠাৎ ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেলেন তিনি। আমি কিন্তু, বাবা, খুব ভয় পেয়ে গেছি। তাই তোমাকে ব্যাপারটা না জানিয়ে পারলাম না। আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। আমার মনে হচ্ছে, কোনো একটা রহস্য উনি জানেন, কিন্তু কাউকে বলতে চান না।'

শহীদ মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনলো আয়েশা বেগমের। তার কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো। কিন্তু কণ্ঠস্বরে কিছুমাত্র উদ্বেগ না ফুটিয়েই সে বললো, 'আপনি কিছু ভাববেন না, চাচী আম্মা। শুধু একটা ব্যাপার লক্ষ্য রাখবেন, স্যার যেন কোনো অবস্থাতেই বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও না যান। আর সন্দেহজনক তেমন কিছু চোখে পড়লে আমাকে জানাতে ভুলবেন না।…এখন তাহলে রাখি?'

'রাখো, বাবা।'

শহীদ ফোন ছেড়ে দিলো।

রাত ন'টা বেজে দশ মিনিট।

জানালার বাইরে দৃষ্টি ফেলে শহীদ কামালকে বললো, 'দেখ, একটা খোঁড়া ফকির

রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে হোটেলটার দিকে কেমন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। এতো রাতে হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকাটা আমার কেমন যেন সন্দেহজনক মনে হচ্ছে।'

শহীদের পাশে সরে এসে কামাল উঁকি মেরে দেখলো, সত্যিই একটা খোঁড়া ফকির রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে হোটেলের দিকে তাকিয়ে আছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

ড্যান্স ফ্লোরের আশপাশের আসনগুলো এখনও সব ভরে ওঠেনি। শহীদ ও কামাল বিরাট হল-ঘরটার ভিতর প্রবেশ করে খালি টেবিল দখল করে বসলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই হল-ঘরটা ভরে উঠলো। জোড়ায় জোড়ায় কপোত-কপোতী টেবিল জুড়ে বসে হৈ-চৈ শুরু করে দিলো। টেবিলে টেবিলে নানা রকমের রঙিন পানীয়। আশেপাশে সুন্দরী ললনাদের মিষ্টি-মধুর হাসি। মন মাতানো মিষ্টি একটা ইংরেজি গানের সুর বাজছে রেকর্ডে। সিগারেটের ধোঁয়া এবং সুন্দরী নারীদের উচ্ছ্বসিত হাসি আনন্দলোভী পুরুষগুলোকে মাতিয়ে রেখেছে। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হল-ঘরটা একবার জরিপ করে নিলো শহীদ।

নাচ শুরু হতে এখনও বেশ দেরি আছে। শহীদ দেখতে পেলো মি. আবেদীন এবং মিসেস খোদাবক্স একটা টেবিলে বসে কি যেন আলাপ করছেন।

হঠাৎ হল-ঘরের একেবারে ডান দিকের কোণে, বারান্দার প্রায় কাছ ঘেঁষে বসা একটা লোককে দেখে শিউরে উঠলো শহীদ। লোকটার মুখ কে যেন তীক্ষ্ণফলা ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করে দিয়েছে। দাগগুলো অনেকদিনের পুরানো বলেই মনে হলো শহীদের। লোকটা মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে আছে।

প্রায় মিনিট পনেরো পর মিস জোবায়দাকে নাচের পোশাক পরে হল-ঘরে প্রবেশ করতে দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে হল ঘরে একটা মৃদুগুঞ্জন জেগে উঠে ক্রমে থিতিয়ে এলো।

মিস জোবায়দা কারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে ছন্দোবদ্ধ পদক্ষেপে মি. আবেদীনের টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ান। তারপর মিসেস খোদাবক্সের পাশে তাঁকে বসে পড়তে দেখা গেল।

হঠাৎ কি মনে করে কামালকে বসতে বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো শহীদ। তারপর দু'পাশের চেয়ারগুলোকে পাশ কাটিয়ে সে মি. আবেদীনের টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। মি. আবেদীন তার দিকে চোখ তুলে তাকাতে শহীদ মিস জোবায়দাকে লক্ষ্য করে বলে, 'আপনার পাশের আসনটি কি খালি আছে?'

'বসতে পারেন।' মিস জোবায়দা শহীদের দিকে তাকিয়ে নির্বিকার কণ্ঠে বললেন।

'থ্যাঙ্কিউ।' চেয়ারটা দখল করে শহীদ মি. আবেদীনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'মিসেস রসুলবক্স আজকের নাচের আসরে আসবেন না?'

শহীদের প্রশ্নের উত্তর দেন মিসেস খোদাবক্স। 'আজ উনি আসতে পারবেন না। দুর্ঘটনাটা মারাত্মক আঘাত দিয়েছে ওনাকে, মি. শহীদ। মাত্রাতিরিক্ত মুষড়ে পড়েছেন

আমার শাশুড়ী।'

'সেটা খুবই স্বাভাবিক।'

মিস জোবায়দার দিকে তাকিয়ে শহীদ বলে, 'একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করবো আপনাকে, যদি কিছু মনে না করেন? মিস সুফিয়া কোন্ সেলুনে তাঁর চুলের পরিচর্যা করতেন ইদানীং, বলতে পারেন? হোটেলেই নাপিত বা নাপিতানী কেউ বাস করে নাকি?'

কটমট করে শহীদের দিকে চেয়ে মিস জোবায়দা বলেন, 'কিভাবে আপনার ধারণা হলো যে এ সব ব্যাপারে খোঁজ-খবর রাখার দায়িত্ব আমার?'

তীক্ষ্ণ অথচ নিচু গলায় শহীদ বলে উঠে, 'তা নয়। কিন্তু মিস সুফিয়ার মৃতদেহ সনাক্ত করার সময় আপনার বলা উচিত ছিলো যে মিস সুফিয়ার চুল বব-ছাঁট ছিলো না।'

'মানে!' মিস জোবায়দা আঁৎকে ওঠেন শহীদের কথা শুনে।

মিসেস খোদাবক্স অবাক কণ্ঠে বলেন, 'সুফিয়ার চুল তো বব-ছাঁটই ছিলো। সেক্ষেত্রে মিস জোবায়দা কেন বলতে যাবেন মিস সুফিয়ার চুল বব-ছাঁট ছিলো না!'

শহীদ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'তাই যদি হয়, কেন আপনারা বলছেন না যে ড. সুফিয়ানের ল্যাবরেটরিতে যে মৃতদেহটি আবিষ্কৃত হয়েছে সেটি মিস সুফিয়ার নয়?'

হতভম্ব হয়ে বসে থাকে তিনজন নারী-পুরুষ। শহীদ তিনজনের দিকে পর্যায়ক্রমে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে হাঁটতে থাকে দু'পাশের চেয়ার টেবিল পাশ কাটিয়ে।

নাচ শুরু হলো রাত সাড়ে দশটায়।

শোভন পোশাক পরেই স্টেজে নেমেছিলেন মিস জোবায়দা। কিন্তু মিনিট দশেকের মধ্যেই একটি একটি করে পোশাকের ভার তার যৌবনপুষ্ট শরীর থেকে খসে খসে পড়তে লাগলো।

নাচ চলছে পুরোদমে। মিস জোবায়দা অপূর্ব নাচেন। জুড়ি নেই তাঁর এই নাচের। আজকে যেন একটু বেশি অশ্লীল হয়ে উঠেছেন তিনি। নাচতে নাচতে বারবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন মিস জোবায়দা। ফলে ছন্দপতন ঘটছে। পরক্ষণেই সেটা সামলে নেবার জন্যে নিতম্ব-বুক-কোমর কল্পনাতীত অশ্লীল ভঙ্গিতে দর্শকদের চোখের সামনে দুলিয়ে ত্রুটি ঢাকছেন। দর্শকদের আনন্দোচ্ছ্বাসে থেকে থেকে হল-ঘরটা ভরে উঠছে।

নিঃশব্দে বসে আছে শহীদ ও কামাল। কামাল একমনে উপভোগ করছে মিস জোবায়দার নাচ। শহীদও দেখছে, কিন্তু এক একবার সে তাকাচ্ছে এপাশে-ওপাশে।

এমন সময় হঠাৎ তার চোখে পড়লো ডানদিকের টেবিলে বসে থাকা ক্ষতবিক্ষত চেহারার লোকটা টেবিলের নিচে থেকে ঝুঁকে পড়ে কি যেন একটা তুলে নিলো। কি মনে করে শহীদ মি. আবেদীনের দিকে তাকালো। দেখলো, মি. আবেদীনও তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করছেন ব্যাপারটা।

এরপর হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো শহীদ। কামাল কিছু বলতে যাচ্ছিলো। তাকে ইশারায় চুপ করিয়ে দিলো শহীদ।

হল-ঘর থেকে বের হয়ে সোজা হোটেল ডি-করোনেশনের ম্যানেজারের অফিসের দিকে দ্রুত পায়ে এগোতে লাগলো সে। মি. মল্লিক অফিস রুমেই ছিলেন। শহীদকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আসুন, মি. শহীদ।'

'ব্যস্ত হবেন না।' মি. মল্লিককে বসতে ইঙ্গিত করে নিজেও একটা চেয়ার দখল করে শহীদ বললো, 'একটা লোক সম্পর্কে কিছু জানতে চাই আমি।'

'বলুন?'

'নাম জানি না আমি ভদ্রলোকের, ক্ষতবিক্ষত চেহারা ওনার, বসে বসে নাচ দেখছেন হল-ঘরে। হোটেলেই থাকেন বোধ হয়। চিনতে পেরেছেন?'

'ক্ষতবিক্ষত মুখ?' মি. মল্লিক যেন চিনতে পেরেছেন লোকটাকে। বললেন, 'ওনার নাম সেলিম খান। হ্যাঁ, হোটেলেই থাকেন। প্রায়ই আসেন উনি জালালাবাদে এবং এই হোটেলেই থাকেন। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো?'

শহীদ সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলে, 'এবার কবে উঠেছেন তিনি হোটেলে?'

'গত দশ তারিখে।'

'কি করেন ভদ্রলোক জানেন?'

'একমিনিট দাঁড়ান,' মি. মল্লিক শহীদের দিকে তাকিয়ে কলিং বেল টেপেন। একজন কেরানী এসে দরজার সামনে দাঁড়ায়। আচমকা বিদঘুটে একটা শব্দ করে চেয়ারটা পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে শহীদ মেঝেতে সটান শুয়ে পড়ে চকিতে। সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ-ধার একটা ছোরা জানালার বাইরে থেকে তীর বেগে এসে ছিট্কে পড়ে মেঝেতে।

'এ কি!' চিৎকার করে ওঠেন মি. মল্লিক।

ততক্ষণে শহীদ দ্রুত মেঝে থেকে উঠে ছুটে বের হয়ে গেছে ঘর ছেড়ে। মি. মল্লিকও তাঁর থলথলে শরীর নিয়ে থপথপ করে শহীদের পিছু নেন।

অফিস রুম থেকে বের হয়ে শহীদ কোনো মানুষের ছায়াও দেখতে পেলো না।

'কি ব্যাপার, মি. শহীদ?' উত্তেজিত কণ্ঠে মি. মল্লিক জানতে চান।

মৃদু হেসে শহীদ বলে, 'ব্যাপার গুরুতর। কিন্তু লোকটাকে ধরা গেল না।'

অফিস রুমে ফিরে এসে চেয়ারটা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে আবার বসলো শহীদ। মি. মল্লিক হোটেলের রেজিস্টার বই আনিয়ে দেখে বললেন, 'মি সেলিম খান, ব্যবসায়ী, স্থায়ী ঠিকানাঃ বন্দর রোড, করাচী, ব্যবসাঃ জাহাজ ভাড়া খাটান, রুম নম্বর বাইশ।'

শহীদ প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা, মি. মল্লিক, গত কয়েকদিনের মধ্যে মি. আবেদীন বা মিসেস খোদাবক্স হোটেল ছেড়ে জালালাবাদের বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন কি না বলতে পারেন?'

'মি. আবেদীন গিয়েছিলেন—গত বুধবার।'

'কেন, তা জানেন?'

'না, তা জানি না। নাচের আসরে প্রত্যহ মি. আবেদীনের উপস্থিতি বাঁধাধরা। গত বুধবার নাচের আসরে তাঁর দেখা পাইনি বলে জিজ্ঞেস করেছিলাম মিসেস খোদাবক্সকে। তিনিই আমাকে জানিয়েছিলেন যে মি. আবেদীন ঢাকায় গেছেন।'

'ধন্যবাদ। আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই আমার।'

শহীদ কথা ক'টি বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। মি. মল্লিকও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ান। বলেন, 'একটা প্রশ্ন আছে, মি. শহীদ। মিস সুফিয়ার হত্যাকে কেন্দ্র করে আমার হোটেলের কোনো বদনাম হবার আশঙ্কা নেই তো?'

মৃদু হেসে শহীদ বলে, 'অযথা কাউকে বিব্রত বা ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্য আমাদের নেই, মি. মল্লিক।'

'ধন্যবাদ, মি. শহীদ।'

কামালের কাছে ফিরে এসে শহীদ চাপা স্বরে বলে, 'এখন থেকে খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হবে আমাদের, কামাল। প্রতিপক্ষ আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে। এই-মাত্র মি. মল্লিকের ঘরে আমাকে লক্ষ্য করে ছোরা ছোঁড়া হয়েছিল।'

আশ্চর্য হয়ে কামাল বললো, 'কে লোকটা? দেখতে পেয়েছিলি?'

শহীদ বলে, 'না। দেখতে পেলে অক্ষত ফিরতে হতো না। যার আঙুলের ছাপ নিয়ে মি. হোজার হাতে দিয়েছিলাম, সেই বেবিট্যাক্সি ড্রাইভারটাই ছুঁড়েছিল ছোরাটা, আমার যতদূর বিশ্বাস।'

ছয়

পরদিন ঢাকায় মি. সিম্পসনের কাছে জরুরী একটা টেলিগ্রাম পাঠালো শহীদ। তারপর পোস্টাফিস থেকে বেরিয়ে হোটেলে না ফিরে জালালাবাদ থানায় গেল মি. হোজার সঙ্গে দেখা করতে। মি. হোজা ছিলেন না থানায়। কোথায় গেছেন তাও জানতে পারলো না শহীদ।

সে হোটেলে ফিরতেই কামাল বললো, 'মি হোজা এসেছিলেন তুই চলে যাবার পর।'

'নাকি? তা নতুন কিছু খবর পাওয়া গেল?'

কামাল বললো, 'তার আন্দাজ সঠিক প্রমাণিত হয়েছে—সেই ড্রাইভারটি একজন দুর্দান্ত লোক। আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করে জানা গেল লোকটি খুন, রাহাজানি, ডাকাতি ইত্যাদি নানারকম দুষ্কর্মের সঙ্গে জড়িত আছে। বছর তিনেক লোকটির কোনো পাত্তা পাওয়া যায়নি। নাম, হোবি। লোকটিকে শেষবার দেখা গিয়েছিল পেশোয়ারে। দ্বিতীয় খবর, মি. হোজা ড. সুফিয়ানের বাড়িতে যে বোতলটি পেয়েছিলেন তাতে পুরুষ

মানুষের হাতের ছাপ পাওয়া গেছে স্পষ্ট। সেই হাতের ছাপ মিলিয়ে দেখার জন্যে হোটেলের দু'জনের হাতের ছাপ সংগ্রহ করে নিয়ে গেছেন তিনি।'

'কার কার?'

'মি. শ্রীধর আর মি. আবেদীনের।'

'হেতু?'

'এরা দু'জনেই মদ্যপায়ী বলে হোটেলে পরিচিত।'

শহীদ বললো, 'বৃথা চেষ্টা। ছাপ মিলবে না।'

কামাল বললো, 'সে আমিও জানি।'

কথা বলা এবং শোনার ফাঁকে শহীদের দৃষ্টি জানালা পথে বাইরের দিকে পড়তে সে দেখতে পায়, হোটেলের রাস্তার ওপর ক্রাচে ভর দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে সেই ফকিরটা। তাকিয়ে দেখতে থাকে সে ফকিরটাকে। এমন সময় রাস্তা পেরিয়ে সুবেশী একটি লোককে ফকিরটার দিকে হেঁটে আসতে দেখা যায়। লোকটা এগিয়ে এসে ফকিরটির হাতে খুব সম্ভব পয়সা দেয়। কিন্তু দূর থেকে হলেও শহীদের দৃষ্টি এড়ায় না, লোকটার বাম হাতটি কোটের পকেট থেকে কি যেন একটা বের করে ফকিরটার ঝোলার ভিতর ফেলে দেয় গোপনে। তারপর দ্রুত পায়ে রাস্তার চলমান জনতার সারিতে মিশে যায় লোকটা।

একটু পর আরও একটা ভদ্রলোককে রাস্তা পেরিয়ে এগিয়ে যেতে দেখা যায় খোঁড়া ফকিরের দিকে। শহীদ মুখ ফিরিয়ে পার্শ্ববর্তী কামালের দিকে তাকায় একবার। তারপর বলে, 'পুণ্যবিলাসীরা খোঁড়া ফকিরকে ভিক্ষা দিতে হরদম রাস্তা পার হচ্ছেন, ব্যাপারটা কি বল তো?'

শহীদের কথা শেষ হতে দেখা গেল ভদ্রলোক ফকিরটিকে কি যেন বলতে সে তাড়াতাড়ি তার কাঁধের ঝোলাটা পাশের চৌকো সিমেন্ট বাঁধানো ডাস্টবিনের ভিতর ফেলে দেয়। তারপর ক্রাচে ভর দিয়ে ক্যাঙ্গারুর মতো লাফাতে লাফাতে রাস্তা পেরিয়ে কোন্‌দিকে গেল দেখতে পেলো না শহীদ। পূর্বোক্ত ভদ্রলোকও ইতিমধ্যে উধাও হয়েছেন।

শহীদ তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিল ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত ফকিরের ঝোলাটার দিকে। হঠাৎ একটা বোমা ফাটার শব্দে চমকে উঠলো শহীদ ও কামাল। শহীদ দেখলো, সিমেন্ট-বাঁধানো চৌকো ডাস্টবিনটা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে না কিছুই।

দিন দুপুরে রাস্তার ওপর একটা অঘটন ঘটতে দেখে ভিড় জমে গেল চারদিকে। ধোঁয়া মিলিয়ে যেতে দেখা গেল ডাস্টবিনটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে, ফকিরের ঝোলার চিহ্নমাত্র নেই কোথাও।

কামাল বললো, 'অদ্ভুত! কিছুই বোঝা গেল না ব্যাপারটার রহস্য।'

শহীদও সায় দিলো, 'সত্যি অদ্ভুত।'

সেদিন হোটেলের সামনে ফকিরটাকে আর একবারের জন্যেও দেখা গেল না।

কয়েকদিন পরের ঘটনা। সকাল বেলা আয়েশা বেগমের জরুরী ফোন পেয়ে আর্কিমিডিস লজে গিয়েছিল শহীদ একা। আর্কিমিডিসে ঢুকে সোজা দোতলায় উঠে গেল শহীদ। আয়েশা বেগম তাঁর ঘরেই অপেক্ষা করছিলেন। শহীদকে দেখে তিনি বললেন, 'এসেছো, বাবা, তুমি। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম এতক্ষণ।'

কথা ক'টি উত্তেজিত কণ্ঠে বলে আয়েশা বেগম হাতের মুঠো থেকে একটা চিঠি বের করে শহীদের দিকে বাড়িয়ে দেন। বলেন, 'এটা আজ ওনার পকেট থেকে পেয়েছি। আমার মনে হয় এই চিঠিটা পেয়েই উনি এতো উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন।'

'স্যার কোথায়?'

আয়েশা বেগম ভেঙে পড়া গলায় বললেন, 'তোমাকে টেলিফোন করে নিচে নেমে ওনাকে আর দেখতে পাইনি। কোথায় গেছেন, কাউকে বলে যাননি।'

হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে শহীদ বলে, 'আপনি ভয় পাবেন না, চাচী আম্মা, আমি তো রয়েছি আপনাদের সঙ্গে।'

হাতের চিঠিটা খুলে লেখার ওপর চোখ ফেলতেই ভীষণ চমকে ওঠে শহীদ। তারপর মৃদু একটা হাসির রেখা তার ওষ্ঠপ্রান্তে জেগে ওঠে। চিঠিটা পড়া শেষ করার পর তার মুখের হাসিটা আরও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে।

'কি বুঝলে, বাবা? ভালো ব্যাপার?' আয়েশা বেগম জিজ্ঞেস করেন।

'হ্যাঁ,' হাসতে হাসতে বলে শহীদ, 'আপনার টুটুলকে আপনি ফিরে পাবেনই, এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

'সত্যি, বাবা!' আশেয়া বেগমের চোখে অশ্রু টলমল করে ওঠে, 'কিন্তু তার আর কতো দেরি! আমি যে আর পারছি না।'

আর্কিমিডিস লজ থেকে বেরিয়ে শহীদ একটা বেবিট্যাক্সি নিয়ে মি. হোজার সঙ্গে দেখা করার জন্য থানায় পৌঁছলো। মি. হোজাকে আজও থানায় পাওয়া গেল না। শহীদ জানতে পারলো, মি. হোজা গেছেন জালালাবাদ নিউ মার্কেটে। মিস সুফিয়ার মৃতদেহ যে নতুন গুলটেক্সের চাদরে জড়ানো ছিলো সেটা কোন্ দোকান থেকে কেনা হয়েছে এবং কে কিনেছে তার খোঁজ নিতে। খবরটা শুনে মনে মনে হাসে শহীদ। তারপর থানা থেকে বেরিয়ে অপেক্ষারত বেবিট্যাক্সিতে চড়ে ড্রাইভারকে বলে, 'হোটেল ডি-করোনেশনে চলো।'

হোটেলের সামনে স্কুটার থেকে নেমে ভাড়া চুকিয়ে দেবার পর হঠাৎ কি মনে করে শহীদ রাস্তার অপর পারে তাকায়। তাকিয়েই চমকে ওঠে। সেই খোঁড়া ফকিরটা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ওপারে। শহীদের দিকেই তাকিয়ে আছে লোকটা। তার দিকে তাকিয়ে হাসছে মৃদু মৃদু। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো শহীদ। কিন্তু আচমকা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার চোখ দু'টো। লোকটার হাসির প্রত্যুত্তরে সে-ও হাসে মৃদু মৃদু। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হোটেলের গেটের দিকে পা বাড়ায়।

রুমের দরজা খুলে দিয়ে কামাল বলে, 'মি. সিম্পসনের টেলিগ্রাম এসেছে শহীদ।'

'কই দেখি!' আগ্রহী হয়ে ওঠে শহীদ কামালের কথা শুনে।

কামালের হাত থেকে টেলিগ্রামের খামটা নিয়ে সোফার উপর বসে মনোযোগ সহকারে সেটা পাঠ করে শহীদ। তার চোখ দু'টো কুঞ্চিত হয়ে আসে ধীরে ধীরে। কি ভেবে কামালের মুখের দিকে তাকায় একাবার, তেপয়ের ওপর টেলিগ্রামটা রেখে ঝুঁকে পড়ে আরও একবার চোখ বুলিয়ে নেয় সেটার উপর। তারপর তেপয়ের উপর হাল্কা একটা মুষ্ট্যাঘাত করে বলে ওঠে, 'দ্যাটস ইট!'

বিস্মিত কামাল হতবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিলো। বললো, 'কি ব্যাপার?'

'ব্যাপার গুরুতর। মি. আবেদীনের কল্যাণী অনাথ আশ্রম এবং ঢাকা থেকে নিখোঁজ মিস পাপিয়া সম্পর্কে বহু চমকপ্রদ তথ্য জানা গেছে।'

'বল তো শুনি,' কামাল আগ্রহান্বিত কণ্ঠে বলে।

'এহ্ বাহ্য।' শহীদ বলে, 'এর চেয়েও গুরুতর খবর তোকে দিতে পারি।'

কামাল অধৈর্য কণ্ঠে বলে, 'তোর এই রকম দম্ভে মারা আমার সহ্য হয় না মোটেই।'

'শোন না,' শহীদ হাসতে হাসতে বলে, 'আজ আয়েশা বেগম আমাকে একটা চিঠি দেখিয়েছেন। সেটি কার জানিস? কুয়াশার! কুয়াশা জানিয়েছে টুটুলকে সে ড. সুফিয়ানের হাতে তুলে দেবে আগামী ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে রাত দশটার মধ্যে।'

কামাল বলে, 'জবর খবর বটে। কিন্তু কুয়াশা এ ব্যাপারে আগ্রহী কেন?'

শহীদ বলে, 'খুবই সহজ কারণটা। ড. সুফিয়ানের সাহায্য কামনা করে কুয়াশা তার বিজ্ঞান সাধনার জন্যে।'

কামাল বলে, 'তার মানে ড. সুফিয়ানকে কুয়াশা তার কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করে নিজের কাজ করিয়ে নিতে চায়?'

'ঠিক তাই।'

চিন্তিত মুখে কামাল বলে, 'ভাবনার কথা।'

'ভাবনার কথাই বটে,' শহীদ বলে, 'আয় ভাবনার বস্তুটাকে দেখে নে তবে।' কামালের কাঁধে হাত দিয়ে তাকে জানালার কাছে টেনে আনে শহীদ।

কামাল বলে, 'হেঁয়ালি শুরু করলি যে!'

জানালার বাইরে তাকিয়ে শহীদ চোখের ইশারায় বলে, 'রাস্তার ওই খোঁড়া ফকিরটাকে দেখতে পাচ্ছিস তো?'

'পাচ্ছি।'

'লোকটা,' শহীদ কামালের দিকে ফিরে বলে, 'কুয়াশা।'

'কুয়াশা!'

সাত

সেদিনই বেলা একটার সময় শহীদ ও কামাল বর্ধমান হাউসে গিয়ে উপস্থিত হলো।

'কাকে চান?' দরজা খুলে প্রশ্ন করলো ওসেনা শাহবাজী।

'সাবির চৌধুরী আছেন?' পাল্টা প্রশ্ন করলো শহীদ।

'আসুন আপনারা।' দরজার সামনে থেকে সরে দাঁড়িয়ে বললো ওসেনা শাহবাজী, 'আমি ডেকে দিচ্ছি ওনাকে।'

ওদেরকে বসতে বলে মিস শাহবাজী পর্দা ঠেলে পাশের ঘরে যেতে কামাল বললো, 'ইনি এখানে কেন বলতো, শহীদ?'

হেসে ফেলে শহীদ বললো, 'আমি কি করে জানবো বল?'

এমন সময় স্বয়ং সাবির চৌধুরী ঘরে প্রবেশ করে ওদের মুখোমুখি একটা সোফায় বসলেন। ওসেনা শাহবাজীও একটু পরে তার পাশে এসে বসে।

'আপনারা…'

'আপনার সঙ্গে জরুরী কয়েকটা কথা আছে, মি. চৌধুরী,' শহীদ বলে। 'আপনি কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনলে বাধিত হবো। আর, তার ফলে আপনি অনাবশ্যক অনেক ঝামেলা থেকে মুক্ত হবেন বলেই আমার বিশ্বাস।'

কথা ক'টি বলে শহীদ কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে থাকে মি. সাবির চৌধুরীর দিকে। মুখের রেডিমেড হাসিটা তাঁর মিলিয়ে গেছে ইতিমধ্যে। সেদিনকার মতো আজ আর হৈ-চৈ চিৎকার করছেন না, কেমন যেন অপ্রতিভ দেখাচ্ছে তাঁকে। মাথা নিচু করে বসে আছেন তিনি।

ধীর অথচ শান্ত কণ্ঠে শহীদ শুরু করে, 'গত ১২ই ডিসেম্বর রাতে হোটেল ডি-করোনেশনের ড্যান্সার-কাম-ব্রিজ পার্টনার মিস সুফিয়াকে গলা টিপে হত্যা করার অভিযোগে যে কোনো মুহূর্তে আপনি গ্রেফতার হতে পারেন, মি. চৌধুরী।'

শহীদের কথা শেষ হতে ভয়-কাতর দৃষ্টিতে মি. চৌধুরী তাকায় শহীদের পানে। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে মি. চৌধুরীকে দেখতে থাকে শহীদ।

'এ সব কি বলছেন উনি! তুমি অমন চুপ করে রইলে কেন, সাবির?' মিস শাহবাজী চিৎকার করে ওঠে যেন।

'বিশ্বাস করুন, মি. শহীদ, আমি এসব ব্যাপারের কিছুই জানি না। খুন আমি করিনি।' করুণ মিনতির সুরই ফুটে ওঠে মি. চৌধুরীর কণ্ঠে।

'কিছুই জানেন না আপনি?' অধৈর্য কণ্ঠে শহীদ বলে ওঠে, 'জানেন না ভালো কথা, কিন্তু গ্রেফতার আপনি হবেনই। একটা মদের বোতল পাওয়া গেছে মিস সুফিয়ার লাশের সঙ্গে, বোতলের গায়ে আঙুলের ছাপ প্রমাণ করবে আপনি দোষী…।'

শহীদের কথা শেষ হতে কান্নাজড়িত কণ্ঠে মিস শাহবাজী বলে ওঠে 'আমি যে

কিছুই বুঝতে পারছি না, সাবির! এমন নার্ভাস ফীল করছো কেন?'

হঠাৎ উঠে দাঁড়ান মি. চৌধুরী। শহীদের সামনে গিয়ে করুণ কণ্ঠে বলতে থাকেন, 'বিশ্বাস করুন, মি. শহীদ, মিস সুফিয়াকে আমি খুন করিনি, তাকে আমি চিনতামই না, কিন্তু···আপনি আমাকে রক্ষা করুন, মি. শহীদ! আমি যা জানি সব বলছি আপনাকে।'

শহীদ শান্ত কণ্ঠে বলে ওঠে, 'এই তো কাজের কথা। আপনি যা জানেন, সেটার শুরু আমিই করি। ভুল হলে ধরিয়ে দেবেন। গত ১২ই ডিসেম্বর রাতে শূটিং থেকে মত্তাবস্থায় ফিরে আপনি এই ঘরে···'

মি. চৌধুরী শহীদকে বাধা দেন। বলেন, 'আমিই বলছি মি. শহীদ। সব কথা না বললে আপনি হয়তো বুঝতে পারবেন না। গত ১২ই ডিসেম্বর বিকেল বেলা শাহবাজীর সঙ্গে আমার একটু ঝগড়া-ঝাঁটি হয়। তাতে রাগ করে ও চলে যায় ওর এক আত্মীয়ার বাড়ি। রাতে শূটিং-এ গিয়ে আমি ওকে খবর পাঠাই আমার কাছে ফিরে আসতে। আমার কিছু টাকার দরকার ছিলো। সব টাকা শাহবাজীর কাছেই থাকে। শাহবাজী আমার পাঠানো লোকটার হাতে টাকা দেয় বটে; কিন্তু রাগ করে বলে পাঠায়, সে আসবে না। শাহবাজীর সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার দরুন মেজাজ এমনিতেই আমার ভালো ছিলো না। তারওপর ওর অদর্শনে মনটা খিঁচড়ে ওঠে আরও। শ্যূটিং করতে করতেই তাই আমি অবাধ্য হয়ে উঠি। শাহবাজী আমাকে মদ খেতে দেখলে রাগ করতো বলে ঠিক করি, আজ আমি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরবো। রাত যখন দু'টো বাজে, তখনও শূটিং-এর কাজ বাকি ছিলো। কিন্তু তখন আমি পুরোপুরি মাতাল হয়ে পড়েছি। কোনরকমে সহকারী পরিচালকের হাতে সব ভার দিয়ে আমি একা গাড়ি করে বাড়ি ফিরে আসি। ঘরের চাবি আমাদের দু'জনের কাছেই থাকে। ঘরের তালা খুলে আলো জ্বালতেই আমি অবাক হয়ে যাই। শাহবাজী আজ ফিরবে না বলেছিল, ফিরলেও এঘরে তার শোবার কথা নয়, কিন্তু ঘরে ঢুকে আলো জ্বালার পরই আমি দেখতে পাই একটি যুবতী শুয়ে আছে খাটের ওপর। যুবতীটির মুখ দেখা যাচ্ছিলো না। ভাবলাম শাহাবাজী ফিরে এসেছে তাহলে। মদ খেয়ে অপ্রকৃতিস্থ ছিলাম বলেই বোধ হয় তখন মনে পড়েনি যে দরজায় তালা লাগানো থাকা সত্ত্বেও শাহবাজী ঘরে ঢুকলো কি করে? যাই হোক, খাটের ধারে এগিয়ে গিয়েই আমি বুঝতে পারি, বিছানায় যে শুয়ে আছে সে শাহবাজী নয়। বোকার মতো দাঁড়িয়েছিলাম আমি। তারপরই আমি বুঝতে পারি যুবতীটি জীবিত নয়—

'মদের নেশা তখন আমার ছুটে যায়। কিছুই বুঝে উঠতে পারি না আমি। যুবতীটি কে তা আমি জানতাম না। কে এমন কাজ করলো তাও ভেবে পেলাম না। রাত শেষ হয়ে যাবার আগেই শ্যূটিং শেষ হয়ে যাবে, ফিরে আসবে সহকারী পরিচালক, তারপর আমাকে এবং যুবতী একটি মেয়ের মৃতদেহ দেখলে কি সর্বনাশ ঘটবে তা আমি বুঝতে পারলাম। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে বসলাম আমার কি করা উচিত।

'ভাবলাম পুলিসকে ফোন করি। কিন্তু পুলিসকে ফোন করার ব্যাপারটা কেন যেন মনে হলো নিজের সর্বনাশ করারই নামান্তর হবে। পুলিস এই অদ্ভুত সত্য ঘটনা কোনমতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না। হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল সুফিয়ানের কথা। সুফিয়ানকে আমি চিনতাম, লোকটা এককালে আমার বন্ধুর মতো ছিলো; কিন্তু বড্ড অহংকারী ও। বহুদিন হলো কোনো সম্পর্ক রাখি না তাই ওর সঙ্গে। ঠিক করলাম পুলিস-ফুলিসের হাঙ্গামা না করে লাশটা সরিয়ে ফেলা যাক। আর সরাতেই যদি হয় তবে সুফিয়ানের বাড়িতেই সরানো যেতে পারে। এখন মনে হচ্ছে নেশা আমার সে রাতে আদৌ কাটেনি। সব মাতালের মতো ভেবেছিলাম, আমি নেশাগ্রস্ত নই। ব্যাপারটা ঠিক করে ফেলার পর বেশ আনন্দই লাগছিল আমার। যুবতী একটি মেয়ের লাশ এবং আদর্শবাদী বৈজ্ঞানিক সুফিয়ান—দৃশ্যটা কল্পনা করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিলাম আমি। তাড়াতাড়িতে কিন্তু মারাত্মক দু'টো ভুল হয়ে গিয়েছিল আমার। আমার সঙ্গে মদের বোতল ছিলো একটা, কখন জানি না সেটা বিছানার ওপর রেখেছিলাম, তাড়াতাড়িতে যুবতীর মৃতদেহটা বিছানার চাদরটাতে পেঁচিয়ে কাঁধে তুলে গাড়ির ভিতর নিয়ে যাই। মদের বোতলটা যে চাদরের ভিতর রয়ে গেল তা আর জানলাম না। দু'একদিন আগে কেনা নতুন চাদরটাও প্রমাণ হিসেবে গেল, সে খেয়ালও রইলো না।'

নীরবতা ভঙ্গ করে শহীদ বলে, 'আমার ধারণার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে সব। তবে একটা প্রশ্নের উত্তর আমার এখনও জানা বাকি রয়ে গেছে। বলুন দেখি, মি. চৌধুরী, প্রথম যেদিন আপনার সঙ্গে আমরা দেখা করতে আসি, সেদিন মিস শাহবাজী আপনাকে হঠাৎ এসে বললেন, ''আবার তুমি টাকা দিয়েছো শয়তানটাকে? বারবার বলেছি আব্বাকে আমরা সব জানিয়ে দিই চলো।'' ব্যাপারটা আসলে কি সংক্রান্ত জানতে পারি কি?'

মি. চৌধুরী শহীদের প্রশ্ন শুনে মিস শাহবাজীর দিকে তাকান একবার। তারপর বলেন, 'আপনার কাছে ব্যাপারটা গোপন করার কোনো মানে হয় না। ব্যাপারটা হচ্ছে, আজ থেকে বছর খানেক আগে আমাদের বিয়ে হয়েছে গোপনে। এই বিয়েতে শাহবাজীর আব্বার ঘোরতর আপত্তি ছিলো। তাই আমরা বিয়েটা করে ফেলেছি লুকিয়ে। এখনও সেটা প্রকাশ করা হয়নি। প্রকাশ পেলে ওর আব্বা ওকে ত্যাগ করবেন নিশ্চিত, আমার পরিচালক জীবনেরও অবসান ঘটবে। তাই ব্যাপারটা চাপা দিয়ে রাখতে চাই—অন্ততঃ বর্তমান ছবিটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু বিয়ের কথাটা কেমন করে জানি না সেলিম খান নামে একটা লোক জানতে পেরেছে কয়েক মাস আগে। তারপর থেকে প্রতি মাসে এক হাজার করে টাকা তুলে দিতে হয় সেলিম খান নামে ওই শয়তানটার হাতে। লোকটা এখন জালালাবাদেই আছে, হোটেল ডি-করোনেশনে। শাহবাজীর কাছে টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিলাম সেলিম খানকে দিতে হবে বলেই।'

শহীদ বলে, 'আপনাদের বিয়ে যদি গোপনেই হয়ে থাকে তাহলে সেলিম খান

জানলো কিভাবে?'

মিসেস শাহবাজী উত্তর দেন, 'কি জানি, মি. শহীদ, সে কথা আমরাও জানি না।'

শহীদ বলে, 'রেজিস্ট্রি অফিসে বিয়ে হয়েছিল তো আপনাদের?'

'হ্যাঁ।'

'সাক্ষী ছিলো কে কে?'

মি. চৌধুরী বলেন, 'আগে থেকে সাক্ষী যোগাড় করে আমরা রেজিস্ট্রি অফিসে যাইনি। ভেবেছিলাম, ঘুষ-টুষ দিয়ে সাক্ষী যোগাড় করে নেবো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাউকে ঘুষ দেবার দরকার হয়নি। আরও দু'জন নারী-পুরুষ সেদিন আমাদেরই মতো গোপনে বিয়ে করতে রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়েছিলেন। তাঁরাই সাক্ষী হন আমাদের, আমরাও তাঁদের সাক্ষী হই।'

আগ্রহী কণ্ঠে শহীদ জিজ্ঞেস করে, 'কে তারা? চেনেন নিশ্চয়?'

মিসেস শাহবাজী এবং মি. চৌধুরী একই সঙ্গে বলে ওঠেন 'না, চিনি না তাদের। যোগাযোগও নেই কোনো।'

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে শহীদ বলে, 'আচ্ছা, আপনাদের বিয়ের কাবিননামাটা আপনাদের কাছে আছে?'

'তা আছে। ওটা সব সময় আমার কাছেই থাকে,' মিসেস শাহবাজী উত্তর দেয়।

'দেখাতে পারেন সেটা একবার?'

'বেশ বসুন, আমি আনছি এখুনি।'

কিছুক্ষণ পর মিসেস শাহবাজী একটা কাবিননামা নিয়ে ফিরে আসেন। হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে সাক্ষীদের ঘরে দু'টো পরিচিত নাম দেখে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে ওঠে শহীদ। কিন্তু সে কিছু বলে উঠবার আগেই মি. হোজা দু'জন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ করেন।

শহীদের দিকে তাকিয়ে ধূর্ত হাসি হাসেন তিনি। কিন্তু কিছুই বলেন না শহীদকে। মি. সাবির চৌধুরীর দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি বলে ওঠেন, 'মিস সুফিয়াকে হত্যা করার অভিযোগে আপনার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট আছে, মি. চৌধুরী। আমরা আপনার বিরুদ্ধে বহু প্রমাণও সংগ্রহ করেছি ইতিমধ্যে। সে সব যথাসময়ে কোর্টে হাজির করা হবে। এখন আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে আপনাকে।'

কথাটা বলে পুলিস ইন্সপেক্টর মি. হোজা সাবির চৌধুরীর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেন। তারপর শহীদ কিছু বলবার আগেই মি. হোজা তার দিকে তাকিয়ে, 'চলি মি. শার্লক হোমস,' বলে সাবির চৌধুরীকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যান।

ঘটনার আকস্মিকতায় মিসেস শাহবাজীর বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। মি. চৌধুরীকে হাতকড়া পরিয়ে ঘরের বাইরে নিয়ে যেতেই সে ডুকরে কেঁদে উঠে সোফার ওপর লুটিয়ে পড়ে। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বারবার শুধু একটা কথাই মিসেস শাহবাজী বলতে থাকে, 'না, না, আমি বিশ্বাস করি না। সাবির খুনী নয়!'

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় শহীদ। বলে, 'সে আমি জানি, মিসেস শাহবাজী।'

'আপনি জানেন!'

'জানি বৈকি! সুফিয়ার হত্যাকারী কে, তা-ও আমি জানি। কিন্তু অপরাধীদের বিরুদ্ধে অমোঘ প্রমাণ যোগাড় করা সহজ নয়। আপনি নিশ্চিন্ত মনে ধৈর্য ধরে থাকুন কয়েকটা দিন, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ওরা বর্ধমান হাউসের বাইরে বের হয়ে আসতে কামাল এতক্ষণে নীরবতা ভঙ্গ করে বলে, 'তুই সব জেনে-শুনেও সাবির চৌধুরীকে গ্রেফতার হতে দিলি কেন?'

শহীদ তাকালো একবার কামালের দিকে। তার কপালে ভাঁজ পড়েছে। বলে, 'তুই-ই বল না, কেন?'

'আমি জানলে তোকে আর জিজ্ঞেস করবো কেন?'

'ওরে, বুদ্ধু, সাবির চৌধুরী গ্রেফতার না হলে আসল অপরাধীরা যে সাবধান হয়ে যাবে—এই সহজ-সরল ব্যাপারটাও তোর মাথায় ঢুকলো না?'

কামাল কিছু না বলে চুপ করে থাকে।

আট

হোটেল ডি-করোনেশন থেকে মাইলখানেক দূরে সমুদ্রের তীরবর্তী একটা পাথরের আড়ালে চুপচাপ শুয়ে আছে শহীদ ও কামাল।

পাথরের আড়াল থেকে মুখ বের করে চাঁদের আলোয় বিস্তৃত বালুকাবেলায় সন্ধানী দৃষ্টি মেলে অপেক্ষা করছে দু'জনে। আধঘন্টাখানেক হলো ওরা এসেছে এখানে। ওরা পৌঁছেই দেখতে পেয়েছে কূল থেকে বেশ কিছুটা দূরে নোঙর করা রয়েছে একটা জাহাজ। পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করার আগে ওরা একটা ছায়ামূর্তিকে সামনের একটা পাথরের ওপাশে লুকাতে দেখেছিল। দূর থেকে চেনা যায়নি ছায়ামূর্তিটাকে। এখনও আড়াল থেকে বের হয়নি লোকটা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে শহীদ চারপাশে। বারবার ঘড়ি দেখছে। রেডিয়াম ডায়াল ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় ন'টা বেজে পনেরো। আরও খানিক সময় কেটে যাবার পর বেশ কিছুটা দূরে প্রায় পানির কাছ ঘেঁষে একটা লোক এগিয়ে আসছে দেখতে পেলো ওরা। কি মনে করে শহীদ পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে তৈরি হয়ে নিলো। এগিয়ে আসছে লোকটা ধীরে ধীরে। চেনা যাচ্ছে না লোক-টাকে। চাঁদের আলোয় মনে হচ্ছে ধূসর একটা ছায়া এগিয়ে আসছে যেন। আরও কিছুটা এগিয়ে এলো লোকটা পাতলা কুয়াশার মধ্য দিয়ে। এবার ফিসফিস করে কামালের উদ্দেশে শহীদ বললো, 'স্যার না?'

কামালও চাপা গলায় ফিসফিস করে উত্তর দিলো, 'আমারও তো তাই মনে হচ্ছে।'

কামালের কথা শেষ না হতেই সামনের তেকোণা পাথরের আড়ালে আত্মগোপন

করে থাকা ছায়ামূর্তিটা আত্মপ্রকাশ করলো।

ড. সুফিয়ান ছায়ামূর্তিটাকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ান। ছায়ামূর্তিটা কিন্তু দাঁড়ায় না, দ্রুত হাঁটতে থাকে ড. সুফিয়ানের দিকে। ড. সুফিয়ানের কাছে গিয়ে কি যেন বলে ছায়ামূর্তি। ড. সুফিয়ানও হাত নেড়ে কি যেন বলেন। ভাসা ভাসা শব্দ শুনতে পায় শহীদ ও কামাল; কিন্তু কথাগুলো বুঝতে পারে না।

ছায়ামূর্তিটা এরপর পকেট থেকে একটা টর্চ বের করে জ্বেলে জাহাজের দিকে দোলাতে থাকে। ওরা দেখলো জাহাজ থেকেও একটা আলো তিনবার সামান্য বিরতির ব্যবধানে জ্বলে উঠে আবার নিভে গেল। কয়েক মিনিট সময় এরপর কাটে পিন-পতন নীরবতার মধ্যে। তারপর আচমকা একটা হেলিকপ্টারের স্টার্ট নেবার শব্দ শুনে চমকে ওঠে শহীদ কামাল।

মুহূর্তেক পরই 'কপ্টারকে জাহাজের সামনে খোলা ডেক থেকে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে তীরের দিকে উড়ে আসতে দেখা যায়। তীরে দাঁড়িয়ে ছায়ামূর্তি আর তার পাশে ড. সুফিয়ান দু'জনে 'কপ্টারটার দিকে তাকিয়ে আছেন।

মিনিটখানেকের মধ্যেই ছায়ামূর্তি আর ড. সুফিয়ানের মাথার ওপর এসে পড়লো হেলিকপ্টারটা। তারপর নামতে শুরু করলো ধীরে ধীরে।

ছায়ামূর্তি ড. সুফিয়ানকে নিয়ে এগিয়ে গেল হেলিকপ্টারের দিকে। কাছাকাছি পৌঁছে কি যেন বললো কাকে। উত্তর দিলো কে যেন। কিছুই শুনতে পেলো না শহীদরা। হেলিকপ্টারের দরজা আগেই খুলে গিয়েছিল। ছায়ামূর্তি ড. সুফিয়ানকে সঙ্গে নিয়ে কপ্টারটার কাছে এসে দাঁড়াতেই শহীদ ও কামাল চিনতে পারলো ছায়ামূর্তিকে। ছায়ামূর্তি কুয়াশা।

এমন সময় অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটলো। হেলিকপ্টারের পিছন দিকের একটা দরজা খুলে গেল আস্তে আস্তে। সন্তর্পণে সেই খোলা দরজা পথে নেমে এলো দু'জন লোক। লোক দু'জনের হাতে চাঁদের আলোয় দেখা গেল চকচক করছে দু'টো রিভলবার। গুটি গুটি এগিয়ে কুয়াশা আর ড. সুফিয়ানের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো লোক দু'জন। তারপর ভয়াল কণ্ঠে বলে উঠলো, 'হাত ওপরে তোল, শয়তান!'

ড. সুফিয়ানের কণ্ঠ থেকে একটা বিস্ময়কর আওয়াজ বের হয়ে এলো। কুয়াশাও মনে হলো কেমন যেন বিচলিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু সে মাত্র মুহূর্তেকের জন্যে। পরক্ষণেই ড. সুফিয়ানকে এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে দিয়ে চোখের পলকে কুয়াশা লোক দু'টির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারের গুলির আওয়াজ শোনা যায়—কড়াক! কড়াক!

ইতিমধ্যে জাহাজের দিক থেকে তীব্র বেগে একটা স্পীডবোট তীরের দিকে ছুটছে দেখতে পাওয়া যায়।

গুলির আওয়াজ শুনে শহীদ আর কামাল উঠে দাঁড়িয়েছিলো। প্রবল উত্তেজনায় কাঁপছিল ওরা দু'জন। কুয়াশা কি তাহলে ঘৃণ্য আততায়ীর গুলির শিকার হলো?

কিন্তু মুহূর্তেক পরে স্পীডবোটের আলো বালুকাবেলায় পড়তে ওদের সে ভুল ভেঙে যায়। ওরা পরিষ্কার দেখতে পায় কুয়াশা অদৃশ্য হয়েছে আর আক্রমণকারী লোক দুটি মূর্ছিতপ্রায় ড. সুফিয়ানের থেকে একটু দূরে রক্তাক্ত অবস্থায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

'আশ্চর্য!' কামাল বলে।

'আয় আমার সঙ্গে।' কামালের উদ্দেশে কথাটা বলে শহীদ ছুট্ দেয় তীর লক্ষ্য করে।

স্পীডবোটটা ইতিমধ্যে তীরে এসে ভিড়েছিল। স্পীডবোট থেকে একে একে নামলো দশ-এগারো বছরের একটি ছোটো ছেলে আর শক্ত সমর্থ চেহারার দু'জন লোক।

শহীদ আর কামাল ছুটে এসে প্রথমেই তুলে ধরে ড. সুফিয়ানকে। প্রৌঢ় বৈজ্ঞানিক অস্থির আতঙ্কে ভুল বকে চলেছেন। ড. সুফিয়ানকে কামালের হেফাজতে রেখে শহীদ ছুটে যায় সামনে। এমন সময় হেলিকপ্টারের ককপিট থেকে খোলা ভোজালি হাতে বেরিয়ে আসে একটা লোক। লোকটাকে ককপিট থেকে বেরুতে দেখে ঘুরে দাঁড়ায় শহীদ। কিন্তু তার আগেই লোকটা হাতের ছোরাটা ছুঁড়ে মারে শহীদকে লক্ষ্য করে। চকিতে একপাশে সরে দাঁড়ায় শহীদ। বাতাসে শিস কেটে ছোরাটা দূরে গিয়ে পড়ে।

আক্রমণের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যেতেই শহীদ লাফিয়ে পড়ে আততায়ীর ওপর। ঝুঁকে পড়ে মাথা দিয়ে লোকটার তলপেটে প্রচণ্ড আঘাত করে শহীদ। 'উক্' শব্দ করে লোকটা হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে যেতে চায় মাটিতে। কিন্তু তার আগেই শহীদ তার ঘাড়ের পাশে ডান হাতের কনুই দিয়ে আবার প্রচণ্ড একটা আঘাত করে।

তীব্র আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে লোকটা। জাপানী কারাতের অব্যর্থ কৌশল ব্যর্থ হবার নয়।

হেলিকপ্টারকে পাশ কাটিয়ে শহীদ তীর লক্ষ্য করে ছুটতে থাকে। সেখানে তখন রীতিমত একটা খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না শহীদ। কুয়াশাকেও দেখতে পায় না চারপাশে চোখ মেলে। শুধু একটু দূরে দশ-এগারো বছরের ছোটো একটি ছেলে ডুকরে কাঁদছে দেখতে পায় সে।

মুহূর্তের মধ্যে ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলে শহীদ। এক ফাঁকে ছুটে গিয়ে সে ছোটো ছেলেটাকে তুলে নিয়ে উল্টোদিকে দৌড় দেয়।

কামালের সেবায় ইতিমধ্যেই ড. সুফিয়ান চাঙ্গা হয়ে উঠেছিলেন। ছোটো ছেলেটাকে নিয়ে তাদের কাছে হাজির হয় শহীদ। বলে, 'স্যার, শিগগির চলুন। আমাদের এখানে আর এক মুহূর্তও থাকা উচিত নয়।'

ছোটো ছেলেটাকে দেখেই ড. সুফিয়ান আবেগভরা কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'টুটুল, বাবা আমার!'

'আব্বু!' ছেলেটাও ডুকরে কেঁদে ওঠে।

ড. সুফিয়ান কাঁপা হাতে ছেলেকে বুকের ওপর তুলে নেন।

ড. সুফিয়ান আর টুটুলকে আর্কিমিডিস লজে পৌঁছে দিয়ে শহীদ ও কামাল যখন হোটেল ডি–করোনেশনে এসে পৌঁছলো তখন রাত বাজে একটা। গেট পেরিয়ে লবিতে পা রাখতেই কাউন্টারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা পাইপ সেবনরত একটা লোককে দেখে হেসে ওঠে শহীদ। হ্যাণ্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে লোকটার কাছে গিয়ে বলে ওঠে, 'হ্যাল্লো, মি. সিম্পসন, হাউ ডু ইউ ডু?'

'ভালোই আছি,' মি. সিম্পসন মুখ থেকে পাইপটা খুলে ওদের দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসি হেসে বলেন, 'তোমাদের খবর কি?'

'ভালোই বলতে পারেন,' কামাল উত্তর দেয়, 'আমরা এইমাত্র বিরাট একটা অ্যাডভেঞ্চার থেকে ফিরলাম।'

'কি রকম?'

'আসুন আমাদের স্যুটে গিয়ে বলছি।'

'কিন্তু আমিও তো একটা স্যুট ভাড়া নিয়েছি। তোমরা আমার ঘরেই চলো না।'

'আপনি কখন এসেছেন?'

'এই তো, মাত্র কিছুক্ষণ আগে।'

'কিন্তু ট্রেন তো, এ সময়…'

'আই হ্যাভ কাম বাই স্পেশাল প্লেন।' মৃদু হেসে কামালের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকেন মি. সিম্পসন। শহীদ ও কামাল তাঁর পিছু নেয়।

নয়

পরদিন বিকেলে ড. সুফিয়ানের ড্রইংরুমে শহীদ ও ড. সুফিয়ানের আমন্ত্রণক্রমে মিসেস রসুলবক্স, মিসেস খোদাবক্স, মি. আবেদীন, মিস জোবায়দা, হোটেল ডি–করোনেশনের ম্যানেজার মি. মল্লিক, মি. শ্রীধর, মিসেস শাহবাজী এবং জালালাবাদ থানার ইন্সপেক্টর মি. হোজা একটি আনন্দ উৎসবে হাজির হলেন। বলাই বাহুল্য, মি. সিম্পসন শহীদ ও কামালের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।

দৃশ্যতঃ হারানো ছেলে টুটুলকে ফিরে পাওয়া উপলক্ষে ড. সুফিয়ান এই আনন্দোৎসবের আয়োজন করলেও শহীদেরও অন্য আর একটা উদ্দেশ্য ছিলো। সে উদ্দেশ্যের কথা ড. সুফিয়ানকে সে আগেই জানিয়েছিল। মিসেস শাহবাজী এবং মিসেস রসুল বক্সকেও একটা ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছিল।

মিসেস রসুল বক্সের ইচ্ছাতেই মিসেস খোদাবক্স এবং মি. আবেদীন এই সমাবেশে উপস্থিত হতে বাধ্য হয়েছেন। মিস জোবায়দাও হোটেল ম্যানেজার মি. মল্লিকের কথার অবাধ্য হতে না পেরে যোগ দিয়েছেন অগত্যা।

শহীদ ও কামাল পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসে আছে। শহীদের পাশে আসীন মি.

সিম্পসন, কামালের পাশে বসে আছেন মিসেস রসুল বক্স তারপর যথাক্রমে মিসেস শাহবাজী, মিসেস খোদাবক্স, মি. আবেদীন এবং মিস জোবায়দা পর পর বসেছেন।

চা-নাস্তার পর্ব সবে মাত্র শেষ হয়েছে। হোটেল থেকেই খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পরিবেশন করেছে বেয়ারারা। কিছুক্ষণ আগে টেবিল পরিষ্কার করে ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেছে তারা। খোশ গল্পে মগ্ন এখন অতিথিরা। ব্যতিক্রম শুধু মিসেস ওসেনা শাহবাজী।

এমন সময় হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় শহীদ. সকলের উদ্দেশে বলে, 'আমরা উপস্থিত অতিথিবৃন্দ, সকলেই জানি, ড. সুফিয়ানের একমাত্র সন্তান টুটুলকে ফিরে পাওয়া উপলক্ষে আজকের এ আনন্দোৎসবের আয়োজন। কিন্তু এর চেয়েও বড় এবং চমকপ্রদ আরও একটা কারণ আছে। সেটা আপনাদের সমীপে প্রকাশ করার অনুমতি পেলে বাধিত হবো। অবশ্যি মনে মনে আমার আশঙ্কা আছে, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সে অনুমতি দিতে কণামাত্র আগ্রহী নন। কিন্তু, আপনারা কেউ অনুমতি দিন বা না দিন, আজকের এই অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় কারণটা যেটা চমকপ্রদ, এই মুহূর্তে আমি সেটির উল্লেখ না করে পারছি না। কারণটা হলো মিস সুফিয়ার আসল হত্যাকারীকে সনাক্তকরণ।'

উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে একটা অস্বস্তির ঢেউ বয়ে যায়। শহীদের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মিসেস রসুলবক্স ভ্রূ কুঁচকে বলে ওঠেন, 'আপনি আমাকে সে কথা বলে তো নিমন্ত্রণ করেননি, মি. শহীদ।'

শহীদ শান্ত কণ্ঠে বলে, 'স্পষ্ট করে বলিনি বটে, তবে জানিয়েছিলাম বিশেষ একটা ব্যাপার আছে এই আয়োজনের মধ্যে।'

'তা বলেছিলেন। কিন্তু…'

হঠাৎ ব্যঙ্গভরে বলে ওঠেন মি. আবেদীন, 'মিস সুফিয়ার হত্যাকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিস, সে খবর দেখছি জানা নেই মি. শহীদের।'

'মিস সুফিয়াকে সাবির চৌধুরী খুন করেনি।' দৃঢ় কণ্ঠস্বর শোনা যায় মিসেস শাহবাজীর, 'ভুল বুঝে পুলিস গ্রেফতার করেছে তাকে।'

'তাই নাকি? তবে সুফিয়াকে বুঝি আপনি হত্যা করেছেন?' মিস জোবায়দা মিসেস শাহবাজীর দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণস্বরে প্রশ্নটা ছুঁড়ে মারেন।

আচমকা এই প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারেন না মিসেস শাহবাজী। তারপর মৃদুস্বরে বলেন, 'আর যেই করুক, সাবির চৌধুরী মিস সুফিয়াকে হত্যা করেনি—করতে পারে না!'

'আমাকে বলতে দিন,' শহীদ সকলকে থামিয়ে দিয়ে বলে। 'দৃশ্যতঃ ব্যাপারটা কিন্তু সে রকমই সন্দেহ হয়। মি. সাবির চৌধুরীকে পুলিস গ্রেফতার করেছে, তাদের দৃষ্টিতে, উপযুক্ত কারণেই। তবে সৌভাগ্যক্রমে তথাকথিত উপযুক্ত কারণগুলো আমার দৃষ্টিতে অনুপযুক্ত প্রমাণিত হয়েছে। মিস সুফিয়ার হত্যাকারী মি. সাবির চৌধুরী নয়, এ

কথা প্রমাণ করার দায়িত্ব আমার। তবে প্রথম দায়িত্ব হলো মিস সুফিয়ার হত্যাকারীর সনাক্তকরণ। বলা যেতে পারে সে ব্যাপারে আমি সফল হতে পেরেছি।'

কথা ক'টি বলে এক মুহূর্তের জন্য দম নেয় শহীদ। তারপর নিজের নীরবতা ভঙ্গ করে সকলকে আশঙ্কাতীতভাবে চমকে দিয়ে বলে ওঠে, 'মিস সুফিয়ার হত্যাকারী মিস জোবায়দা, ওরফে মিসেস জোবায়দা, বা মিসেস আবেদীন।'

ঘরের ভিতর জীবন্ত বাঘের বজ্রনির্ঘোষ শুনলেও এমন চমকে উঠতো না কেউ। মুহূর্তের মধ্যে ফ্যাকাসে হয়ে যায় মিসেস জোবায়দার মুখ। পলকের জন্য একবার তাকান তিনি মি. আবেদীনের দিকে। নির্বিকার মুখ করে বসে আছেন মি. আবেদীন শহীদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে। মিসেস রসুল বক্স উত্তেজিত কণ্ঠে শহীদের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে উঠেন, 'কী সব বলছেন আপনি! মিস জোবায়দাকে মিসেস আবেদীন বলার অর্থ কী?'

'আজ থেকে বছর খানেক আগে মি. আবেদীন আপনাদেরকে লুকিয়ে মিসেস জোবায়দাকে বিয়ে করেছেন। খবরটা আর কেউ জানুক বা না জানুক, আমি জানি আর এখানে উপস্থিত একজন মহিলা জানেন। তিনি আপনার পাশেই বসে আছেন। উনি সাবির চৌধুরীর বিবাহিতা স্ত্রী, মিসেস শাহবাজী। মি. আবেদীন ও মিসেস জোবায়দার বিয়েতে উনি এবং ওনার স্বামী সাক্ষী ছিলেন। তাই না মি. আবেদীন?'

হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে শহীদের প্রতি খেঁকিয়ে ওঠেন মি. আবেদীন, 'তাতে কি হলো! বিয়ে করেছে বলেই খুনী হয়ে গেল জোবায়দা!'

মৃদু হেসে শহীদ বলে, 'তাতো হলো বৈ কি, মি. আবেদীন। আপনার সঙ্গে বিয়ে না হলে আর মিসেস জোবায়দাকে দিয়ে আপনি মিস সুফিয়াকে হত্যা করাতে পারতেন?'

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন মি. আবেদীন শহীদের কথা শুনে। তারপর হঠাৎ বলে ওঠেন, 'আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

'আরে না সাহেব, শহীদ খানের মাথা অতো সহজে খারাপ হতে পারে না।' কথাটা বলে তীব্র দৃষ্টিতে মি. আবেদীনকে আপাদমস্তক দেখে নেয় শহীদ। তারপর বলে, 'আমাকে সবিস্তারে ঘটনাটা বলতে দিন। ড. সুফিয়ানের ল্যাবরেটরিতে যে যুবতীর মৃতদেহটি আবিষ্কৃত হয় সেটি মিস সুফিয়ার মৃতদেহ ছিলো না।'

শহীদের কথা শেষ হবার পর পরই সারা ঘরময় আবার একটা উত্তেজনার হল্‌কা বয়ে যায়।

'মানে?' মিসেস রসুল বক্স চিৎকার করে ওঠেন।

'কিছুই বোঝা যাচ্ছে না!' বলে উঠেন মিসেস খোদাবক্স।

'বাধা দেবেন না দয়া করে।' সকলের উদ্দেশেই কথাটা বলে আবার শুরু করে শহীদ, 'মৃতদেহটি যে মিস সুফিয়ার নয় তা আমি দেখার সঙ্গে সঙ্গে ধরতে না পারলেও একটা ব্যাপারে আমার দৃষ্টি পড়েছিল। মৃতা যুবতীর মাথার চুল দেখে বুঝতে

পেরেছিলাম আমি যে, চুলগুলো ছিলো তার সুদীর্ঘ, বব-ছাঁট নয়। কিন্তু যে কোনো উদ্দেশ্যেই হোক, হঠাৎ আনাড়ী হাতে দীর্ঘ চুল ছেঁটে বব-ছাঁটের মতো করার চেষ্টা করা হয়েছে বলে ধারণা জন্মায় আমার। এরপরই যখন জানতে পারলাম যে মিস সুফিয়ার চুল অনেক দিন থেকেই বব-ছাঁট করা ছিলো, তখনই স্থির বিশ্বাসে পৌঁছলাম ল্যাবরেটরিতে আবিষ্কৃত মৃতদেহটি মিস সুফিয়ার নয়। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে একটা অনুমানভিত্তিক আশঙ্কা জাগে। আরও একটা যুবতীর অকাল মৃত্যু ঘটবে বলে আশঙ্কা হয় আমার। যাই হোক, ল্যাবরেটরিতে আবিষ্কৃত মৃতদেহটি মিস সুফিয়ার নয় এ কথা জানার পর মিসেস জোবায়দার উপর আমার সন্দিহান দৃষ্টি পড়ে। মিস সুফিয়ার না হওয়া সত্ত্বেও ল্যাবরেটরিতে আবিষ্কৃত মৃতদেহটিকে মিস সুফিয়া বলে সনাক্তকরণের অর্থ কি? মিসেস জোবায়দাই একমাত্র লাশ সনাক্ত করেছিলেন। তিনি জানতেন, মিস সুফিয়ার মৃতদেহ সেটি নয়। কিন্তু তবু তিনি পুলিসকে বললেন, সেটি মিস সুফিয়ারই মৃতদেহ। ড. সুফিয়ানের ল্যাবরেটরিতে লাশ পাওয়া গেছে শুনে চমকে উঠেছিলেন মিসেস জোবায়দা। কেন? কেননা তিনি ভালো করেই জানতেন লাশটা কোথায় আবিষ্কৃত হওয়া উচিত ছিলো। মি. সাবির চৌধুরীর বাড়িতে লাশটা আবিষ্কৃত হওয়ার কথা ছিলো তাদের পরিকল্পনানুযায়ী। প্ল্যান অনুযায়ী কাজেও তাদের ভুল হয়নি। গোলমাল বেধেছিল অন্যত্র। যাই হোক, সেদিন সকালেই খবর পাওয়া গেল, লিটন রোডে একটা গাড়ির ভেতর অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় পাওয়া গেছে আরও একটা মেয়ের লাশ। এই মেয়েটাই আসলে মিস সুফিয়া। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়ায়, তাহলে ল্যাবরেটরিতে যে লাশটা পাওয়া গেছে সেটা কার? সেটা মিস পাপিয়া নাম্নী একজন নাট্যাভিনেত্রীর। মিস পাপিয়া নিখোঁজ হবার সংবাদ সেদিনকার প্রভাতী কাগজে বের হয়েছিল। অনেকে তা দেখে থাকবেন হয়তো। মিস পাপিয়ার নিরুদ্দেশ সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে আমি জানতে পারি নিখোঁজ হওয়ার পূর্বে তিনি তাঁর এক বান্ধবীকে বলেছিলেন যে, কোনো একটা ছায়াছবির নাম ভূমিকায় অংশগ্রহণের সম্ভাবনা আছে কিনা তা জানার জন্য তিনি জালালাবাদ যাবেন। সেখানে তাঁর স্ক্রীন টেস্ট হবে। এ খবরটা স্বভাবতই মি. সাবির চৌধুরীর উপর সন্দেহ আনে। কেননা জালালাবাদে ইদানীং একটি মাত্র ছায়াছবির শূটিং হচ্ছে এবং তার পরিচালক সাবির চৌধুরী। কিন্তু ব্যাপারটা সম্পূর্ণ কৃত্রিম, ছক কাটা। অপরাধীরা সুপরিকল্পিতভাবে মিস সুফিয়াকে হত্যা করে নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চেয়েছিল।'

ঘরের দমবন্ধ করা আবহাওয়ায় অনড় বসে আছে সকলে যে যার চেয়ারে। এক মুহূর্তের জন্য থেমে শহীদ আবার শুরু করেঃ

'প্রথম থেকেই মিস সুফিয়ার হত্যাকে আমি পনেরো লক্ষ টাকার প্রেক্ষিতে ভেবেছি। মিসেস রসুল বক্স মিস সুফিয়াকে পালিতা কন্যা হিসেবে গ্রহণ করে পনেরো লক্ষ টাকা তার নামে লিখে দেবেন জানার পর আমার সন্দেহ গিয়ে পড়ে মিসেস খোদা-বক্স এবং মিস্টার আবেদীনের উপর। কেননা, মিসেস রসুল বক্স মারা গেলে সব টাকা

স্বভাবতই এঁদের দখলে এসে পড়বে। অথচ তিনি মারা যাবার আগে পনেরো লক্ষ টাকা যদি কোথাকার কে সুফিয়ার হাতে গিয়ে পড়ে তবে তা সহ্য করা যায় কেমন করে? এরপরই হঠাৎ একদিন আমার রুমের পিছনদিকে জানালার কপাটে ক'গাছি চুল দেখে সন্দেহ হয় আমার। সঙ্গে সঙ্গে নিচের এঁদো গলিতে গিয়ে খোঁজ করতেই পেয়ে যাই মেয়েদের এক গোছা চুল। চুলগুলো আসলে মিস পাপিয়ার। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি আমার উপরের ঘরটা মিসেস জোবায়দার।

মিস জোবায়দার ব্যাপারে আমি বোকা বনে যাই সম্পর্কের সামঞ্জস্য খুঁজে না পেয়ে। মিস সুফিয়াকে হত্যা করে মিসেস জোবায়দার লাভ কি? কি তার উদ্দেশ্য? সুস্থ মস্তিষ্কে পরিকল্পিত হত্যা অসম্ভব নিশ্চয়। যদি না কোনো মোটিভ থাকে। কিন্তু মিসেস জোবায়দার কি লাভ মিস সুফিয়াকে হত্যা করে? ধাঁধায় পড়লাম আমি। কিন্তু সব পরিষ্কার হয়ে গেল চোখের সামনে, যখন জানতে পারলাম মিসেস জোবায়দা আসলে মিসেস আবেদীন। মি. আবেদীন এক বছর আগে তাকে বিয়ে করেছেন।

'ডাক্তারের রিপোর্ট অনুয়ায়ী মিস সুফিয়াকে হত্যা করা হয়েছে রাত দশটা থেকে বারোটার মধ্যে। অথচ, রাত এগারোটা কুড়ি মিনিট পর্যন্ত মিস সুফিয়াকে হোটেলের প্রদর্শনী নাচের অনুষ্ঠানে দেখা গেছে। এবং সে সময়ে সকলেই প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তারপর মিস সুফিয়াকে আর খুঁজে পাওয়া না গেলেও অন্য সকলে রাত একটা পর্যন্ত প্রদর্শনী নাচের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মিসেস জোবায়দাও উপস্থিত ছিলেন সেই সময়ে। তা সত্ত্বেও কিভাবে তাকে অভিযুক্ত করা যায়? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে শুরু করতে হবে অন্যভাবে। ব্যাপারটা হলো এই যে, মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের কয়েকদিন আগে মি. আবেদীন ঢাকায় গিয়ে মিস পাপিয়াকে একটি ছায়াছবিতে অংশগ্রহণের লোভ দেখান। জালালাবাদের হোটেল ডি-করোনেশনে তাকে তিনি দেখা করতে বলেন। সেখানে তার স্ক্রীন টেস্ট নেয়া হবে বলে তাকে জানান। মিস পাপিয়া জালালাবাদে কবে পৌঁছান সে কথা জানা যায়নি। তবে নির্দিষ্ট দিনটিতে, অর্থাৎ যেদিন মিস সুফিয়াকে হত্যা করা হয়, সেদিন খুব সম্ভব রাত আটটা সাড়ে আটটার সময় হোটেল ডি-করোনেশনে মি. আবেদীনের সঙ্গে তিনি দেখা করেন। মি. আবেদীনই তাকে সঙ্গে করে মিস জোবায়দার ঘরে নিয়ে যান। তারপর তার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবার ফাঁকে চা বা কফির সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে মিস পাপিয়াকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হয়। এরপর সম্ভবতঃ রাত দশটার সময় গলা টিপে হত্যা করা হয় তাকে। মি. আবেদীন আমাকে জানিয়েছিলেন ডিনার শেষে সেদিন তিনি তাঁর পুরানো অভ্যাস অনুযায়ী গাড়ি নিয়ে সমুদ্রের দিকে ভ্রমণে বের হয়েছিলেন। আসলে সে সময়ে তিনি মিস পাপিয়ার মৃতদেহ হোটেলের পিছনের দরজা দিয়ে গোপনে বের করে গাড়িতে তোলেন এবং মি. সাবির চৌধুরীর অনুপস্থিতিতে তাঁর বাড়ির সামনের একটি ঘরের তালা খুলে মৃতদেহটি খাটের ওপর শুইয়ে রেখে আবার তালা বন্ধ করে হোটেলে ফিরে আসেন। মিস পাপিয়ার সুদীর্ঘ কেশরাজি মিসেস জোবায়দার দৃষ্টি এড়ায়নি, তিনি তাই

চুলগুলো কেটে যেন–তেন প্রকারে বব–ছাঁট করে দেন। কিন্তু আনাড়ী হাতের লক্ষণ দূর হয়নি।

'আমার ধারণা মিস সুফিয়াকে মিসেস জোবায়দা আগে থেকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে তার ঘরে সে যেন অপেক্ষা করে প্রথম প্রদর্শনী নাচের পর। মিস সুফিয়া তাঁর কর্তৃত্বেই চাকরি করতেন হোটেলে। সুতরাং নির্দেশ অমান্য করার প্রশ্ন ওঠে না। মিস পাপিয়ার মতো সুফিয়াকেও বারবিটোন জাতীয় কিছু খাওয়ান হয়েছিল খুব সম্ভব ডিনারের পর কফির সঙ্গে।

'দ্বিতীয় প্রদর্শনী নাচের সময় হয়ে আসায় খোঁজ পড়ে মিস সুফিয়ার। কিন্তু তার ঘরে ফোন করে যখন উত্তর পাওয়া যায় না, তখন মিসেস জোবায়দা নিজে খোঁজ করতে আসেন এবং মিস সুফিয়ার ঘরে না ঢুকে পাশের ঘরে ঢোকেন। পাশের ঘরটি মিসেস জোবায়দার নিজের। মিস সুফিয়া সম্ভবতঃ তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘরে প্রবেশ করে তাঁর মাথায় ভারি কিছু দিয়ে আঘাত করে বা গলা টিপে তাকে হত্যা করেন। তারপর ঘরের ভিতরেই লাশটা লুকিয়ে রেখে প্রদর্শনী–নাচের আসরে গিয়ে বলেন মিস সুফিয়াকে তিনি তার ঘরে দেখতে পাননি। এরপর তিনি নিজেই প্রদর্শনী নাচে অংশগ্রহণ করেন। নাচ শেষ হয়ে যাবার পর ঘরে ফিরে শুয়ে পড়েন তিনি। ঘন্টা তিন–চারেক পর, যখন ভোর হতে আর সামান্য দেরি আছে, তখন মি. শ্রীধরের গাড়ি চুরি করে মিস সুফিয়ার মৃতদেহ নিয়ে লিটন রোড অভিমুখে যাত্রা করেন। লিটন রোডেরই নির্জন একটি জায়গায় গিয়ে পেট্রোল ঢেলে গাড়িটিতে আগুন ধরিয়ে দেন তিনি। গাড়ির ভিতরে অগ্নিদগ্ধ হয়ে যায় মিস সুফিয়ার মৃত শরীরটিও। তাকে সনাক্ত করার কোনো উপায়ই আর থাকে না।

'তবু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, মিস পাপিয়াকে হত্যা করা হলো কেন? মিস পাপিয়াকে হত্যা করার পিছনে দু'টি কারণ রয়েছে—একটি হলো সময় সংক্রান্ত। মি. আবেদীন সুফিয়াকে হত্যা করার সময় অকুস্থলে ছিলেন না—তিনি ওই সময় হোটেলের হল–ঘরে, সর্বজনসমক্ষে অবস্থান করছিলেন। মিসেস জোবায়দা যে সুফিয়াকে হত্যা করতে পারেন, এটা কারও পক্ষেই অনুমান করা সম্ভবপর ছিলো না। অবশ্য মি. আবেদীনের সঙ্গে মিসেস জোবায়দার সম্পর্কের কথা জানবার পর ব্যাপারটি আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। মি. আবেদীন সুফিয়ার হত্যাকারী হিসাবে সাবির চৌধুরীকে সনাক্ত করাতে চেয়েছিলেন। রাত আটটার দিকে সাবির চৌধুরী যে বর্ধমান হাউসে থাকবেন না, এ তথ্যটুকু জানা ছিলো মি. আবেদীনের। মিস পাপিয়ার মৃতদেহটা সে কারণেই তিনি আগেভাগে সাবির চৌধুরীর ঘরে ফেলে রেখে এসেছিলেন। সাবির চৌধুরীকে পুলিসের চোখে দোষী সাব্যস্ত করার পরিকল্পনাটি সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যেই নিরীহ একটা যুবতীকে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হননি মি. আবেদীন। পুলিস কিংবা অন্য কেউ যাতে ঘুণাক্ষরেও তাঁকে মিস পাপিয়ার হত্যাকারী হিসাবে সন্দেহ করতে না পারে সে জন্যেই জোড়া খুনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন মি. আবেদীন। 'কিন্তু আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন.

তিনি শেষ পর্যন্ত সফলকাম হতে পারেননি—তাঁর সব চালাকিই আমরা ফাঁস করে দিতে সক্ষম হয়েছি।'

শহীদের কথা শেষ হতেই মিসেস জোবায়দা হঠাৎ ডুকরে কেঁদে ওঠেন। মি. আবেদীন কিন্তু নিষ্পলক তাকিয়ে থাকেন শহীদের দিকে। মিসেস জোবায়দার কান্নাজড়িত কণ্ঠ হতে স্বীকারোক্তি বের হয় হঠাৎ।

'আমি চাইনি...চাইনি...ওই নরাধমটাই বাধ্য করেছে আমাকে দু'দুটো খুন করতে।'

'খবরদার! বিশ্বাসঘাতিনী!' চিৎকার করে ওঠেন মি. আবেদীন মিসেস জোবায়দাকে লক্ষ্য করে। তারপর পকেট থেকে কি একটা বের করতে চান দ্রুত। তার আগেই শহীদ পকেট থেকে রিভলভার বের করে বলে ওঠে, 'পকেট থেকে হাত বের করে ফেলুন, মি. আবেদীন।'

বাধ্য ছেলের মতো পকেট থেকে শূন্য হাতটি বের করে মি. আবেদীন মিসেস জোবায়দার দিকে আগুনের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

মি. হোজা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। তারপর মিসেস জোবায়দার কাছে গিয়ে তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেন। এরপর মি. আবেদীনের দিকে মি. হোজা এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটলো ঘরের ভিতর। সকলকে অবাক করে দিয়ে রিভলভার হাতে চেয়ার ছেড়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়ান মি. সিম্পসন। রিভলভারের নলটা মি. আবেদীনের বুক লক্ষ্য করে শক্ত হাতে ধরে রেখে তিনি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'এবার আর উপায় নেই তোমার, কুয়াশা! অন্যবারের মতো ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার কথা এবার তুমি ভুলে যাও। তোমার লোক এখানে নেই আজ। অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছি তোমাকে, চিনতে দেরি হয়েছে বটে; কিন্তু ব্যর্থ হইনি। দু'হাত ওপরে তুলে দাঁড়াও কুয়াশা। আজ আমি মরিয়া!'

ঘরের সকলে স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকে। এদিক-ওদিক চায় সবাই, কি ঘটবে না ঘটবে ভেবে। মি. আবেদীন রূপী কুয়াশার মুখে ফুটে ওঠে কৌতুকের হাসি। সে মি. সিম্পসনের উদ্দেশে বলে, 'আমাকে চিনতে পারার জন্যে আপনার প্রশংসা না করে পারছি না। কিন্তু, কি জানেন, কুয়াশা কখনও হাত ওপরে তুলে দাঁড়ায় না।'

এটুকু বলেই ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো কুয়াশা।

'নড়ো না আর একচুলও, গুলি করবো!' কঠিন গলায় হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন মি. সিম্পসন।

তা সত্ত্বেও কুয়াশা উঠে দাঁড়িয়ে নিজের পকেটে হাত ঢোকায়। রিভলভারের ট্রিগার টিপে দেন মি. সিম্পসন কুয়াশার বাহু লক্ষ্য করে। কিন্তু রিভলভার থেকে কোনো গুলি বের না হওয়াতে পরক্ষণেই হতভম্ব হয়ে যান তিনি।

হাঃ হাঃ শব্দে প্রাণ খুলে হেসে ওঠে কুয়াশা। তার হাতের ভিতর ইতিমধ্যে একটা রিভলভার চকচক করছে। হাসি থামিয়ে কুয়াশা বলে, 'আপনাদের কারও রিভলভারেই

গুলি নেই, মি. সিম্পসন। দুষ্কর্মটি অনেক আগেই সারা হয়েছে।'

কথা শেষ করে শহীদের দিকে তাকায় কুয়াশা। তারপর আবার বলে, 'গতরাতের উপকারের জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ, শহীদ। তুমি না থাকলে টুটুলকে কাল ড. সুফিয়ানের হাতে ফিরিয়ে দিতে পারতাম কি না সন্দেহ। ড. সুফিয়ানকে আমি কথা দিয়েছিলাম, টুটুলকে উদ্ধার করে তার কাছে ফিরিয়ে দেবো বলে। সে উদ্দেশ্যেই জালালাবাদে এসেছিলাম। এখানে আসার আগেই আমি জেনে গিয়েছিলাম কল্যাণী অনাথ আশ্রম আসলে ছেলে ধরাদের একটা আস্তানা। সারা দেশে এই ধরনের বহু প্রতিষ্ঠান আছে। এ সবগুলোরই পরিচালক আবেদীন। সেলিম খান তারই সহচর। ঢাকা থেকে একটি জাহাজে করে টুটুল এবং কল্যাণী অনাথ আশ্রমের আরও কয়েকজন ছেলেকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হচ্ছে বলে আমি আমার লোক মারফত খবর পাই। আমি আমার লোকজনকে জাহাজটা যে কোনো উপায়ে দখল করতে বলি। তারা আমার নির্দেশ পালন করে। কিন্তু জাহাজটার ভিতরে আবেদীনের কিছু লোক আত্মগোপন করে থাকে। গতকাল তারাই আমাকে আক্রমণ করেছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য আমরাই জয়ী হই। গতকাল খণ্ডযুদ্ধে আমার লোকজনের হাতে নিহত হয়েছে সেলিম খান। গতকাল রাতেই আবেদীনকে হোটেল থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছি আমি। আমাকে যেতে হবে পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের দুর্গম অঞ্চলে। ওখানকার রাস্তাঘাট আবেদীনই ভালো চেনে। ওকে আমি নিয়ে যাচ্ছি বেগার কলোনীগুলোর ঘাঁটি চেনাবার পথ-প্রদর্শক হিসেবে।'

কথা শেষ করে ধীর পদক্ষেপে ঘর থেকে বের হয়ে যায় কুয়াশা। অবাক হয়ে সকলে দেখে ড্রইংরুম থেকে বাইরের গেটের দিকে না গিয়ে কুয়াশা বাড়ির অন্দরের দিকে হাঁটছে। কুয়াশার পিছন পিছন ড. সুফিয়ানও অগ্রসর হন।

মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায় কুয়াশা এবং ড. সুফিয়ান। কামাল ও মি. সিম্পসন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকে। কি করবে ভেবে পায় না কেউ। মি. সিম্পসন অতিকষ্টে নিজেকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছেন। কিছুই এখন করার নেই তাঁর। সকলের মনেই কিন্তু একটি প্রশ্ন কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে, বাড়ির অন্দরের দিকে কুয়াশা গেল কি জন্য?

এমন সময়ে অপ্রত্যাশিত একটি শব্দ শুনে চমকে ওঠে সকলে। বুঝতে আর কারও কিছু বাকি থাকে না। সকলের অজান্তে কখন কে জানে কুয়াশা তার হেলিকপ্টারটি এনে আর্কিমিডিস লজের ছাদে রেখেছিল। হেলিকপ্টারের স্টার্ট নেবার শব্দ শুনে ব্যাপারটা বুঝতে পারে সবাই।

সঙ্গে সঙ্গে ওরা সবাই ছুটলো বাড়ির ছাদের দিকে।

ছাদে যখন পৌঁছলো সকলে, কুয়াশার হেলিকপ্টার তখন বেশ কিছুটা ওপরে উঠে গেছে।

'কুয়াশার সঙ্গে ড. সুফিয়ান কোথায় যাচ্ছেন?' হেলিকপ্টারটির দিক থেকে দৃষ্টি

ফিরিয়ে মি. সিম্পসন শহীদের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'ওনার সঙ্গে টুটুল এবং আয়েশা বেগমও রয়েছেন দেখছি।'

শহীদ এককথায় উত্তর দেয়, 'ওকে বিজ্ঞান গবেষণায় সাহায্য করতে।'

কুয়াশা—১২

প্রথম প্রকাশ ঃ মে, ১৯৬৮

এক

তীরবেগে ছুটছে ঘোড়াটা। কুয়াশার বিশাল মূর্তি বিরোচিত ভঙ্গিতে অশ্বপৃষ্ঠে আসীন। জনমানবহীন ধূধূ প্রান্তর। রুক্ষ পরিবেশ। ছোটবড় পাহাড় সুবিশাল প্রান্তরের এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কালো পাথরের নুড়ি, এবড়োখেবড়ো পাথুরে জমি, মাঝেমধ্যে লালচে বালির ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে ঘোড়াটা। সুদক্ষ ঘোড়সওয়ার পেয়ে আরবী ঘোড়াটার শক্তি ও সাহস যেন বেড়ে গেছে শতগুণ।

কুয়াশার পরনে প্রাচীন হুর সম্প্রদায়ের সর্দারের পোশাক। মিশমিশে কালো রঙের কাপড়ে তৈরি পোশাকে অদ্ভুতদর্শন একজন হুর সর্দার বলে কুয়াশাকে চিনতে কোনো অসুবিধা হবে না স্থানীয় অধিবাসীদের।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। হঠাৎ ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলো কুয়াশা। তারপর কাঁধে Zeiss Ikon বিনকিউলারটা চোখের সামনে তুলে ধরে তাকালো সামনে। কিছুক্ষণ এইভাবে তাকিয়ে থাকবার পর লাগাম টেনে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দক্ষিণ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো কুয়াশা। তারপর ওটা চোখ থেকে নমিয়ে ব্যাগের মধ্যে ভরে ঘোড়া ছোটালো সেদিক পানেই।

কিছুক্ষণ ঘোড়া ছোটাবার পর একটি সরাইখানার সামনে এসে ঘোড়া থামালো কুয়াশা। তিনজন লোক ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে বেরিয়ে এলো তাঁবুর ভিতর থেকে। এরা স্থানীয় অধিবাসী। তীক্ষ্ণ, অনুসন্ধিৎসু চোখে কুয়াশা তাকালো লোকগুলোর দিকে। কাকে যেন খুঁজলো লোকগুলোর মধ্যে। কিন্তু নিরাশ হলো সে। দেখতে পেলো না কুয়াশা তার বন্দী পথ-প্রদর্শক শয়তান আবেদীনকে।

পাপিয়া-সুফিয়ার হত্যাকারী, ব্ল্যাকমেলার, কিডন্যাপার এবং বিশ্বাসঘাতক আবেদীনকে কুয়াশা ছিনিয়ে এনেছিল মি. সিম্পসন ও শহীদের কবল থেকে। ছিনিয়ে এনেছিল তাকে পথ-প্রদর্শক হিসেবে ব্যবহারের জন্যে। কেননা, বেগার কলোনীর গোপন আস্তানার খবর জানা ছিলো শুধু আবেদীনেরই।

কিন্তু সুযোগ-সন্ধানী আবেদীন পালিয়েছে কুয়াশার কবল থেকে। নির্জন, দুর্গম, প্রায় জনমানবহীন প্রান্তরে কেউ পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পারে না। কাছেপিঠে কোথাও পানি নেই, খাদ্য নেই, বাহন নেই। পালিয়ে যাবে কোথায়? এক্ষেত্রে পালিয়ে যাওয়া মানে আত্মহত্যা করা। কুয়াশা তাই আবেদীনকে মুক্ত করেই রেখেছিল। কিন্তু একদিন সকালবেলা কুয়াশা আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করলো যে আবেদীন তাঁবুতে নেই।

অথচ, দুর্বৃত্তদের ঘাঁটিতে পৌঁছাতে হলে আবেদীনকে তার দরকার। কিন্তু কোথায় সে?

লোক তিনজন অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে কুয়াশাকে দেখছিল। একমুহূর্ত থমকালো কুয়াশা। তারপর নির্ভুল সিন্ধী উচ্চারণে বললো, 'দোস্ত! আমি ক্ষুধার্ত পথিক। মাথা গোঁজবার মতো একটা ঠাঁইও আমার দরকার। আপনাদের সরাইয়ে জায়গা হবে আজ রাতের মতো?'

কুয়াশার কথা শুনে লোকগুলোর মুখে হাসি ফুটে উঠলো। হুর সম্প্রদায়ের লোকেরা সহজে কখনও কারও আশ্রয়প্রার্থী হয় না। হুরেরা খুব দুর্ধর্ষ আর স্বাজাত্যাভিমানী। হুরদেরকে তাই অন্যেরা খুব ভয় করে। লোক তিনজন তাই অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে ছিলো কুয়াশার পানে। আর খুশি হয়ে উঠেছিল হুর সম্প্রদায়ের একজন সর্দার তাঁদের সরাইয়ে আশ্রয়প্রার্থী হয়েছে বলে।

লোক তিনজনের একজন এবার এগিয়ে এলো কুয়াশার পানে। তারপর শ্রদ্ধামিশ্রিত কণ্ঠে বললো, 'আমি এই সরাইখানার মালিক। আপনি এই সরাইখানায় রাত গোজরান করলে ধন্য মনে করবো নিজেকে।'

কুয়াশা গম্ভীর কণ্ঠে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁবুর সামনে ঘোড়াটা বেঁধে ঢুকে পড়লো ভিতরে।

গভীর রাতে দু'দুবার ঘুম ভেঙে গেল কুয়াশার। তাঁবুর সামনে আগুন জ্বালানো হয়েছে। এই আগুন জ্বালানো হয় পাহাড়ী নেকড়ের উৎপাত থেকে সরাইখানাটাকে নিরাপদ রাখবার জন্য। সরাইখানার তাঁবুটার সামনে ছোটো একটা পাহাড়।

পাহাড়টার নিচে সমতল ভূমি। সমতল ভূমি থেকে বেশ কিছুটা উঁচু জায়গাতেই সরাইখানাটা। কিন্তু নেকড়েগুলো ভয়ানক হিংস্র আর দুর্ধর্ষ। রাতের অন্ধকারে প্রায়ই তারা পাহাড়টার ঢালু পথ বেয়ে তাঁবুতে হামলা চালাবার চেষ্টা করে। তাই ওই আগুনের ব্যবস্থা। আগুনকেও যে নেকড়েগুলো খুব ভয় করে তা নয়। আগুন টপকেও নেকড়েগুলো তাঁবুতে হানা দেবার চেষ্টা করে। একটা লোক তাই সারারাত নেকড়ে আসবার রাস্তায় একটি পাথরের উপর বসে পাহারা দেয় রাইফেল হাতে। নেকড়েগুলোকে ঢালু রাস্তাটা বেয়ে আসতে দেখলেই পাহারাদার গুলি ছোঁড়ে। এই গুলির শব্দেই জেগে উঠেছিল কুয়াশা।

দ্বিতীয়বার রাইফেলের শব্দে ঘুম ভাঙার পর আর ঘুম এলো না কুয়াশার। নেকড়েগুলো নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে মহা সোরগোল শুরু করে দিয়েছে।

ঘুমানো সম্ভবপর নয় ভেবে কুয়াশা তাঁবুতে লম্বা চৌকোণা বাতির সলতেটা বাড়িয়ে দিয়ে একটা ম্যাপ বের করলো পকেট থেকে। নিবিষ্টমনে সেটা কিছুক্ষণ দেখবার পর ধীরে ধীরে মুখ তুললো সে। আচমকা তার ভ্রূ জোড়া কুঁচকে উঠলো। চিন্তার জগত থেকে বাস্তব জগতে, এই তাঁবুর পর্দায় একটা বিশেষ আঁকিবুকির উপর তার দৃষ্টি মনোযোগী হয়ে উঠলো। নিষ্পলক তাকিয়ে রইলো কুয়াশা সেদিকে।

তার মন কোনমতেই মানতে চাইছিল না যে, অনুজ্জ্বল আলোয় তাঁবুর পর্দায় খাপছাড়া আঁকিবুকিগুলো, যা সে কিছুটা দূর থেকে অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে, সেগুলো বাংলা ভাষার অক্ষর। এই সুদূর, রুক্ষ, জনমানবহীন, বিপজ্জনক স্থানে বাঙালী আসবে কোথা থেকে? কিন্তু কৌতূহলী না হয়েও পারলো না কুয়াশা। বিছানা ছেড়ে নিঃশব্দে বাতিটা তুলে তাঁবুর পর্দার সামনে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসলো।

বাতিটা পর্দার সামনে নিয়ে গিয়ে আঁকিবুকিগুলো পড়ে চমকে উঠলো কুয়াশা। পরক্ষণেই তার মুখের চেহারা কঠোর হয়ে উঠলো। যে-কোনো মানুষ ওই মুখের চেহারা দেখে চমকে উঠবে, শিউরে উঠবে প্রাণভয়ে।

কুয়াশা দেখলো ছেলেমানুষি কাঁচা হাতে বড় বড় হরফে ছাড়া ছাড়া ভাবে তাঁবুর পর্দায় লেখা রয়েছে বাংলা ভাষায়ঃ আমাকে বাঁচান! আমাকে বাঁচান! ছেলেধরার কবলে পড়েছি আমি! উত্তর-পূর্ব দিক বরাবার আমাকে নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানতে পেরেছি। আজ বোধ হয় মার্চ মাসের দশ তারিখ। বাবুল।

নিবিষ্টচিত্তে আরও একবার লেখাটা পড়লো কুয়াশা। তারপর অস্ফুটে স্বগতোক্তি করলো, 'পেয়েছি এবার! নিশ্চয়ই শয়তানদের আস্তানায় ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বুদ্ধিমান ছোটো ছেলেটাকে। যেমন করেই হোক খুঁজে বের করতে হবে ওদেরকে। ধন্যবাদ তোমায়, ভাই বাবুল। তোমার আবেদন কুয়াশা ব্যর্থ হতে দেবে না।'

আজ বারো তরিখ। মাত্র দু'দিন আগে বাবুল ছিলো এই সরাইখানায়। ইতিমধ্যে ওরা অনেকদূর এগিয়ে গেছে নিশ্চয়ই। কুয়াশা মনে মনে উচ্চারণ করলো, 'যতো দূরেই যাক শয়তানটা, রেহাই পাবে না আমার কবল থেকে।

দ্রুত, নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো কুয়াশা। ঝটপট পোশাক পরে নিলো। সকলের অজান্তে বের হয়ে যেতে হবে এই সরাইখানা থেকে। সরাইখানার লোকদের নিজের উদ্দেশ্য বুঝতে দিতে চায় না কুয়াশা, তাছাড়া রাত শেষ হওয়ার আগে ওরা যাত্রা করতে দেবে না নিশ্চয়ই। অতিথিকে ওরা বিপদ থেকে মুক্ত করার প্রাণপণ চেষ্টা করবে। সুতরাং, সকলের অজান্তেই যাত্রা করা শ্রেয়। তাঁবুর পর্দা সরিয়ে উঁকি মারলো কুয়াশা সন্তর্পণে। চাঁদ রয়েছে এখনও আকাশে। অদূরে সবকিছুই দৃষ্টিগ্রাহ্য। একজন লোক তাঁবু থেকে প্রায় গজ পঞ্চাশেক দূরে উঁচু পাথরে বসে রয়েছে পিছন ফিরে। নেকড়েগুলো চিৎকার করছে সমানে। নিঃশব্দে সতর্ক পদক্ষেপে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ালো কুয়াশা। তারপর ডান দিক ঘেঁষে হাঁটতে লাগলো চুপি চুপি। ঘাড় ঘুরিয়ে কয়েকবার দেখলো পাহারাদারটিকে। নেকড়েগুলোর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে লোকটা। অন্যদিকে খেয়াল দেবার দরকার বোধ না করাই স্বাভাবিক। তিনটে ঘোড়ার সঙ্গে কুয়াশার ঘোড়াটাও দাঁড়িয়ে আছে তাঁবুর সামনে। প্রভুকে দেখে চিঁহিঁ করে ডেকে উঠলো ঘোড়াটা। সঙ্গে সঙ্গে একটা পাথরের আড়ালে বসে পড়লো কুয়াশা। পাহারাদার লোকটা একবার তাকালো পেছন দিকে। তারপর নিশ্চিন্ত মনে আবার নেকড়েগুলোর দিকে চোখ রাখলো। উঠে দাঁড়িয়ে আবার এগোল কুয়াশা। ঘোড়াটার সামনে গিয়ে খুলে

ফেললো দড়ি। কুয়াশা ঘোড়ার জিন এবং একটা বিরাটাকার ব্যাগ তাঁবু থেকে সঙ্গে করে বেরিয়েছিল। জিনটা তখুনি ঘোড়ার পিঠে চাপালো না। লাগাম ধরে আস্তে আস্তে তাঁবুর পিছন দিকে হাঁটতে লাগলো সে। কিছুদূর হাঁটবার পর পাহারাদার লোকটাকে আর দেখা গেল না। সন্তর্পণে ঘোড়াটাকে আরও কিছুটা হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে তার পিঠে জিন চাপালো কুয়াশা। তারপর চেপে বসলো ঘোড়ার পিঠে। মুহূর্তের মধ্যে চন্দ্রালোকিত প্রান্তরে একটা প্রকাণ্ড লাফ দিয়ে ঝড়ের মতো তীব্র গতিতে ছুটতে শুরু করলো ঘোড়াটা।

সরাইখানার কেউ জানতেও পারলো না, তাদের অতিথি অদৃশ্য হয়ে গেল কোন ফাঁকে।

দুর্দমনীয় গতিতে ছুটছে কুয়াশা। সকাল হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। ধু-ধু করছে উন্মুক্ত প্রান্তর। ঘোড়া থামিয়ে বিনকিউলার তুলে কুয়াশা দেখলো কিছুটা দূরে কালো একটা রেখার মতো দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের সারি। অনুমানে বুঝলো, পাহাড়গুলো দশ-পনেরো মাইলের কম দূরে নয়। চারদিকে আর কোনো কিছুর চিহ্ন নেই।

ঘন্টা দুয়েক ঘোড়া চালিয়ে কুয়াশা পাহাড়গুলোর সামনে এসে দাঁড়ালো। পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে সুউচ্চ পাহাড়। অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে ঘোড়া ছোটালো কুয়াশা পাহাড়ের গা ঘেঁষে। অনুমান করে ধরে নিয়েছে সে এই বহুদূর বিস্তৃত পর্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়ে কোনো উপত্যকা নিশ্চয়ই আছে। ঘন্টাখানেক খোঁজাখুঁজির পর সফল হলো কুয়াশা। সত্যিই উপত্যকার মতো একটা পথ চলে গেছে পাহাড়-শ্রেণী ভেদ করে। বিশ্রাম করার কথা মনেও না এনে বেদম গতিতে ছুটিয়ে দিলো কুয়াশা তার বিশ্বস্ত বাহনকে। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব পার হতে হবে এই উপত্যকা। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়া যেতে পারে।

ঘন্টাখানেকের মধ্যেই উপত্যকাটির শেষ সীমায় এসে পৌঁছলো কুয়াশা। সম্মুখে আর পাথুরে জমির চিহ্নমাত্র নেই। যেদিকে দৃষ্টি যায় শুধু বালুঢাকা চরাচর ছাড়া কিছুই আর চোখে পড়ে না। বালি আর বালি। চারদিকে শুধু বালির রাজ্য।

ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় বিনকিউলারটা তুলে দেখে নিলো একবার কুয়াশা। কিছুই নজরে পড়লো না মরুভূমির নির্জনতায়। শান্ত পদক্ষেপে পাহাড়ের উপরে উঠতে শুরু করলো কুয়াশা। বিশ্রাম দরকার তার। তার নিজের চেয়েও বেশি দরকার একমাত্র সঙ্গী ঘোড়াটার। সম্মুখে শুষ্ক মরুভূমিতে সে-ই একমাত্র সঙ্গী, একমাত্র ভরসা, একমাত্র বাহন। তাছাড়া বেচরাকে আজ বহু মাইল পথ অতিক্রম করতে হয়েছে।

সন্ধে পর্যন্ত বিশ্রামের পর আবার যাত্রা শুরু করবে ভেবেছিল কুয়াশা। কিন্তু চাঁদ উঠলো না। চাঁদ উঠলো আরও দু'ঘন্টা পর। চন্দ্রালোকিত মরুভূমিতে বালি চিকচিক করতে লাগলো। ঘোড়াকে সজ্জিত করে আবার চড়ে বসলো কুয়াশা তার পিঠে। তারপর

আবার বেদম গতিতে ছুটে চললো ঘোড়া।

পরদিন ভোরবেলা একটা মরুদ্যান দেখতে পেলো কুয়াশা বিনকিউলারের লারের মধ্যে দিয়ে। আরও মাইলখানেক এগোবার পর মরুদ্যানের ভিতর দুটো তাঁবুও সে দেখতে পেলো। কাছাকাছি পৌঁছতে একটা লোক তাঁবুর পর্দা ফাঁক করে বাইরে এসে দাঁড়ালো। অদ্ভুতদর্শন পোশাক পরনে একজন অনাহূতকে দেখে আতঙ্কে শুকিয়ে গেল লোকটার মুখ।

হঠাৎ কি মনে করে লোকটা সরে দাঁড়িয়ে দ্রুত পা বাড়ালো তাঁবুর দিকে। কিন্তু বাধা দিয়ে কুয়াশা বলে উঠলো, 'দাঁড়াও! তাঁবুর ভিতরে ঢোকবার চেষ্টা করলে গুলি ছুঁড়বো।'

থমকে দাঁড়ালো লোকটা। চোখমুখে উৎকণ্ঠার ছাপ পরিস্ফুট হয়ে উঠলো বেচারার।

'আমার প্রশ্নের উত্তর দাও একটা একটা করে।'

ভয়মিশ্রিত কণ্ঠে লোকটা বললো, 'বলুন, সর্দার!'

কুয়াশা বললো, 'এটা কি একটা সরাইখানা?'

কাঁপতে কাঁপতে লোকটা বললো, 'জি, সর্দার।'

'ক'জন লোক আছে এই তাঁবুতে?'

লোকটা পূর্ববৎ কাঁপতে কাঁপতে বললো, 'মোট তিনজন আমরা এই ব্যবসা চালাই সর্দার। দু'জন গেছে পানির সন্ধানে। এখানকার কুয়োর পানি শুকিয়ে গেছে।'

কুয়াশা জানতে চাইলো, 'কোনো মুসাফির আছে কি এখন সরাইখানায়?'

'জ্বী, না সর্দার। কেউ নেই।'

'গত দু'তিন দিনের মধ্যে কেউ ছিলো কি?'

'জ্বী; সর্দার। গতকাল দু'জন ছিলো।'

উত্তেজিত হয়ে ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নামলো কুয়াশা। তারপর দু'পা এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলো, 'সেই দুজনের মধ্যে একজন ছোটো ছেলে ছিলো, না?'

'জ্বী, সর্দার, ছিলো।'

দ্রুত জিজ্ঞেস করলো কুয়াশা, 'কখন এখান থেকে যাত্রা করেছে তারা? কোন দিক গেছে? রাতে তারা কোন তাঁবুটাতে ছিলো?'

লোকটা কাঁপা আঙুলে একটা তাঁবু দেখিয়ে বললো, 'ওই তাঁবুটাতে গত সন্ধ্যায় তারা ছিলো, সর্দার। আজ ভোরে তারা চলে গেছে আন্দাজ চারটার সময়। তাঁবুর ভিতর ছিলাম আমি।'

কুয়াশা এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললো, 'ঠিক আছে। যে তাঁবুতে লোকটা এবং ছেলেটা ছিলো সেটা আমি একবার দেখবো। তুমিও আমার সঙ্গে এসো। কিন্তু তুমি অমন করে কাঁপছো কেন বলো দেখি!'

প্রশ্ন না করে লোকটা বারবার হুর সম্প্রদায়ের সর্দারের কালো অদ্ভুতদর্শন

পোশাকটা দেখতে লাগলো অসহায় ভীত দৃষ্টি মেলে। কিন্তু কিছু বলতে সাহস পেলো না। বরং আরও বেশি করে কাঁপতে কাঁপতে বললো, 'আসুন সর্দার, আপনাকে তাঁবুটা দেখিয়ে দিই।'

তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করে কুয়াশা তীক্ষ্ণ চোখে চারপাশে তাকালো। একমিনিটও ব্যয় হলো না। পেয়ে গেল কুয়াশা তার প্রার্থিত জিনিসটি। দেখলো, বুদ্ধিমান বাবুল এই তাঁবুর পর্দাতেও লিখে রেখে গেছে, 'ছেলে ধরার কবলে পড়েছি আমি। উত্তর-পূর্ব দিকে যাবো আমরা। আমাকে উদ্ধার করার জন্য কি কেউ নেই পৃথিবীতে? হতভাগ্য বাবুল।'

'আমি আছি ভাই তোমাকে উদ্ধার করতে।'

লেখাটা পড়ে ধীর কণ্ঠে উচ্চারণ করলো কুয়াশা। লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ালো। এবং একটি কথাও না বলে একলাফে চড়ে বসলো ঘোড়ার পিঠে। তারপর লোকটাকে কিছু বোঝবার অবসর না দিয়েই বিদ্যুৎবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল বহুদূর।

লোকটা হতভম্ব হলো বটে। কিন্তু হুরদের খোদ সর্দারের কবল থেকে পরিত্রাণ পেয়ে তার ধড়ে সত্যিকার প্রাণ ফিরে এলো।

দুই

শহীদ, কামাল, মি. সিম্পসন ও দু'জন পুলিস কনেস্টবল করাচী থেকে হায়দারাবাদ পৌঁছলো একখানি যাত্রীবাহী বিমানে। এই অভিযানে অংশগ্রহণের ইচ্ছা মহুয়ারও ছিলো। মহুয়া জেদ করলে শহীদও 'না' বলতে পারতো না। কিন্তু মহুয়ার কোনো উপায় ছিলো না শহীদের কাছে আবদার করার। কারণ, কুয়াশাই এ ব্যাপারে উপদেশ দিয়েছিল।

কুয়াশার ভালো-মন্দ জ্ঞানকে অমান্য করার কথা মহুয়া মনেও স্থান দিতে পারে না।

ব্যাপারটা ঘটেছিল এই রকমঃ

মিস সুফিয়া এবং মিস পাপিয়ার হত্যা রহস্য মীমাংসার পরদিন কুয়াশা লোক মারফত একটা খাম ও একটা বেশ বড় ব্যাগ পাঠিয়েছিল শহীদের বাড়িতে! ব্যাগটায় ছিলো শহীদ ও মহুয়ার জন্য কুয়াশার নিজের আবিষ্কৃত কয়েকটা অদ্ভুত সুন্দর এবং কার্যকরী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি।

কুয়াশা শহীদকে যে সব বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি উপহার দিয়েছিল তার মধ্যে একটা ছিলো পেন্সিল টর্চের মতো দেখতে যন্ত্র। সেটার সুইচ টিপলে অতি উত্তপ্ত নীল আগুনের যে শিখা বের হয়ে আসে তা দিয়ে কঠিন ইস্পাতও গলিয়ে ফেলা সম্ভব। আরও ছিলো একটা সিগারেট পাইপ ও লাইটার। পাইপটা দিয়ে বাড়ির মধ্যে ওয়্যারলেসের কাজ চালানো সম্ভব। লাইটারটা ছিলো আকারে একটু বড়, কিন্তু অদ্ভুত এর ক্ষমতা। কোনো

মানুষকে লক্ষ্য করে এটা দিয়ে কেউ যদি সিগারেট ধরায় তবে সেই মানুষটার ছবি উঠে যাবে এর ভিতরে কৌশলে রাখা ছোট্ট ক্যামেরাটিতে। অর্থাৎ, লাইটারের মুখোশ পরানো থাকলেও এটা ক্যামেরা ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্য, জিনিসটার স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভবপর নয় কারুর পক্ষেই।

কুয়াশা এসব কিছুর সঙ্গে মারাত্মক আরও একটা জিনিস পাঠিয়েছিল। এই জিনিসটা দেখতে অনেকটা হ্যাণ্ড গ্রেনেডের মতো। ছোট্ট, মসৃণ, গোল সাদা বলের মতো দেখতে এই গোলাকার বস্তুটি আসলে একটা ফায়ার বম। এর উপরে সবুজ রঙের সুইচ আছে। মুঠোর মধ্যে বলটা ধরে বুড়ো আঙুলের চাপে সুইচটা টিপে লক্ষ্যস্থলে ছুঁড়ে মেরে আগুন ধরিয়ে দেয়া যায় নিমিষের মধ্যে এটা দিয়ে।

এছাড়া কাগজের খামটায় ছিলো একটা ম্যাপ ও একটা চিঠি। ম্যাপটা ছিলো হায়দারাবাদের পূর্ব দিকস্থ একটি জনমানবহীন রুক্ষ পাহাড়ী এলাকার। মরুভূমি এলাকাও চিহ্নিত করা ছিলো ম্যাপটায়।

চিঠিতে কুয়াশা লিখেছিলঃ

প্রিয় শহীদ,

অপরাধী আবেদীনকে তোমাদের কবল থেকে আমার ছিনিয়ে নিয়ে আসার একমাত্র কারণ হলো একটি জঘন্য, নিষ্ঠুর, অমানবোচিত অপরাধমূলক ব্যবসায়ের চরম সমাপ্তি ঘটানো। অপরাধীদের আড্ডাটা সিন্ধু প্রদেশের একটা বিজন অঞ্চলে। সুরক্ষিত একটা দুর্গের অভ্যন্তরে রয়েছে এদের মূল ঘাঁটি। এ সবই আমি আবেদীনের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি। তবে, এর সত্যাসত্য সম্বন্ধে এখনও নিশ্চিত হতে পারিনি।

বিভিন্ন সূত্র থেকে এদের সম্বন্ধে আমি আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পেরেছি।

নাবালক ছেলেদের ধরে নিয়ে গিয়ে এরা যে শুধু বেগার খাটায় তাই নয়। এইসব ছেলেদের মধ্যে যাদের চোখের কোনো অসুখ নেই তাদের চোখ উপড়ে নিয়ে বিরাট মূল্যের পরিবর্তে বিদেশী প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করে এই ন..ধমরা। চোখ উপড়ে নেয়ার পর অন্ধ ছেলেগুলোকে এরা মেরে ফেলে না। চালান দেয় শহরে, লঞ্চে, হাটে, বাজারে, মেলায়, উরসে। ভিক্ষা করায় এদেরকে দিয়ে। ভিক্ষার পয়সা ছেলেগুলো পায় না একটাও। খাবার এদেরকে কি দেয়া হয় না হয় সে সম্পর্কে কিছু না বলাই ভালো।

আর যে ছেলেগুলোর চোখ খারাপ থাকে বা যারা একটু বয়স্ক হয় তাদেরকে এরা বেগার কলোনীতে চালান দেয়। বেশ কয়েকটা বেগার কলোনীর পরিচালকদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে এদের। দেড় থেকে দু'হাজার টাকার বিনিময়ে ছেলেগুলোকে এরা বিক্রি করে।

বুঝতেই পারছো, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এ ব্যাপারে আমার হস্তক্ষেপ করা

প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। সুতরাং আমি চললাম। তুমিও আগ্রহ বোধ করছো কি? যদি করো তবে আনন্দিত হবো। মহান কর্তব্যে সাড়া দিতে আমাদের মধ্যে কেউই তো পিছিয়ে নেই। পথনির্দেশের জন্য একটা ম্যাপ পাঠালাম! স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়। আন্দাজের উপর নির্ভর করে তৈরি করা হয়েছে ম্যাপটা। স্কেলেরও ভুল থাকা অস্বাভাবিক নয়। ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়, এ কথায় আমি যেমন বিশ্বাস করি তেমন আর কিছুতেই নয়।

যদি তুমি এই অভিযানে আগ্রহী হও তবে মহুয়াকে আমার কথা জানিয়ে বলো যে, আমি তাকে এই দুর্গম স্থানে আসতে নিষেধ করছি।

সামান্য কয়েকটা উপহার পাঠালাম তোমার এবং মহুয়ার জন্য। ওগুলোর কার্যকারিতা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য আলাদা একটা কাগজে লেখা আছে।

ইতি-কুয়াশা

কুয়াশার চিঠি পড়ে আগ্রহী না হয়ে পারেনি শহীদ। প্রথমে ভেবেছিল সে একাই অভিযানে রওনা হবে। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার কথা বিবেচনা করে মি. সিম্পসনকেও গোটা ব্যাপারটা না জানিয়ে পারেনি। সব কথা শুনে মি. সিম্পসনও আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কুয়াশাকে গ্রেফতার করার সর্বপ্রচেষ্টা এ পর্যন্ত ব্যর্থ হলেও কুয়াশাকে ফলো করার দুর্দমনীয় নেশা মি. সিম্পসনের অদ্যাবধি এতটুকুও হ্রাস পায়নি। কুয়াশাকে অনুসরণ করার সুযোগ পাওয়া গেলে তিনি আর কিছুই চান না। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটলো না।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে শহীদ, মি. সিম্পসন ও কামাল আলোচনা করলো ব্যাপারটা নিয়ে। অবশ্যকরণীয় কয়েকটা কাজ সমাধা করবার পর আগামী পরশুদিন ঢাকা থেকে করাচী, সেখান থেকে হায়দারাবাদ রওনা হবে তারা। তার পরের রাস্তা ম্যাপ দেখে খুঁজে বের করে নিতে হবে। গফুর ঢাকাতেই থাকবে বলে স্থির হলো। করাচী পৌঁছে দু'জন পুলিস কর্মচারীকে সঙ্গে নেয়া হবে বলেও মি. সিম্পসন মত প্রকাশ করলেন। দুর্গম অঞ্চলে অতিরিক্ত কিছু লোকজন থাকলে ভালো হয়। পথের সম্পূর্ণ গতি-প্রকৃতিও তো জানা নেই।

হায়দারাবাদ বিমানবন্দরে মি. সিম্পসন এবং গোটা দলটাকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিলেন সেখানকার পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মি. ফারুক জাহাঙ্গীর লোধী স্বয়ং। মি. সিম্পসন আগেই খবর পাঠিয়েছিলেন।

সকাল সাতটায় মোটরে করে যাত্রা করলো শহীদরা। যাত্রা শুরু করার আগে মি. সিম্পসন পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট লোধীর সঙ্গে জরুরী কয়েকটা বিষয়ে কথাবার্তা সেরে নিলেন। মি. সিম্পসন কথা প্রসঙ্গে মি. লোধীকে জানালেন যে কুয়াশাকে গ্রেফতার করার জন্যেই তিনি প্রধানত এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু দুর্বৃত্ত দলের

অস্তিত্ব যদি সত্যিসত্যিই থাকে তাহলে তারও একটা বিহিত তিনি করতে চান। মি. লোধীর কাছ থেকে তিনি একটা ওয়্যারলেস যন্ত্র চেয়ে নিলেন। এটার সাহায্যে তিনি হায়দারাবাদ পুলিসের সদর দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবেন। প্রয়োজনীয় খবর আদান-প্রদান ছাড়াও দরকার পড়লে এই যন্ত্রটার সাহায্যে তিনি পুলিসের সাহায্যও কামনা করতে পারেন। দুর্গম অঞ্চলের অভিযানে অংশগ্রহণ করার জন্যে এমন একটা যন্ত্র যে অতিপ্রয়োজনীয় সে কথা মি. লোধীও স্বীকার করলেন। স্থির হলো, পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য মি. সিম্পসন 'DD-333' এই কোড্ ব্যবহার করবেন।

মোটর একনাগাড়ে বিশ মাইল ছুটে গিয়ে এক জায়গায় থামলো অবশেষে। মোটঘাট নিয়ে একে একে নামলো সবাই। একটা পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হয়েছে ওরা। এখান থেকে হেঁটে যেতে হবে। গাড়ি চলার পথ এ পর্যন্ত এসেই শেষ হয়েছে।

পাহাড় অতিক্রম করে মাইল পাঁচেক পথ সামনে এগোলে উপজাতীয়দের একটা গ্রাম পাওয়া যাবে কুয়াশার ম্যাপে চিত্রিত নির্দেশ অনুযায়ী। তারপর হাঁটার পরিশ্রম আর পোহাতে হবে না। উপজাতীয় সর্দাররা ঘোড়া বেচাকেনা করে। ঘোড়া ছাড়া অন্য কোনো বাহনে এগোন সম্ভবপর নয়। উপজাতীয়দের সীমানা ছাড়িয়ে দিগন্ত বিস্তৃত রুক্ষ ভূমি। তারপর শুরু হবে মরুভূমি। সুতরাং ঘোড়াই দরকার।

পাহাড়টা বেশ উঁচু। পার হতে হতে সূর্য মাথার উপর উঠে এলো। সমতল ভূমিতে পৌঁছবার পর শহীদ চারদিকে তাকাতে তাকাতে বললো, 'খাওয়া দাওয়া সেরে আবার যাত্রা শুরু করা যাবে।'

কামাল বললো, 'কথাটা আমিই বলতে যাচ্ছিলাম।'

হাসতে হাসতে মি. সিম্পসন বললেন, 'এখন যদি আমি হাতের নাগালে কুয়াশাকেও পাই তাহলেও এক ঘন্টা বিশ্রামের বিনিময়ে তাকে আমি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিতে প্রস্তুত আছি।'

'শহীদ!' হঠাৎ ভয়মিশ্রিত কণ্ঠে কামাল শহীদকে ডেকে উঠলো।

কামালের দিকে তাকিয়ে অবাক কণ্ঠে শহীদ বললো, 'কি রে!'

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কামাল বিস্ফারিত চোখে পশ্চাতের পাহাড় চূড়োর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে শহীদ সেদিক পানে তাকিয়ে চঞ্চল হয়ে উঠলো।

একদল ভীষণদর্শন লোককে পাহাড়ের উপর থেকে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে দেখা গেল। তাদের প্রত্যেকের হাতেই রাইফেল। ততক্ষণে মি. সিম্পসনেরও ব্যাপারটা দৃষ্টিগোচর হয়েছে। মি. সিম্পসন কোমরে হাত রেখেছিলেন বেল্ট থেকে রিভলভার বের করার জন্যে। সেদিকে নজর পড়তে শহীদ মি. সিম্পসনকে ইঙ্গিতে নিষেধ করলো। তারপর দ্রুত কণ্ঠে বললো, 'আমার মনে হচ্ছে লোকগুলো উপজাতীয়। ওদের সঙ্গে একটু বুদ্ধিমানের মতো আচরণ করতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন তো সংখ্যায় ওরা ত্রিশজনের কম নয়। যুদ্ধ করে পারবো আমরা? অসম্ভব! তার চেয়ে দেখা যাক, কে ওরা

আর কি-ই বা চায়।'

দু'জন পুলিস কর্মচারীর একজনের দেশ সিন্ধু প্রদেশে। তার নাম সাকী খান। সে বললো, 'উপজাতীয়দের ভাষা কিছু কিছু আমি জানি। প্রশ্ন করলে আমি কোন উত্তর দেবো?'

শহীদ বললো, 'গুড, প্রথমে প্রশ্নগুলো আমাদেরকে শোনাবে। তারপর আমরা বলে দেবো কি উত্তর দিতে হবে, বুঝেছো?'

'জ্বি—স্যার।'

ততক্ষণে একেবারে সামনে এসে পড়েছে লোকগুলো। হিংস্র ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে আরও সামনে। হঠাৎ কয়েকটা লোক বিচিত্র ভাবে ছড়িয়ে গিয়ে শহীদদের গোটা দলটাকে চক্রাকারে ঘিরে ফেললো। চক্রটাকে আরও খানিকটা ছোটো করে দাঁড়িয়ে পড়লো সকলে এক সঙ্গে। নিঃশব্দে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে রইলো লোকগুলো বেশ খানিকক্ষণ। তারপর একজন স্থূলকায় লোক চিৎকার করে কি যেন বললো।

সাকী খান সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করে শহীদকে জানালো, 'ও জিজ্ঞেস করছে, কে তোমরা, কোথায় যাচ্ছো, উদ্দেশ্য কি?'

শহীদ বলতে বললো, 'আমরা ভালো লোক, কারো কোনো ক্ষতি করার উদ্দেশ্য আমাদের নেই। দূরের মিরান নদী ছাড়িয়ে আরও বহুদূরে আমরা যাবো। সেখানে নাকি বিদেশী শত্রুর একটা প্লেন পড়ে গেছে। সেটার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেবার জন্যে সরকার আমাদেরকে পাঠিয়েছে। কোনো রকম বদ মতলব আমাদের নেই। আমাদের পরিচয় আমরা দিলাম, এখন তোমাদের পরিচয় কি বলো।'

প্রত্যুত্তরে ঘোড়সওয়ার লোকটা বললো, 'আমরা কে সে কথা আমাদের সর্দারকে জিজ্ঞেস করো। আর আমাদের কথা তোমরা যা বললে তাও আমাদের সর্দার শুনে ইচ্ছা হয় বিশ্বাস করবেন না হলে করবেন না। সেটা আমাদের বিবেচনার ব্যাপার নয়। এখন তোমাদেরকে যেতে হবে আমাদের সর্দারের কাছে। জোরাজুরি করলে, বুঝতেই পারছো, সবকটাকে লাশ বানিয়ে ছেড়ে দেবো।'

শহীদরা কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করলো ওদের সঙ্গে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তবুও শহীদ জিজ্ঞেস করলো, 'কতদূর যেতে হবে তোমাদের সঙ্গে? কোথায় থাকেন তোমাদের সর্দার?'

ঘোড়সওয়ার উত্তর দিলো, 'আমাদের কাছে তোমাদের সব অস্ত্র সমর্পণ করো। তারপর আমাদের ঘোড়ার পিছনে এসে বসো। দশ মিনিটের মধ্যেই আমাদের সর্দার কোথায় থাকেন জানতে পারবে।'

নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো ওরা এক মুহূর্ত। তারপর শহীদের ইঙ্গিতে সকলে যার যার পিস্তল, ছুরি ইত্যাদি বের করে মাটিতে রাখলো। ঘোড়া থেকে উপজাতীয় তিনজন লোক নেমে এসে সেগুলো তুলে নিলো। তারপর সকলের পকেট ইত্যাদি খোঁজ করে কিছু পাওয়া গেল না দেখে ঘোড়ার পিছনে তুলে নিলো ওদেরকে, জোর কদমে ছুটে

চললো সামনের দিকে।

তিন

মিনিট কুড়ির মধ্যেই উপজাতীয় একটা গ্রামে এসে পৌঁছলো ওরা। গ্রামটাতে শ'খানেক লোক বাস করে। মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা আঙিনার মধ্যে ছোটো ছোটো ঘর। সবকটি ঘরই মাটির তৈরি, শুধু সর্দারেরটা ছাড়া। তার বাড়িটা পাথরের। গ্রামের মধ্যে ঢুকে সকলেই যেন কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। আর যাই হোক, দস্যুটস্যু নয় এরা। উপজাতীয়ই। এরা গম্ভীর, মিতবাক, ওদের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর জানতে চাইলে রেগে যায়। অনাহূত, সন্দেহজনক লোকজনকে দেখলে যাচাই করে নেয় লোকটা বিশ্বস্ত কি না। আর বিরূপ আচরণ ওরা একেবারেই সহ্য করে না।

গ্রামের ভিতরে খানিকটা এগিয়ে ঘোড়সওয়ারেরা দাঁড়ালো একটা পাথরের নিচু এবং ছোটমত বাড়ির সামনে। ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে একজন বিশালকায় চেহারার বৃদ্ধ কিন্তু সতেজ ব্যক্তি বাড়ির ভিতর থেকে বের হয়ে এলো।

শহীদ দেখলো, লোকটা চোখ ছোটছোট করে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। ভাঁজ পড়েছে কপালে। যেন বিরক্ত অথবা ক্রোধান্বিত। ক'মুহূর্ত পরই হুঙ্কার দিয়ে উঠলো লোকটা পশতু ভাষায় 'কে তোমরা? কোথায় যাবে? কি উদ্দেশ্য?'

এবার উত্তর দিলো শহীদ। বিনীত ভাবেই সে বললো, 'আমরা আপনাদের কাছেই আসছিলাম, সর্দার। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর রওনা দেবো ভেবেছিলাম। এমন সময় আপনাদের লোকজন আমাদেরকে ধরে এনেছে। কয়েকটা ঘোড়ার দরকার আমাদের। আমাদেরকে এ ব্যাপারে সাহায্য করলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো। বিদেশী শত্রুর একটা উড়োজাহাজ সম্পর্কে আমরা খবর সংগ্রহ করতে এসেছি। আমাদের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।'

আশাতীত ব্যাপার ঘটলো এবার। বিদেশী শত্রু রাষ্ট্রের উল্লেখে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠলো উপজাতি সর্দার। তারপর থেমে থেমে বললো, 'মানুষের চোখের দিকে তাকিয়েই আমি বলে দিতে পারি সে শত্রু না মিত্র। আমার লোকজন আপনাদেরকে বিশ্রাম এবং আহারের সুযোগ না দিয়ে এখানে জোর-জবরদস্তি করে আসতে বাধ্য করেছে, সেজন্যে আমি মাফ চাইছি আপনাদের কাছে। শত্রুর বিমান ধ্বংস হয়েছে বললেন, সেটা খুবই সুখবর। কিন্তু শত্রুর কি কোনো বদ মতলব আছে বলে মনে করেন আপনারা? আমাদের তাহলে যুদ্ধের জন্যে তৈরি হতে হয়।'

শহীদের মুখে হাসি ফুটে উঠলো এবার। সে বললো, 'না সর্দার, শত্রু আর আমাদেরকে আক্রমণ করতে সাহস পাবে না। তেমন কিছু ঘটলে সরকার আপনাদেরকে সে খবর জানাতে এতটুকুও দেরি করবেন না। আমি যা বলেছি তার চেয়ে বেশি কিছুই ঘটেনি।'

সর্দার শান্ত গলায় বললো, 'যাক, স্বস্তি পেলাম। আসুন, এবার আপ-নাদের আহারের বন্দোবস্ত করি গরীবখানায়। তারপর আমার ঘোড়াশালে গিয়ে ঘোড়া বেছে নেবেন।'

সমারোহ সহকারে আহার পর্ব শেষ হলো। ঘন্টাখানেক পর শহীদ উপজাতি সর্দারকে বললো, 'এবার রওনা হতে চাই আমরা।'

রওনা হবার মুখে হঠাৎ উপজাতি সর্দার শহীদের সামনে এগিয়ে এসে তার দুটি হাত চেপে ধরে উত্তেজিত কণ্ঠে বললো, 'তোমাদেরকে বলবো না বলবো না করেও একটা কথা না বলে থাকতে পারছি না। আমি তোমাদের কর্তব্য-কর্মে বাধা দিতে চাই না। বিশেষ শত্রুর প্রশ্ন জড়িত যেখানে সেখানে বাধা দেয়াটা পাপ বলে মনে করি। কিন্তু, মিরান নদীর ওপারে তোমরা যাবে শুনে আমি তোমাদেরকে কথাটা না বলেও থাকতে পারছি না। মিরান নদীর ওপারে একটা পাহাড় আছে। পাহাড়টার নাম কিংলা। ওই পাহাড়টার ওপারে গিয়ে আমাদের দলের কোনো লোক আজ পর্যন্ত ফিরে আসতে পারেনি। ব্যাপারটা কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেয়া ঠিক হবে না, বাবা। আমি তোমাদের যাত্রায় বাধা দিতে চাই না। শুধু একটা কথা মনে রেখো আমার--সর্বদা অতি সাবধানে থেকো। জানো তো, কথায় আছে, সাবধানের মার নেই।'

শহীদ সর্দারের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে ধন্যবাদ জানালো। তারপর বললো, সর্দারের কথামত তারা অতিমাত্রায় সাবধানতা অবলম্বন করেই চলবে। সর্দারের উপদেশ অমান্য করবে না।

বিকেল নাগাদ সর্দারের দেয়া ঘোড়া ছুটিয়ে ওরা মাইলকুড়ি পথ অতিক্রম করলো। সামনেই একটা লবণ হ্রদ দেখতে পাওয়া গেল। রাতের মতো তাঁবু খাটাবার বন্দোবস্ত করা হলো এখানেই। তাঁবু খাটানো শেষ করে ঘোড়ার জন্যে ঘাস সংগ্রহ করতে গেল পুলিস কর্মচারী দু'জন। আধঘন্টা পর উত্তেজিত হয়ে ফিরে এলো ওরা।

সাকী খান বললো, 'স্যার, দু'বস্তা ঘাস কেটে নিয়ে আসছিলাম আমরা, এমন সময় দুজন লোক রাইফেল দেখিয়ে এক বস্তা কেড়ে নিয়ে গেল জোর করে।'

শহীদ অবাক কণ্ঠে বললো, 'আজব ব্যাপার তো! লোকগুলো গেল কোথায়?'

সাকী খান বললো, 'তা জানতে দেয়নি ওরা। রাইফেল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের দুজনকে বললো, একবারও পিছন দিকে না তাকিয়ে সোজা চলে যাও তোমাদের আস্তানায়। পিছন ফিরে তাকালেই গুলি করবো।'

'কি রকম চেহারা লোকগুলোর?'

সাকী খানের সঙ্গী জবাব দিলো এবার। সে বললো, 'লোকগুলোকে স্থানীয় অধিবাসী বলে মনে হয় না। দাগী আসামীদের মতোই চেহারা লোকগুলোর।'

কামাল বললো, 'কিছু একটা করা দরকার মনে হচ্ছে।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'অন্যায় কাজ মেনে না নেয়াই উচিত। কিন্তু, কি-ই বা করা যেতে পারে এখন?'

কামাল বললো, 'চলুন, খোঁজ করে দেখি ব্যাটাদের। ধরতে পারলে উচিত শিক্ষা দেয়া যাবে।'

শহীদ ধীর কণ্ঠে বললো, 'লোকগুলো আমাদের মিত্র নয় সে কথা এতক্ষণ তোদের বুঝে ওঠা উচিত ছিলো। হয়তো আমাদের বিশেষ কোনো ক্ষতি করার উদ্দেশ্য ওদের নেই। তবু ভালো লোক হলে ওরা এরকম ব্যবহার করতো না নিশ্চয়ই। সুতরাং, ওদেরকে খুঁজতে গিয়ে ওদের ফাঁদে পা দেবার কোনো দরকার নেই এখন। আমি বলি কি, তার চেয়ে বরং আজ রাতটা যাতে নিরুপদ্রবে কাটাতে পারি সে জন্যে সারারাত তাঁবু পাহারা দেবার বন্দোবস্ত করা যাক। হয়তো কিছুই ঘটবে না আজ রাতে, তবু সাবধান থাকা ভালো।'

রাতে সত্যিই তেমন কিছু ঘটলো না। পরদিন সকালবেলা হ্রদের পাশ ঘেঁষে আবার যাত্রা শুরু হলো ওদের। দুপুর নাগাদ একটা জঙ্গলের পাশে তাঁবু খাটালো ওরা আবার। হ্রদটা এখানেই শেষ হয়েছে। জঙ্গল পেরিয়ে একটা পাহাড়ী নদী পাওয়া যাবে। ওরা স্থির করলো আজ সন্ধ্যার আগেই নদী পেরোবে। দুপুরে খাওয়া সেরে খানিক বিশ্রামের পর সন্ধ্যার মুখে ওরা নদীতীরে এসে পৌছলো।

সন্ধ্যার কালিমা বেশ ঘন হয়ে আসছে দেখেও শহীদ বললো, 'নদীটা আমরা এখুনি পেরোবো।'

মি. সিম্পসন ও কামাল আপত্তি করায় আর কিছু বললো না।

নদীর তীরেই তাঁবু খাটানো হলো। তাঁবুর আশপাশে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হলো হিংস্র জন্তু-জানোয়ার যাতে না ঘেঁষতে পারে সেজন্যে।

সন্ধ্যার পরপরই আকাশে চাঁদ উঠলো সেঁকা রুটির মতো। গল্পগুজব করতে করতে হঠাৎ শহীদ বললো, 'চাঁদের আলোয় তাঁবুর বাইরে গিয়ে প্রকৃতিকে একবার দেখবার লোভ হচ্ছে আমার। চলুন মি. সিম্পসন—ঘুরে আসি।'

মি. সিম্পসন শহীদের এই প্রস্তাবে রাজি হলেন। বললেন, 'আমি কিছুটা ক্লান্তি বোধ করছি, শহীদ। ঘোড়ায় চড়ার অভ্যাস তো নেই।'

'কিন্তু তুমি এখানে কি চাও?' শহীদ হঠাৎ বললো।

শহীদের কথা শুনে অবাক হয়ে তাকালো কামাল। কিন্তু শহীদ কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়েই তাঁবুর পর্দার একটা বিশেষ স্থান লক্ষ্য করে সজোরে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে আঘাত করে বসেছে ততক্ষণে।

'উপ!'

তাঁবুর বাইরে থেকে যন্ত্রণাকাতর একটা আর্তধ্বনি জেগে উঠলো। পরক্ষণেই একটা লোকের ছুটে পালিয়ে যাবার শব্দ শোনা গেল। ইতিমধ্যে শহীদও বের হয়ে গেছে তাঁবু থেকে। মি. সিম্পসন ও কামাল উঠে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু শহীদ ফিরে এলো তখুনি গম্ভীর মুখে।

'কে লোকটা?'

কামালই প্রথম প্রশ্ন করলো।

শহীদ বললো, 'কথা বলতে বলতে হঠাৎ লক্ষ্য করলাম পর্দার ফুটোয় চোখ রেখে একজন তাকিয়ে আছে ভিতরে। বাইরে বের হয়ে ব্যাটাকে ধরা যেতো না। পালিয়ে যেতো তার আগেই। তার চেয়ে নগদ বখশিস দিয়ে বিদায় দেয়াই ভালো মনে হলো।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'কিন্তু, কি দেখছিল লোকটা?'

শহীদ বললো, 'আমাদের অভিযানের উদ্দেশ্যের সঙ্গে এ সব ব্যাপারের যোগাযোগ আছে বলে আমার বিশ্বাস। আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্ভবত ওরা নিঃসন্দেহ নয়। হয়তো তাই খোঁজ-খবর সংগ্রহ করতে এসেছিল।'

'বিপদের কথা! শত্রুপক্ষ আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছে তাহলে।'

মৃদু হেসে শহীদ বললো, 'বিপদের কথা হলেও এতে আমাদের প্রচুর লাভ হবে। কেননা, আমাদের গন্তব্যস্থান সম্পর্কে মোটামুটি আমরা যা জানি তাতে সঠিক পথে অগ্রসর হওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার। শত্রুপক্ষ যতক্ষণ আমাদের অসুবিধার সৃষ্টি করবে ততক্ষণ আমরা ভাববো যে, আমরা সঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছি।'

মি. সিম্পসন শহীদের সব কথা মনোযোগ সহকারে শুনে মাথা নেড়ে বললেন, 'তোমার বুদ্ধির মান চিরকালই উন্নত, শহীদ। আমি তোমার সঙ্গে একমত।'

চার

পরদিন সকালে নদী পার হওয়ার সময় সমস্যা দেখা দিলো একটা। পাহাড়ী নদী ভীষণ খরস্রোতা। এক-মানুষের চেয়ে বেশি গভীর। পানির নিচে উঁচু নিচু পাথর ছড়ানো আছে। ঘোড়াগুলো কোনমতে পার হয়ে যাবে হয়তো। কিন্তু ঘোড়ার পিঠের মালপত্র কিংবা মানুষ পার হওয়ার সময় পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ষোলআনা।

শহীদ কামালকে বললো, 'তুই ঘোড়া নিয়ে নদীটা পার হয়ে যা। যদি দেখা যায় যে তুই ভিজে গেছিস তাহলে মালপত্র পার করার জন্যে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।'

শহীদের আশঙ্কা কিন্তু মিথ্যা প্রমাণিত হলো।

ঘোড়া নিয়ে নদীতে প্রথম নামলো কামাল। এবং নির্বিঘ্নেই পার হয়ে গেল সে। এরপর একে একে মি. সিম্পসন, সাকী খান ও অপর পুলিস কর্মচারী রহমত খানও পার হয়ে গেল।

সবশেষে পার হওয়ার পালা শহীদের। নিরাপদেই পার হচ্ছিলো সে। এমন সময় রাইফেলের গুলির আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়ালো তার ঘোড়াটা। শহীদ হতবুদ্ধির মতো তাকালো কামালের পানে।

'নেমে পড়, শহীদ!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো কামাল।

শহীদ এক মুহূর্ত সময় ব্যয় না করে লাফিয়ে পড়লো নদীতে। তারপর দক্ষ সাঁতারুর মতো পানি কেটে এগোতে লাগলো তীরের পানে।

খরস্রোতা পার্বত্য নদী। বেশিদূর এগোনো যায় না ডুব সাঁতার দিয়ে। এক সময় মাথা তুলে পানির উপরে উঠে এলো শহীদ। সঙ্গে সঙ্গে ওর বাম কানের পাশ দিয়ে 'চুঁইই' শব্দে একটা গুলি ছুটে গেল।

ওদিকে মি. সিম্পসন, কামাল, সাকী খান আর অপর পুলিস কর্মচারিটিও বসে নেই। তারা অপর তীরের একটা পাথরের চাঙের আড়াল লক্ষ্য করে অনবরত গুলিবর্ষণ করে চলেছে। হঠাৎ ওপার থেকে আহত একজন মানুষের যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ ভেসে এলো। তারপর গোলাগুলির আর কোনো শব্দ পাওয়া গেল না।

এদিকে ডুব সাঁতার দিয়ে দিয়ে শহীদ প্রায় তীরের কাছে পৌঁছে গেল। পানির তলা থেকে ভেসে উঠতেই কামাল ও মি. সিম্পসন তাকে সাহায্য করলো তীরে উঠতে।

কামাল বললো, 'তুই বলেই সাঁতরে উঠতে পা সি। আমি হলে ভেসে যেতাম।'

'ভেসে গেলে চলবে কেন?' শহীদ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলো।

মি. সিম্পসন বললেন, 'মিরান নদীর এপারে এসে কোনো মানুষ কখনও নাকি ফিরতে পারেনি। এখন থেকে মাথার পিছনে একজোড়া করে চোখ রাখতে হবে আমাদের।'

সেদিন সন্ধ্যায় ওরা আর একটা দুর্ঘটনার মুখোমুখি হলো। রহমত আর সাকী খান তাঁবু খাটিয়ে কিছুটা দূরে গিয়েছিল পানি আর কাঠ আনতে। কিছুক্ষণ পর রহমত খান ফিরে এলো একা। তার চোখ-মুখে উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগ ফুটে উঠেছে।

শহীদ তাঁবুর ভিতরে বসে ল্যাম্পের আলোয় কুয়াশার দেয়া ম্যাপটা দেখছিল। মি. সিম্পসন আর কামাল অদূরে বসে পুরানো কি একটা বিষয়ে তর্কে মেতে উঠেছিল। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে তাঁবুর ভিতর ঢুকলো রহমত খান।

'কি ব্যাপার রহমত?' শহীদই প্রথম জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি অমন হাঁপাচ্ছো কেন?'

'সর্বনাশ হয়েছে সাহেব!'

'মানে?'

'সাকী খানকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! কাঠ কাটবার জন্যে ও জঙ্গলের ভিতর ঢুকেছিল। আমি পানি ভরা শেষ হতে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও ওকে আসতে না দেখে জঙ্গলের ভেতরে যাই ওর সন্ধানে।'

'তারপর?' প্রশ্নটা করলেন মি. সিম্পসন।

'তারপর জঙ্গলের ভিতর গিয়ে দেখি গাছ কাটার বড়ো ছুরিটা পড়ে আছে এক জায়গায়। কিন্তু চারপাশের কোথাও সাকী খান নেই!'

ভগ্নকণ্ঠে রহমত খান তার কথা শেষ করলো।

রহমত খানের কথা শুনে কঠিন হয়ে উঠলো শহীদের মুখ। তারপর ইঙ্গিতে কামালকে তৈরি হতে বললো সে। মি. সিম্পসন সঙ্গে যেতে চাইলে ইঙ্গিতে মানা

করলো শহীদ। তারপর বললো, 'তাঁবুতে আপনার থাকা দরকার। শয়তানরা কখন কি সুযোগের অপেক্ষায় থাকে কে জানে।'

ঘন্টাদেড়েক পর নিরাশ হয়ে ফিরে এলো শহীদ ও কামাল। ওরা আশা করেছিল হয়তো কোনো তাঁবু-টাবু ওদের চোখে পড়বে। কিন্তু কোথাও তেমন কিছু দেখতে পেলো না ওরা।

শহীদ বললো, 'সাকী খানের কোনো খোঁজ না পাওয়া গেলে যাত্রা আগামীকালের জন্যে বন্ধ রাখতে হবে। দিনের আলোয় তন্ন তন্ন করে না খুঁজে আমরা এক পা'ও এগোবো না।'

সাকী খানের জন্য সকলের মনেই একটা দুশ্চিন্তা জেগে রইলো সারারাত।

পরদিন সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শহীদ ও কামাল বেরিয়ে পড়লো সাকী খানের খোঁজে। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো ওদের। দুপুরের পর ঘর্মাক্ত কলেবরে ফিরে এলো ওরা তাঁবুতে।

তাঁবুতে ফিরে ওরা পরস্পরের সঙ্গে কোনো বাক্য বিনিময় করলো না। গোটা তাঁবুটায় নেমে এলো একটা থমথমে ভাব।

সেদিন বিকেলের দিকে যাত্রা করে সান্ধ্যার পর আহারের জন্যে ওরা এক জায়গায় থামলো।

শহীদ বললো, 'আমরা যে গতিতে এগোচ্ছি তাতে এ অভিযানের কোনো সার্থকতাই আশা করতে পারি না। এখন থেকে রাত্রিবেলাতেও এগোতে হবে। চাঁদের আলো আছে, সুতরাং কোনো অসুবিধা হবে না।'

মি. সিম্পসনও শহীদের কথায় সায় দিলেন।

খাওয়া-দাওয়া এবং বিশ্রামের পর রাত ন'টার সময় আবার ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা শুরু করলো ওরা।

কিছুদূর যেতেই চন্দ্রালোকিত উন্মুক্ত প্রান্তরের এক জায়গায় দুটো তাঁবু দেখতে পেলো ওরা দূর থেকে। সতর্ক হলো শহীদ তাঁবু দুটো দেখে। ঘোড়া থামিয়ে মোটঘাটের ভিতর থেকে একটা হালকা সাব-মেশিনগান বের করে নিজের কাছে রাখলো। যার যার রাইফেল এবং রিভলভার ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখলো সকলে। শহীদ সাবধান করে দিলো অকারণে কেউ যেন গুলি না ছোঁড়ে। সকলের উদ্দেশ্যে বললো সে, 'কিছু না বললে আমরাও কিছু বলবো না ওদেরকে। ওদের তাঁবুর কাছ দিয়েই যাবো আমরা।'

একসার হয়ে ছুটলো ওরা। ওদের শব্দ পেয়েও কেউ বের হলো না তাঁবু থেকে। কামাল বললো, 'বেশ নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ছে বলে, মনে হচ্ছে লোকগুলো। এরকম বিপদজনক জায়গাতেও এতো নিশ্চিন্ত থাকলো কি করে এরা?'

কামালের কথার প্রত্যুত্তর দিলো না কেউ। কেউই জানতে পারলো না পাথরের আড়াল থেকে কয়েকজন লোক ওদের দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

তাঁবু দুটো ছাড়িয়ে খুব বেশিদূর যায়নি ওরা। শ'খানেক গজ হবে হয়তো

এগিয়েছে। এমন সময় চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকালো গোটা দলটা। একদল পাহাড়ী নেকড়ের হিংস্র ডাক শুনে চঞ্চল হয়ে উঠলো ঘোড়াগুলো। চাঁদের আলোয় সকলে দেখলো দশ–এগারোটা নেকড়ে দুর্দান্ত বেগে ছুটে আসছে ওদের দিকে।

'পিছু ছাড়বে না ওরা! সুযোগ মতো প্রথম গুলি করবো আমি, তারপর আর সকলে।'

কথাটা সকলের উদ্দেশে বলে পিছনে চলে এলো শহীদ। তারপরই তার হাতের মেশিনগানটি গর্জে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে আর সকলের রাইফেলও চারদিকের নিঃস্তব্ধতাকে ভেঙেচুরে খান খান করে দিলো। প্রথম চোটেই সাতটা নেকড়ের দফারফা হয়ে গেল। বাকি তিনটার একটা মি. সিম্পসনকে লক্ষ্য করে লাফ দিতে কামাল সেটাকে শূন্যেই গুলি করে ভূপাতিত করলো। অন্য দুটো শহীদের মেশিনগানের গুলিতে আহত হয়ে প্রাণ নিয়ে ছুটে পালালো। ঘোড়াগুলো প্রাণভয়ে ছুটছিল এতক্ষণ ধরে। নেকড়েগুলোর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে শান্ত হয়ে পড়লো জানোয়ারগুলো। শহীদের নির্দেশে ঘোড়া দাঁড় করালো সকলে। শহীদ কি মনে করে বললো, 'নেকড়েগুলো ছিলো পোষা এবং আমাদেরকে ভোজ হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে লেলিয়ে দেয়া।'

'বলিস কি শহীদ! কিভাবে বুঝলি তুই বলতো।'

কামালের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে শহীদ বললো, 'দাঁড়া এখানে, এখুনি আসছি আমি।'

কেউ বাধা দেবার আগেই ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল শহীদ।

মিনিট তিনেক পর ফিরে এলো সে।

'এই দেখ, সত্যি কিনা।' কুকুরের গলার বকলেসের মতো একটা বকলেস বাড়িয়ে ধরে কামালের উদ্দেশে শহীদ বলে উঠলো।

বকলেসটা হাতে নিয়ে দেখে কামাল বলে উঠলো, 'আশ্চর্য তো!'

মি. সিম্পসন কামালের হাত থেকে জিনিসটা নিয়ে দেখতে দেখতে শহীদের উদ্দেশে বললেন, 'তোমার দৃষ্টিশক্তির প্রশংসা করতে হয়, শহীদ। আমরা তো দেখতেই পাইনি চাঁদের আলোয় জিনিসটা। কিন্তু, কি করা যায় এখন, শহীদ? নেকড়েগুলোকে নিশ্চয়ই ঐ তাঁবু দুটো থেকে ছাড়া হয়েছিল। আমরা কি এখন ওদের কাছে গিয়ে এর জন্য জবাবদিহি চাইবো?'

ঘোড়া ছুটিয়ে দেবার আগে শহীদ চিন্তিত কণ্ঠে বললো, 'সে সময় এখনও আসেনি বলে আমি মনে করি, মি. সিম্পসন। তবে এখন থেকে যে কোনো মুহূর্তে সে সময় আসতে পারে।'

পাঁচ

ঝাড়া তিন ঘন্টা বিদ্যুৎগতিতে ছুটছে কুয়াশা। মাথার উপর জ্বলন্ত সূর্য। কোনদিকে তবু

ভ্রূক্ষেপ নেই তার। শুধু মাঝে মাঝে ঘোড়া থামিয়ে বিনকিউলারটা চোখের সামনে তুলে ধরে বহুদূর অবধি জরিপ করে নিচ্ছে সে। একবার চোখ থেকে বিনকিউলারটা সরিয়ে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে উত্তেজনাবশতঃ কষে এক চাপড় মারলো কুয়াশা। ঘোড়াটা আরও জোরে, যেন ঝড়ের মতো উড়ে চললো। দূরবীন চোখে লাগিয়ে আবার সামনে তাকালো কুয়াশা।

চোখমুখ তার সাফল্যের আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দেখতে পেয়েছে সে একজন ঘোড়সওয়ারকে। আর ঘোড়সওয়ারের পিছনে একটি ছোটো ছেলেও তার দৃষ্টি এড়ায়নি।

মিনিট তিনেক পর সম্মুখবর্তী ঘোড়সওয়ারটি পিছন ফিরে তাকালো শব্দ শুনে। একজন অপরিচিত ঘোড়সওয়ারকে তার দিকে বিদ্যুৎবেগে ছুটে আসতে দেখে চমকে উঠলো লোকটা। শিউরে উঠলো অজানা আশঙ্কায়। তারপর সর্বশক্তি দিয়ে ঘোড়ার পিঠে উপর্যুপরি গোটাকয়েক চাবুক কষে গতি বাড়িয়ে দিলো।

কুয়াশাও লক্ষ্য করলো ব্যাপারটা। মৃদু একটা হাসি ফুটে উঠলো তার ঠোঁটে। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলো অস্ফুটে, 'পালাবি ভেবেছিস!'

ক্রমশই কমে আসতে লাগলো কুয়াশা এবং ঘোড়সওয়ারের মধ্যবর্তী ব্যবধানটুকু। ইতিমধ্যে কুয়াশা তার রাইফেলটা বাগিয়ে ধরেছে। আরও কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ কুয়াশা পশতু ভাষায় চিৎকার করে উঠলো, 'থামো!'

থামলো না ঘোড়সওয়ার। উল্টে বারংবার ঘোড়ার পিঠে চাবুক হেনে ঘোড়ার গতি বাড়াতে তৎপর হয়ে উঠলো। কুয়াশা আবার চিৎকার করে উঠলো, 'ভালো চাও তো থামো—নইলে গুলি করবো।'

বৃথাই গেল কুয়াশার আদেশ। ঘোড়সওয়ারটি ঘোড়া থামাবার কোনো চেষ্টাই করলো না।

ঘোড়সওয়ারের পিছনে বাবুল রয়েছে। এলোপাতাড়ি গুলি চালালে যে কোনো ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে যেতে কতক্ষণ। একটা মাত্র গুলি চালালো কুয়াশা ঘোড়সওয়ারের পাগড়ি লক্ষ্য করে। গুলি লেগে উড়ে গেল পাগড়িটা মাথা থেকে। মুহূর্তের জন্যে চমকে উঠলো ঘোড়সওয়ার, তারপর আবার ছুটতে লাগলো যেমন ছুটছিল।

এবার ঘোড়ার পা লক্ষ্য করে গুলি চালালো কুয়াশা। অব্যর্থ লক্ষ্য। ঘোড়ার হাঁটুতে প্রবেশ করলো গুলি। সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ঘোড়াটা। কুয়াশা দেখলো, ঘোড়সওয়ার ও বাবুলও ছিটকে পড়ে গেছে বালুতে।

অকুস্থলে কুয়াশা পৌঁছবার আগেই উঠে বসলো লোকটা। কিন্তু রাইফেল বাগিয়ে ফায়ার করার আগেই কুয়াশা হাজির। গুলি করার সুযোগ না দিয়েই লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো কুয়াশা। তারপর প্রচণ্ড কয়েকটা ঘুসির আঘাতে ওকে অজ্ঞান করে উঠে দাঁড়াল।

'তোমার নাম বাবুল?' কুয়াশা জিজ্ঞেস করলো।

অদ্ভুতদর্শন কালো পোশাক পরিহিত, বীরোচিত দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী একজন অসমসাহসী পুরুষকে এই জনমানবহীন মরুভূমিতে শুদ্ধ বাংলা ভাষায় কথা বলতে দেখে বাবুল নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলো না। অবাক দৃষ্টিতে দেখতে থাকলো সে কুয়াশাকে। তারপর সম্বিত ফিরে পেয়ে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'কে আপনি?'

'আমার পরিচয় পরে জানতে পারবে, ভাই। আমি তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি।'

'কি ভাবে খবর পেলেন আপনি? সরাইখানার তাঁবুতে আমার লেখা দেখে বুঝি?'

'হ্যাঁ, ভাই—তাই। বিপদে পড়েও তোমার বুদ্ধি খাটানোর মেধা দেখে আমি চমৎকৃত হয়েছি। এখন বলো দেখি, কি ভাবে তুমি এই শয়তানদের কবলে পড়লে?'

বাবুল কুয়াশার মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করলো, 'ছেলে ধরারা আমাকে ধরবার জন্যে ফাঁদ পেতেছিল তা ঠিক--কিন্তু ওরা আমাকে ধরতে পারেনি, আমিই ওদের হাতে ধরা দিয়েছি।'

'কেন বলতো?' কুয়াশা বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

সেই মুহূর্তে বাবুল কোনো উত্তর দিলো না। কি যেন একটা ব্যাপারে চিন্তিত সে। কতোই বা বয়স হবে ছেলেটার। খুব বেশি হলে বারো। মুখ রোদে পুড়ে কালসিটে মেরে গেছে। চোখ দুটো গর্তে ঢুকে গেছে দুশ্চিন্তায় অনাহারে, পরিশ্রমে।

হঠাৎ বাবুল বলতে শুরু করলো, 'আমি আর আমার একটা ছোটো ভাই ঢাকার একটা হাই স্কুলে পড়তাম। আমার আব্বা নেই, আম্মা আছেন। আমার ভাইয়ের নাম শাকিল। শাকিল আমার চেয়ে দু'বছরের ছোটো। একদিন স্কুলে যাওয়ার পথে শাকিলকে একটা লোক খেলনা পিস্তল কিনে দেয়, আর একদিন লোকটা শাকিলকে দুটো পাখি কিনে দেয় রাস্তার একটা দোকান থেকে। আম্মা আর আমি শাকিলকে বকা-ঝকা করি অপরিচিত লোকের কিনে দেয়া খেলনা, পিস্তল আর পাখি নেয়ার জন্যে। শাকিল বলে যে, লোকটা খুব ভালো। তাকে খুব ভালবাসে। আমি শাকিলকে তখন বলি লোকটার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে। শাকিল লোকটার সঙ্গে আমার পরিচয়ও করিয়ে দেয়। লোকটা সেদিন আমাদের খেলার মাঠে নিয়ে যায়। চিনেবাদাম, ফুচকা খাওয়ায়। তারপর আমরা বাড়ি ফিরে আসি। এই ঘটনার ক'দিন পর স্কুল থেকে ফেরার পথে হারিয়ে যায় শাকিল। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তার আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। সেই লোকটাকেও সেই থেকে আমি আর দেখতে পাইনি। না, ভুল হলো আমার, দেখতে পেয়েছিলাম লোকটাকে আমি আবার। মাস ছয়েক পর। লোকটার সঙ্গে দেখা হতে আমাকে শাকিলের কথা জিজ্ঞেস করলো। আমি তাকে শাকিল যে হারিয়ে গেছে সে কথা বললাম। লোকটা তখন খুব আফসোস করতে লাগলো। বললো, সে দেশে গিয়েছিল—তাই এতদিন শাকিলের খোঁজ-খবর নিতে পারেনি। শাকিলের কথা বলতে বলতে লোকটা আর একটু হলেই কেঁদে ফেলবে এমন মনে হচ্ছিল। আমার কিন্তু

লোকটাকে তখন থেকেই কেমন সন্দেহ হতে আরম্ভ করে। আমি কথা বলতে বলতে লোকটার সঙ্গে হাঁটতে আরম্ভ করি। কিছুটা রাস্তা হাঁটবার পর লোকটা হঠাৎ আমাকে বললো, 'শাকিলকে খুঁজে বের করার জন্যে কি কি করেছো?' আমি বললাম, 'করতে আমরা কিছুই বাকি রাখিনি। থানায় ডায়েরী লেখান থেকে আরম্ভ করে রেডিওতে খবর দেয়া পর্যন্ত সবকিছুই করা হয়েছে। আমি নিজে ভাইয়ের খোঁজে কতো সকাল-দুপুর-বিকেল যে শহরের রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে কাটিয়েছি তার ইয়ত্তা নেই।' লোকটা তখন বললো, 'আমার এক বন্ধু আছে, সে হারানো লোকের খোঁজ বলে দিতে পারে।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'শাকিলকে খুঁজে দিতে পারবে?' লোকটা বললো, 'নিশ্চয়ই পারবে। আমার বন্ধু পারে না এমন কাজ খুব কম আছে।' শাকিলের আবার ফিরে পাওয়া যাবে সেই আনন্দে তখন আমি লোকটা বদমায়েশ হতে পারে এ-কথা একদম ভুলে বসে আছি। লোকটা বললো, 'আমাদেরকে একটা বাড়িতে যেতে হবে সন্ধ্যের পর।' আমি লোকটার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম। তখন লোকটা আমাকে অন্ধকার গলির ভিতর একটা বাড়িতে নিয়ে গেল। সেখানে আমাকে চা খেতে দিলো লোকটার বন্ধু। চা খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই আমি জ্ঞান হারালাম। জ্ঞান ফিরলো যখন তখন আর লোকটাকে দেখতে পেলাম না। জায়গাটাও কেমন অচেনা ঠেকলো...।'

কুয়াশা এতক্ষণ পর বলে উঠলো, 'থাক ভাই, সব কথা শুনতে গিয়ে তোমাকে আর কষ্ট দেবো না। এরপর কি ভাবে তুমি এখানে পৌছেছো তা আমি অনুমান করেই বুঝতে পারছি। তুমি হয়তো জানো না যে, তুমি এখন পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের একটি দুর্গম এলাকায় রয়েছো। আরও বহুদূরে তোমাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। শুধু তোমাকেই নয়, তোমার মতো শতশত ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়ে শয়তানরা বন্দী করে রাখে একটি দুর্গে। সে-সব ছেলেদের মধ্যে কাউকে অন্ধ করে, কারও শরীরে রোগজীবাণু প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়, তারপর তাদেরকে দিয়ে ভিক্ষা করানো হয়। বাবুল, তুমি জিজ্ঞেস করছিলে কে আমি? আমি ওই শয়তানদের যম। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমি প্রতিদিন দিগ্বিদিক ছুটছি।'

হঠাৎ চুপ করলো কুয়াশা। বাবুল কুয়াশার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। শ্রদ্ধাপূর্ণ কণ্ঠে বললো, 'আপনি এখন আমাকে নিয়ে কি করবেন, ভাইয়া?'

কুয়াশা বললো, 'আমি এখন তোমাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাবো।'

'কোথায়?'

'দুর্গের পথ অনুসন্ধান করতে।'

বাবুল বললো, 'তাহলে তো আমাদের বেশ দেরি হয়ে যাবে, ভাইয়া। তার চেয়ে এই লোকটার সঙ্গে যদি যাই তাহলে অনেক তাড়াতাড়ি পৌছতে পারবো। লোকটা নিশ্চয়ই পথ চেনে দুর্গের।'

'সত্যি, খব খাঁটি কথা বলেছো।'

'কিন্তু আমি তো, ভাই, এ ভাবে যেতে পারি না,' কুয়াশা এক মুহূর্ত থেমে আবার বললো, 'আমাকে যে অনেক তোড়জোড় করে যেতে হবে। আমার তো কর্তব্য একটা নয়, হাজারটা। কখন কোন কর্তব্যের ডাকে ছুটতে হয় তার কোনো ঠিক আছে? বরং যদি সাহস না হারাও তবে তুমি যাও এই লোকটার সঙ্গে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি যখন তোমাকে যেতে বলছি তখন তোমার ভালমন্দের সব দায়িত্ব আমারই। যদি তুমি যেতে রাজি থাকো তাহলে কয়েকটা কথা তোমাকে এখুনি বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

বাবুল বললো, 'আপনার কথায় ভরসা করতে আর ভয় কি। আমি যাবো।'

বাবুলের কথা শুনে কুয়াশা পকেট থেকে একটা চ্যাপ্টা দেশলাইয়ের মতো দেখতে যন্ত্র বের করে বাবুলের হাতে দিলো।

'এটা একটা খবর পাঠাবার যন্ত্র,' কুয়াশা বললো, 'আমি যেখানেই থাকি না কেন এটার চাবি টিপে মুখের কাছে ধরে তুমি যখন যা বলবে আমি শুনতে পাবো। আর এই যে বোতামটা ঝুলছে এর মাথায়, এটি কানের কাছে ধরলে আমি যা বলবো তোমাকে তুমি তা ঠিক শুনতে পাবে, বুঝেছো?'

বাবুল মাথা নেড়ে সায় দিলো। তারপর কুয়াশা বাবুলের হাতে প্রয়োজনীয় আরও কয়েকটা জিনিসপত্র দিয়ে বুঝিয়ে দিলো কিভাবে এগুলো ব্যবহার করতে হয় এবং কখন ব্যবহার করবে—ইত্যাদি।

বাবুল বললো, 'সবই তো বুঝলাম। কিন্তু লোকটার যে এখনো জ্ঞান ফিরলো না। আহত ঘোড়াটাও তো আর ছুটতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না।'

কুয়াশা বললো, 'তার জন্যে চিন্তা কি, বলে দিচ্ছি কি করতে হবে। দেখো, আমি কিছুটা দূরে একটা বালিয়াড়ির আড়ালে আমার ঘোড়াটা রেখে আসি। আর খোঁড়া ঘোড়াটিকেও রেখে আসি অন্য আর একটা বালিয়াড়ির আড়ালে। আমি নিজে খানিকটা দূরে বালিতে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে থাকবো মড়ার মতো। তারপর লোকটার জ্ঞান ফিরলে তাকে তুমি বলবে যে, আমি যখন তোমাদের জিনিসপত্র লুঠ করতে ব্যস্ত ছিলাম তখন অনেকগুলো ঘোড়সওয়ার আমাকে মারধর করে আমার সব জিনিস নিয়ে চলে যায়। কিন্তু ঘোড়ার ব্যাপারে অন্য কথা বলবে। যেদিকে আমার ঘোড়াটা আমি রেখে আসবো সেদিকটা দেখিয়ে বলবে ভালো ঘোড়াটা পালিয়ে গেছে দস্যুদের অজান্তে। আর খোঁড়া ঘোড়াটা নিয়ে পালিয়েছে দস্যুরা।'

একমুহূর্তের জন্যে থেমে কুয়াশা আবার বললো, 'এই নাও—এই জিনিসটা লোকটার নাকের কাছে ধরলেই ওর জ্ঞান ফিরে আসবে।'

বাবুল কুয়াশার হাত থেকে শিশিটা নিতে কুয়াশা তার কাঁধে হাত রেখে বললো, 'আমার উপর ভরসা রেখো, ভাই, আমার উপদেশ মতো সব কাজ করো।'

'আপনার প্রতিটি কথা আমার মনে থাকবে, ভাইয়া।' শ্রদ্ধা বিজড়িত কণ্ঠে বললো বাবুল।

ছয়

সেদিন রাত আটটা নাগাদ ঘোড়া ছুটিয়ে প্রায় পনেরো মাইল পথ অতিক্রম করলো শহীদরা। পথে কোনরকম উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটলো না। পরদিন সকাল দশটায় যাত্রা শুরু করে দুপুর নাগাদ আর মাত্র মাইল বিশেক পথ অতিক্রম করতে পারলো ওরা। ভীষণ দুর্গম পথ, উঁচু-নিচু পাথরের বাধা অগ্রাহ্য করে ঘোড়া খুবই মন্থর গতিতে এগোচ্ছিল। মাঝ রাস্তায় একবার থামতেও হলো। মি. সিম্পসন ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছিলেন। অবশ্য খানিকটা ব্র্যাণ্ডি পান করে দ্রুত চাঙ্গা হয়ে উঠেছিলেন তিনি। কিন্তু দুপুরের পর যাত্রা স্থগিত রাখতে হলো। মি. সিম্পসন নতুন একটা বিপদে কাহিল হয়ে পড়েছিলেন। একটা চোখ তাঁর বেশ ফুলে উঠেছে। বিষাক্ত পোকা পড়েছিল চোখে। আই অয়েন্টমেন্ট লাগানো সত্ত্বেও ফোলাটা কমলো না। শহীদ বললো, 'রাতের মধ্যে মি. সিম্পসন সুস্থ হয়ে উঠলে আবার যাত্রা শুরু করা যাবে। আর মাত্র মাইল পাঁচেক পরই আমরা মরুভূমিতে গিয়ে পড়বো। মাঝখানে আর একটা মাত্র পাহাড় আছে।'

সেদিন রাত তিনটের পর থেকে পাহারা দেবার ভার নিয়েছিল শহীদ। তার আগে পাহারা দেবার কথা ছিলো কনস্টেবল রহমত খানের। ঠিক তিনটের সময়ই ঘুম ভাঙলো শহীদের। ঘড়ি দেখে ভ্রূ কুঁচকে উঠলো তার। রহমত খান তাকে জাগিয়ে দেয়নি কেন?

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো শহীদ। বাইরে কাউকে দেখতে না পেয়ে কঠিন হয়ে উঠলো শহীদের মুখ। শহীদ দু'বার ডাকলো রহমত খানের নাম ধরে। কিন্তু কোনদিকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

আশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শহীদ, এমন সময় কামাল বের হয়ে এলো তাঁবুর ভিতর থেকে। শহীদের মুখে ব্যাপারটা শুনে কামাল বললো, 'রাত ঠিক একটার সময় আমি ওকে এখানে বসিয়ে তাঁবুর মধ্যে ফিরে যাই। এর মধ্যে গেল কোথায় লোকটা?'

শহীদ বললো, 'তোর হাতের টর্চটা জ্বাল তো দেখি। হয়তো কোনো ধস্তাধস্তির চিহ্ন পাওয়া যাবে।'

টর্চের আলোয় ধস্তাধস্তির চিহ্ন কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখে পড়লো ওদের। অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠলো শহীদের মুখ। কামালের উদ্দেশে সে বললো, 'আর চুপ করে থাকা যায় না রে। তুই এখানেই দাঁড়া, আমি মি. সিম্পসনকে জাগিয়ে দিয়ে আসি।'

তাঁবুতে ঢুকে মি. সিম্পসনকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তাকে সব কথা বলে নিজের ব্যাগ খুলে দু'একটা জিনিস নিয়ে বের হয়ে এলো শহীদ। তারপর কামালকে সঙ্গে নিয়ে টর্চের আলো ফেলে ফেলে রওনা হলো শত্রুর সন্ধানে। প্রায় আধঘন্টাটাক খোঁজাখুঁজির পর একটা তাঁবু দেখে সন্তর্পণে এগোলো ওরা। পাথরের আড়ালে আড়ালে থেকে তাঁবুটার

একেবারে কাছাকাছি গিয়ে চমকে উঠলো শহীদ। কামালের উদ্দেশ্যে গম্ভীর কণ্ঠে সে বললো, 'শুনলি?'

ফিসফিস কণ্ঠে কামাল বললো, 'রহমত খানকে ওরা মেরে ফেলছে বোধহয়। মৃত্যুযন্ত্রণাতে ছটফট করলেই এমন চিৎকার শুধু মানুষের কণ্ঠ থেকে বের হতে পারে। এখুনি কিছু একটা করা দরকার, শহীদ।'

চাপা গলায় প্রশ্ন করলো শহীদ, 'কোনো পাহারাদার দেখা যাচ্ছে না, না?'

কামাল বললো, 'না।'

পাথরের আড়াল থেকে বের হয়ে নিঃশব্দে এগোতে লাগলো শহীদ। তাঁবুর একেবারে সামনে পৌঁছে রহমত খানের আর্তচিৎকার আর শোনা গেল না। অজানা আশঙ্কায় শক্ত হয়ে উঠলো শহীদের মুখ। তাঁবুর দুটো ফুটো খুঁজে নিয়ে ভিতরে তাকাতে ভয়াবহ নিষ্ঠুর একটা দৃশ্য দেখে আপাদমস্তক শিউরে উঠলো শহীদ ও কামালের। পরক্ষণেই চোখ সরিয়ে নিয়ে ওরা দুজনে দুজনের দিকে নির্বাক তাকিয়ে রইলো। রহমত খানের দুটো চোখে দুটো উত্তপ্ত লাল শিক প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়েছে, দুটো গালের চামড়া ছোরা দিয়ে ফালা ফালা করা হয়েছে, ভীষণ কুৎসিত হয়ে উঠেছে সদ্যমৃত রহমত খানের মুখটা।

'জ্বালিয়ে দেবো!' দাঁতে দাঁত চেপে বললো শহীদ। তার মুখটা ঘৃণায়, যন্ত্রণায়, বিরক্তিতে কিম্ভূতকিমাকার দেখাচ্ছিল।

কথাটা বলে কামালের হাত ধরে তাঁবুটা থেকে কিছুটা দূরে সরে এলো শহীদ। তারপর তাঁবু থেকে নিয়ে আসা গোল বলের মতো একটা জিনিস বের করলো পকেট থেকে। বলটা হাতের তালুতে রেখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কি যেন খুঁজলো ওটার মধ্যে। ক'মুহূর্তের মধ্যেই সুইচটা নজরে পড়লো ওর।

আর দেরি নয়। মুঠোর মধ্যে বলটা ধরে বুড়ো আঙুলের চাপে সুইচটা টিপে ছুঁড়ে মারলো সেটা শত্রুর তাঁবুর উপর।

তাঁবুর উপর গিয়েই পড়লো গোলাকার বস্তুটা। সঙ্গে সঙ্গে, যেন চোখের পলকে, জ্বলে উঠলো তাঁবুটা। ধীরে ধীরে আগুনের বিরাট কুণ্ডলী ঘিরে ধরলো তাঁবুটাকে।

তাঁবুর ভিতরে হুলস্থূল শুরু হয়ে গেছে ততক্ষণে। একটা লোক ছিট্‌কে বেরিয়ে এলো তাঁবুর ভিতর থেকে।

একটু পরে আরও দুজন বেরিয়ে এলো তাঁবুর ভিতর থেকে টলতে টলতে। একজনের মাথার খানিকটা অংশ পুড়ে গেছে, দুহাতে মাথাটা চেপে ধরে আছে সে। আর একজন অন্ধের মতো দুহাত সামনে মেলে ধরে গোঙাচ্ছে উন্মাদের মতো। মনে হয় লোকটার চোখমুখ পুড়ে গেছে।

ইতিমধ্যে ধসে পড়েছে তাঁবুটা। কামাল চাপা কণ্ঠে বললো, 'গুলি করে মারবো নাকি শয়তানগুলোকে?'

শহীদ একটা হাত তুলে বললো, 'খবরদার! পাগলামি করিস না।'

লোকগুলো ইতিমধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়েছে।

ভস্মীভূত তাঁবুটার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে শহীদ ধীরে ধীরে বললো, 'বেচারা রহমত!'

'কিন্তু রহমতকে ওরা খুন করলো কেন?' কামাল যেন কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না এমন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো শহীদের দিকে তাকিয়ে।

'খুব সম্ভব ওরা রহমতের কাছ থেকে আমাদের সম্পর্কে তথ্য জানতে চেয়েছিল। রহমত হয়তো মুখ খোলেনি, তাই এতো অত্যাচার—এমন বীভৎস মৃত্যু!'

'রহমতের তুলনা হয় না,' বললো কামাল।

পরদিন সন্ধ্যার বেশ কিছুক্ষণ আগেই একটা পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌছলো ওরা। পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে শহীদ বিমর্ষ কণ্ঠে বললো, 'সর্বনাশ হয়েছে, মি. সিম্পসন। আমরা পথ ভুল করেছি।'

মি. সিম্পসন বা কামাল, কারো মুখেই কোনো কথা জোগালো না। বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ওরা দুজন শহীদের দিকে।

শহীদ পকেট থেকে কুয়াশার দেয়া ম্যাপটা বের করে গভীর মনোযোগ সহকারে সেটার উপর মিনিট দুয়েক দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আবার সেটা পকেটে রেখে দিলো। তারপর বললো, 'ম্যাপে উল্লেখ না থাকলেও পাহাড় থাকা অসম্ভব নয় হয়তো। কিন্তু এই পাহাড়ের ওপারে কিছুদূরের মধ্যে মরুভূমি না থাকলে ধরে নিতে হবে ভুল পথে চলেছি আমরা। একটা ফুট নোটে কুয়াশা সে কথাই উল্লেখ করেছে।'

এতক্ষণে মি. সিম্পসন বললেন, 'তবে, পাহাড় টপকে ব্যাপারটা দেখে আসতে হবে?'

শহীদ বললো, 'তাছাড়া আর কোনো উপায় নেই। কেননা, উত্তর দিক বরাবর যাচ্ছি আমরা। আনুমানিক গন্তব্যে পৌছবার জন্যে অনেকগুলো দিক আছে। তবু বলা যায় না, আমরা ঠিক পথেই চলেছি কি না।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'সন্ধ্যের আগেই আমরা পাহাড়ের ওপারে পৌছে যাবো। তারপর ওখানেই তাঁবু খাটিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।'

শহীদ বললো, 'হ্যাঁ। আজ রাতের মধ্যেই আমি আর কামাল জেনে নেবো ব্যাপারটা। আপনি তাঁবুতেই থাকবেন।'

সাত

সন্ধ্যা রাতে দুটো ঘোড়ার পিঠে চড়ে বের হয়ে পড়লো শহীদ ও কামাল। ঘন্টাখানেক ঘোড়া ছোটাবার পর উন্মুক্ত মরুভূমির দেখা পাওয়া গেল।

পথের চিহ্নগুলো ভালো করে মনের পর্দায় গেঁথে নেয়ার জন্যে বেশ খানিকক্ষণ ঘুরে

ফিরে দেখে নিলো ওরা চারপাশটা।

ফেরার পথে শহীদ বললো, 'পথ ভুল হয়নি আমাদের। সামনে যে মরুভূমিটা রয়েছে ওটাই শেষ। এর কোনো না কোনো জায়গায় শয়তানদের দুর্গটা আছে।'

ঘোড়া তখনও ছুটতে শুরু করেনি ওদের। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে কাছাকাছি একটা পাথরের চাঙের আড়াল থেকে কাদের যেন রাইফেল গর্জে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে ওদের ঘোড়া দুটো মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে। আচমকা বিপদে পড়ে তাল সামলাতে পারলো না ওরা, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে। দুজনের রাইফেল ছিটকে পড়লো দূরে।

মাটি থেকে উঠে দাঁড়ালো শহীদ প্রথমে, তারপর কামাল। উঠে দাঁড়িয়েই পিস্তলের জন্যে পকেটে হাত ঢোকালো ওরা।

'হ্যাণ্ডস আপ!'

হতবাক হয়ে গেল ওরা। সামনে তাকিয়ে বিশ্বাস করতে পারলো না দৃশ্যটাকে। দুজনেই ধীরে ধীরে পকেট থেকে হাত বের করে মাথার ওপর তুললো।

প্রায় পঁচিশজন ঘোড়সওয়ার যেন মাটি ফুঁড়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকের হাতেই রাইফেল, চাঁদের আলোতে নলগুলো চকচক করছে।

পাঁচজন ঘোড়সওয়ার এগিয়ে এলো ওদের দিকে। ঘোড়া থেকে নেমেই দুজনের পকেট থেকে পিস্তল দুটো বের করে নিলো। কামাল আপত্তি করতে চেয়েছিল, কিন্তু শহীদ পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে ইশারায় নিরস্ত করলো।

লোকগুলো এবার মাটিতে পড়ে থাকা ওদের রাইফেল দুটো তুলে নিয়ে দুজনকেই পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো। এরপর সামনে, পিছনে, ডাইনে, বামে পঁচিশজন ঘোড়সওয়ার ওদেরকে ঘিরে চলতে শুরু করলো।

ঘন্টাখানেক চলার পর লোকগুলো ওদেরকে নিয়ে একটা গুহায় প্রবেশ করলো। গুহাটার দেয়ালে নানান ধরনের অস্ত্রশস্ত্র সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এক কোণে মশাল জ্বলছে। গুহার মেঝেটা সমতল। যার যার বিছানা পাতা।

গুহায় ঢুকে কামাল শহীদের উদ্দেশ্যে মুখ খুলেছিল কিছু বলার জন্যে। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই একটা লোক কামালের পিঠে কষে এক থাপ্পড় মারলো।

'খবরদার!' শহীদ গর্জে উঠলো।

শহীদের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনেও কেউ বিশেষ খেয়াল করলো না তার দিকে। সকলের মাঝখান থেকে কদর্য চেহারার একটা লোক শহীদের সামনে এসে দু'পা ফাঁক করে কোমরে হাত রেখে দাঁড়ালো। তারপর পশ্তু ভাষায় চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, 'আমরা কে সে কথা জানার ইচ্ছা আর একবার প্রকাশ করলে মাথার মগজ বের করে নেবো! তোমরা কে সেটা আমাদের জানা হয়ে গেছে, সুতরাং আর কোনো প্রশ্ন নয়। সৌভাগ্য তোমাদের, তোমাদেরকে সাজা দেবার ভার আমার হাতে নেই; নইলে, কয়েকটা নমুনা দেখাতে পারতাম।'

*

কতো রাত কে জানে। ঘুমিয়ে পড়েছিল শহীদ ও কামাল। হঠাৎ একটা ধাক্কায় ঘুম ভেঙে গেল শহীদের। পরক্ষণেই টের পেলো সে, তার বাঁধন কে যেন মুক্ত করে দিয়েছে। হঠাৎ গুহার মুখের দিকে চোখ ফেলতে শহীদ অবাক হয়ে দেখলো একজন লোক নিঃশব্দে বের হয়ে গেল তার দিকে মাত্র পলকের জন্য তাকিয়ে। গুহার চারদিকে মাথা উঁচু করে পরখ করে নিলো শহীদ। তারপর কামালের হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিতে তৎপর হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই কামাল বন্ধন মুক্ত হলো। ঘুম ভেঙেছিল তার আগেই। দু'জনেই উঠে দাঁড়িয়ে গুহার মুখের দিকে অতি সন্তর্পণে এগোতে লাগলো ঘুমন্ত মানুষগুলোকে পাশ কাটিয়ে।

নির্বিঘ্নেই গুহার বাইরে এসে পৌঁছলো ওরা। বের হয়েই অবাক হলো তারা। কিছুক্ষণ আগে যে লোকটা বের হয়েছিল গুহা থেকে তার কোনো চিহ্ন নেই কোনদিকে। কিন্তু দুজন লোক ঢলে পড়ে রয়েছে গুহার সামনে।

আকাশে চাঁদ নেই। তারার আলোয় পথ চেনা দায় হবে ভেবে দুশ্চিন্তায় দিশেহারার মতো দাঁড়িয়ে রইলো ওরা, কিন্তু সে মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে। তারপরই অন্ধকারে দ্রুত ছুটতে শুরু করলো।

মাত্র কয়েকশ' গজ এগিয়েছে এমন সময় ভয়ানক একটা শোরগোলের আওয়াজ ওদের কানে এলো। জানতে পেরেছে দুর্বৃত্তগুলো যে তাদের শিকার পালিয়েছে।

অন্ধকারে পথ স্পষ্ট নয়। একেবারে ঘুটঘুটে নিকষ কালো অন্ধকার না হলেও যে কোনো মুহূর্তে পাথরে হোঁচট খেয়ে ছিটকে পড়া অসম্ভব নয়। তবু প্রাণপণে ছুটছে দুজন। পিছনে ঘোড়ার খুড়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। বহু লোকের হৈ-হল্লার শব্দও আসছে কানে। কিন্তু তবু অন্ধকারের ভিতর ওৎ পেতে থাকা বিপদকে অগ্রাহ্য করে মরিয়া হয়ে ছুটছে ওরা দুজন হাত ধরাধরি করে।

এক সময় ঘোড়ার পায়ের শব্দ যেন একটু পিছিয়ে গেল বলে মনে হলো ওদের। মনে মনে স্বস্তি অনুভব করলো ওরা। মিনিট কুড়ি এই ভাবে ছুটে চললো ওরা। তারপরেই ভয়ানকভাবে চমকে উঠে থমকে দাঁড়ালো শহীদ। শহীদের দেখাদেখি কামালও দাঁড়িয়ে পড়লো।

'সর্বনাশ হয়েছে, কামাল! পথ ভুল করেছি আমরা!'

খরস্রোতা পার্বত্য নদীর খল খল শব্দ শুনে শহীদ নিরাশ কণ্ঠে আবার বললো, 'নদী এলো কোথা থেকে কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।'

'যা করবার এখুনি কর, শহীদ।' কামাল বললো অস্থির কণ্ঠে। 'পিছনে ঘোড়ার পায়ের শব্দ পাচ্ছি আবার। মনে হচ্ছে এ দিকেই আসছে।'

'নদী পেরোনো ছাড়া কোনো উপায় নেই।'

সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেই ছুটলো শহীদ। কিছুদূর গিয়েই নদীটার দেখা পেলো ওরা। ভীষণ খরস্রোতা নদী। সাঁতরে কিংবা হেঁটে পার হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

'পাথরের ওপর পা দিয়ে দিয়ে পেরুতে হবে।'

শহীদের কথা শেষ না হতেই একটা ছোটো লাফ দিয়ে পানির উপর একটা পাথরের উপর গিয়ে দাঁড়ালো কামাল।

এগিয়ে আসছে লোকগুলো। ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মাটি কাঁপছে। উত্তেজিত কণ্ঠস্বরও শোনা যাচ্ছে তাদের।

নদীটা বেশ চওড়া। ওপারে পৌঁছবার আগেই হয়তো ধরা পড়ে যাবে ওরা!

বেশ খানিকটা এগিয়েছিল কামাল। শহীদও কামালের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে এগোচ্ছিল। এমন সময় তিন চারটি টর্চের তীব্র আলো ওদের উপর এসে পড়লো। সন্ধানী লোকগুলোর মধ্যে উল্লাসের সাড়া জেগে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

দ্রুত একটা পাথর থেকে অন্য একটা পাথরে লাফ দিতে গিয়ে পা ফসকে ঝপ্ করে নদীর তীব্র স্রোতে পড়ে গেল কামাল। পড়েই ভেসে চললো একটা খড়কুটোর মতো। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা হচ্ছিলো তার এই বুঝি কোনো পাথরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে হাড়-গোড় ভেঙে যায়।

বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছিল শহীদ। কামালকে তীব্র নদীর স্রোতে ভেসে যেতে দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিল সে। কি করবে না করবে ভেবে স্থির করতে পারছিল না সহসা। সংবিত ফিরে এলো যখন তার, তখন ছুঁড়ে দেয়া ল্যাসোর একটা ফাঁস তার গলায় এঁটে বসেছে।

আবার বন্দী হলো শহীদ। সকাল হতে তখন আর ঘন্টাখানেক বাকি আছে।

সকাল দশটার মধ্যেই শহীদকে আবার সেই গুহায় এনে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখলো দুর্বৃত্তগুলো। দশটার দিকে একজন আগন্তুক গুহার ভিতরে প্রবেশ করলো। লোকটাকে দেখে রীতিমত চমকে উঠলো শহীদ। বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রইলো না তার। আবেদীন! আবেদীন এখানে কেন! কি ভাবে সে এলো এখানে?

আট

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এলো শহীদের। ঘটাং ঘটাং প্রচণ্ড একটা শব্দে কানে তালা লাগার দশা হলো তার। অবিরাম শব্দের সঙ্গে মেঝেয় ফেলে রাখা শরীরটাও কাঁপছে অবিরত। বাতাসের অপ্রাচুর্যে শ্বাস নিতে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। নড়াচড়া করার জায়গাও নেই কোনদিকে। স্মরণ করার চেষ্টা করলো শহীদ জ্ঞান হারাবার পূর্বের ঘটনাগুলো। আবেদীন তাকে দেখে ব্যঙ্গের হাসিতে ভরিয়ে তুলেছিল মুখ। তারপর বলেছিল, 'আমার সঙ্গে তোমাকে যমের বাড়ি নিয়ে যাবো আজ, মি. শহীদ। সেখানে তোমার মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। তার আগে নরকযন্ত্রণা অবশ্য প্রাপ্য তোমার।'

শহীদ ক্রোধে চিৎকার করে উঠেছিল বাঘের মতো, 'অতি বাড় বেড়েছো তুমি,

আবেদীন! ভেবেছো অন্যায়ের সাজা থেকে তুমি পার পাবে? আমার জন্যে নয়, তোমার জন্যেই মৃত্যুদণ্ড ঝুলছে আইনের হাতে।'

শয়তান আবেদীন শহীদের কথা শেষ হতে গলা ফাটিয়ে হাঃ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে বললো, 'বন্দীর সঙ্গে কোন রকম কথা বলাই আমাদের মানা আছে, মি. শহীদ। সুতরাং কথা না বলে কাজ করি।'

কথা ক'টি বলে হাতে ধরা একটা সিরিঞ্জ নিয়ে এগিয়ে এসেছিল আবেদীন। শিউরে উঠেছিল শহীদ মনে মনে কি একটা অজানা আশঙ্কায়। জোড়া পা দিয়ে কষে একটা লাথি ছুঁড়েছিল সে আবেদীনকে লক্ষ্য করে। কিন্তু লাগেনি। তারপর তিন-চারজন লোক তাকে ধরে বাহুতে একটা ইঞ্জেকশন পুশ্ করেছিল। এর কিছুক্ষণ পর শহীদের আর কোনো কিছু স্মরণ নেই।

ঘটাং ঘটাং শব্দটা কিসের তা বুঝতে পেরে হতভম্ব হয়ে পড়লো শহীদ। ট্রেন! ট্রেন এলো কোথা থেকে? কতক্ষণ তাকে অজ্ঞান করে রাখা হয়েছিল? মরিয়া হয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করলো শহীদ। হাত-পায়ে বাঁধন নেই বুঝতে পারলো সে। কিন্তু উঠে বসতে পারলো না তবু। চেষ্টা করতেই ঠক্ করে মাথায় আঘাত লাগলো। হাত তুলে চারপাশটা অনুভব করলো শহীদ। তারপরই বুঝতে পারলো একটা ট্রাঙ্কে বন্ধ করে রাখা হয়েছে তাকে। সমস্ত শরীর থেকে ঘাম বের হচ্ছে দর দর করে। বাতাসের অভাবে দম বন্ধ হবার জোগাড়। ট্রাঙ্কের মধ্যে কয়েক জায়গায় মাত্র ফুটো করা আছে। বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা কথা মনে পড়ে গেল তার। কোনরকমে একটা হাত কোমরের কাছে নিয়ে গেল সে। তারপর প্যান্টের ভিতর হাতটা ঢুকিয়ে দিয়ে কুয়াশার দেয়া প্রচণ্ড শক্তিশালী লোহা গলানোর টর্চটা বের করে আনলো। অতি কষ্টে পাশ ফিরে যন্ত্রের সুইচটা অন্ করে দিয়ে ট্রাঙ্কের উপর দিকের একটা কোণে ধরলো। চোখ ধাঁধানো তীব্র নীল আলোয় চোখ বন্ধ করলো শহীদ। তারপর যন্ত্রটা একদিক থেকে অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো প্রাণপণ চেষ্টায়।

দশ মিনিটের মধ্যেই কাজটা শেষ হলো শহীদের। প্রচণ্ড গরমে ঝলসে গেছে যেন সে। কয়েক মিনিট মড়ার মতো পড়ে থেকে বিশ্রাম নিলো। তারপর ট্রাঙ্ক থেকে মাথা বের করে তাকালো চারদিকে।

রাত। ট্রেনের কামরায় বাতি জ্বলছে। আবেদীন ছাড়া দ্বিতীয় কাউকে দেখতে পেলো না শহীদ কামরায়। উপরের একটি বার্থে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে আবেদীন। নিঃশব্দে সম্পূর্ণ শরীরটা বের করে আনলো শহীদ ট্রাঙ্ক থেকে। তারপর আবেদীনের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ভাবতে লাগলো কি যেন।

ট্রেনটা ছুটে চলেছে উদ্দাম গতিতে। কামরার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরেটা দেখবার চেষ্টা করলো শহীদ। চাঁদের আলোয় বুঝতে পারলো সে, একটা পাহাড়ী এলাকা দিয়ে ছুটছে ট্রেনটা। ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেললো শহীদ। দরজার পাশেই

রাখা ভাঙা ট্রাঙ্কটা খোলা দরজা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। রাতের বুকে তুফানের মতো ছুটন্ত ট্রেনের শব্দ অন্য সব শব্দকে দমিয়ে দিচ্ছে। কেউ জানতে পারলো না ব্যাপারটা। মিনিট দশেক পর ট্রেনের গতি মন্থর হয়ে আসছে বুঝতে পারলো শহীদ। তৈরি হয়েই থাকলো সে। ট্রেন একটা স্টেশনে থামতেই দ্রুত নেমে পড়লো। স্টেশনটির নাম পড়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো প্ল্যাটফর্মে। অনুমান করে বুঝতে পারলো সে, হায়দারাবাদ আর ঘন্টাখানেকের পথ। দু'মিনিট পরই হুইসেল বাজিয়ে ট্রেন চলতে শুরু করলো। সংবিত ফিরে পেয়েই দৌড়ে একটা কামরার হাতল ধরে উঠে পড়লো শহীদ। তারপর দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করলো। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা এটা। চার-পাঁচজন লোক ঘুমিয়ে আছে। শহীদ একটা বার্থে উঠে শুয়ে পড়ে ভাবনার অতলতলে তলিয়ে গেল।

ভোর পাঁচটায় ট্রেন হায়দারাবাদ পৌঁছুলো। তবুও ট্রেন থেকে নামলো না শহীদ। জানালা দিয়ে আবেদীনের কামরাটার উপর নজর রাখলো। ট্রেন সম্পূর্ণ থামার আগেই হন্তদন্ত হয়ে আবেদীনকে নামতে দেখলো শহীদ। প্ল্যাটফর্মের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত আবেদীন খুব খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করলো শহীদকে। তারপর নিরাশ হয়ে শুকনো মুখে প্ল্যাটফর্মের একটা বেঞ্চিতে বসে পড়লো। ট্রেনের সব মানুষ ইতিমধ্যে নেমে গেছে। উল্টো দিক দিয়ে নেমে ঘুরে প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করলো শহীদ। দূর থেকে আবেদীনের উপর দৃষ্টি রেখে অপেক্ষা করতে লাগলো সে। কয়েক মিনিট পর আবেদীন বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। টিকিট কাউন্টারে গিয়ে কি যেন জিজ্ঞাসাবাদ করে আবার ফিরে এসে বসলো বেঞ্চিটায়। কি মনে করে শহীদও টিকিট কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। একজন লোক কাউন্টারে ঝিমোচ্ছে ঘুমের নেশায়। গলা খাঁকারি দিয়ে শহীদ বললো, 'ও মিস্টার, পূর্বদিকের ট্রেন ক'টার সময় বলতে পারেন?'

'বললাম তো একবার, বেলা দশটার এদিকে ট্রেন নেই।' ঘুম কাতুরে লোকটা বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো।

হেসে ফেলে শহীদ বললো, 'ভুল করছেন আপনি, এর আগে আমি আপনাকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করিনি।'

এতক্ষণে ঘুমের নেশা কাটিয়ে শহীদের দিকে তাকালো লোকটা। তারপর বললো, 'মাফ করবেন, আমি মনে করেছিলাম আপনারা দুজন একই লোক। আর একজনও আপনার মতো এ প্রশ্ন করে গেলেন কিনা একটু আগে। তা আপনি কোথায় যেতে চান?'

প্রশ্ন করে লোকটা শহীদের উদ্দেশ্যে তাকালো। কিন্তু শহীদ তখন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে একটা ট্যাক্সির সন্ধানে চারদিকে তাকাচ্ছে।

বেলা দশটার আগেই ফিরে এলো শহীদ নতুন মানুষ হয়ে। আবেদীন তো দূরের কথা, খোদ মি. সিম্পসনও এখন তাকে দেখে চিনতে পারতেন না। একজন পাঠান যুবকে রূপান্তরিত হয়েছে শহীদ। প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা, আগ্নেয়াস্ত্র ইত্যাদি সে সংগ্রহ

করেছে প্রায় অনায়াসে। হায়দারাবাদ শহরে শহীদের ছাত্র জীবনের বন্ধু ক্যাপ্টেন আলমগীর বাস করে সপরিবারে। ছাত্র বিনিময় কর্মসূচী অনুসারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে আসে আলমগীর। তখনই শহীদের সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তার। আলমগীরকে বাড়িতে পাবে আশা করেনি শহীদ। কিন্তু ছুটি উপলক্ষে সে বাড়িতেই আছে কিছুদিন। অনেকদিন পরে পুরনো দিনের বন্ধুকে আপ্যায়নের সুযোগ পেয়ে বর্তে যায় আলমগীর।

ঠিক দশটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে বসলো আবেদীন। এতক্ষণ সে ট্রেনের অপেক্ষাতেই প্ল্যাটফর্মে বসেছিল গম্ভীর মুখে। ব্যাপারটা আগেই অনুমান করে নিয়েছিল শহীদ। বন্দীসুদ্ধ ট্রাকটা বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যাওয়াতে অন্য কোথাও যেতে পারে না আবেদীন। অন্তত যতক্ষণ না ট্রাকটার কোনো খোঁজ পায়। শহীদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাদের অভিযান থেকে তারা সকলেই যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তখন অন্য কোনো পথ নেই আবেদীনকে অনুসরণ করা ছাড়া। ঘটনাচক্রে কিছু লাভও হতে পারে। সে-ও ফিরতি পথের টিকিট কেটে আবেদীনের কামরাতেই চড়ে বসলো।

এক নাগাড়ে ঘন্টাখানেক ছুটলো ট্রেনটা। তারপর মিনিট দুয়েক থেমে আবার ছুটতে শুরু করলো। আবেদীন ট্রেন ছাড়ার সময় থেকে বরাবর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। শহীদ তার দিকে তাকিয়ে আছে নির্বিকার মুখে। মিনিট পঁচিশ পর শহীদ লক্ষ্য করলো আবেদীন হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখতে পেলো। ভাঙা হাঁ-মুখ ট্রাকটা একটা পাথরের গায়ে দুমড়ে-মুচড়ে পড়ে আছে। শহীদ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে আবেদীনের দিকে তাকালো। সে যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলো ট্রাকটা। তারপর দরজা ছেড়ে অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখে একটা বেঞ্চিতে এসে বসলো মাথা নিচু করে। শহীদের দিকে ফিরেও তাকালো না।

পরবর্তী স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে পড়লো আবেদীন। তারপর একটা টাঙ্গায় চড়ে হায়দারাবাদ অভিমুখে যাত্রা করলো। শহীদও টাঙ্গা নিয়ে পিছু ধরলো তার। বেলা তিনটার সময় হায়দারাবাদ শহরের বিখ্যাত হোটেল লা কারবুজের সামনে এসে দাঁড়ালো আবেদীনের টাঙ্গা। টাঙ্গার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে হোটেলের ভিতর প্রবেশ করলো সে। শহীদও তাই করলো। সৌভাগ্যক্রমে আবেদীনের পাশের স্যুইটটাই খালি ছিলো দোতলার সবকটি স্যুইটের মধ্যে। শহীদ হোটেলের কেরানীকে বলে ওই স্যুইটটাতেই থাকার ব্যবস্থা করলো।

আবেদীন নিজের স্যুইটের দরজা বন্ধ করে দিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত হোটেলেই রইলো। শহীদও কোথাও বের হলো না। সন্ধে সাতটার সময় হোটেল ছেড়ে বের হলো আবেদীন। একটা ট্যাক্সি নিয়ে শহরের অভিজাত এলাকার একটি প্রাসাদতুল্য বাড়ির সম্মুখে এসে নামলো। শহীদও পিছু নিয়েছে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে। বাড়িটার দারোয়ান আবেদীনকে নিয়ে ভিতরে চলে গেল। শহীদ পাঁচিল টপকে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করলো। একটা ইউক্যালিপটাস গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে দোতলায় ওঠার

সিঁড়িটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে। একটু পরই দারোয়ানটা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলো। তারপর নিচের বারান্দা ধরে চলে গেল অন্যদিকে। দারোয়ানটা অদৃশ্য হয়ে যেতেই গাছের আড়াল থেকে বের হয়ে সিঁড়ি টপকে দোতলায় উঠে এলো শহীদ। দোতলার কোনো ঘরে আলো দেখতে না পেয়ে তিনতলায় উঠে গেল সে নিঃশব্দে। সিঁড়ির পাশেই একটা ঘরে আলো জ্বলছে দেখতে পেলো শহীদ। দরজায় কান পেতে দাঁড়াতে ভিতর থেকে অস্পষ্টভাবে কথাবার্তার শব্দ পাওয়া গেল। কীহোল দিয়ে ভিতরে কাউকে দেখতে না পেয়ে শহীদ একটা খোলা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। উঁকি মেরে দেখলো একজন স্থূলকায় লোকের সঙ্গে কথা বলছে আবেদীন। আরও একজন স্থূলকায় লোক মাথায় হাত দিয়ে ঝুঁকে বসে আছে। টেবিলের উপর মদের বোতল এবং আনুষঙ্গিক আসবাবপত্র সাজানো রয়েছে। শহীদ শুনতে পেলো ঝুঁকে পড়া লোকটা সিধে হয়ে বসে মোটা কর্কশ কণ্ঠে বললো, 'তুমি একটা গর্দভের বাচ্চা, বুঝলে! লোকটাকে হাতে পেয়েও খোয়ালে? তোমার ওপর আর তো বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস রাখা যায় না।'

করুণ, মিনতিভরা সুরে আবেদীন কি যেন বললো শুনতে পেলো না শহীদ। স্থূলকায় লোকটা বললো, 'মহা সর্বনাশ করেছো তুমি, ইডিয়েট। তোমাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেললেও আমার রাগ মিটবে না। তোমাকে এতো দায়িত্ব দিয়েছিলাম সে কি এই জন্যে?'

আবার কি যেন বললো আবেদীন মিনতিভরা কণ্ঠে। স্থূলকায় লোক দুজন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে কি যেন ইঙ্গিত করলো। তারপর আবেদীনের দিকে ফিরে একজন বললো, 'এরপর কি করতে হবে না হবে তা আজ রাতেই জানতে পারবে তুমি। মোসাফির খান, হরমত বেগ, নজরুল এবং শাহাদত খান আজ রাত বারোটায় তোমার সঙ্গে দেখা করবে। এখন, তুমি যেতে পারো।'

যন্ত্রচালিতের মতো উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোলো আবেদীন। তার আগেই দ্রুত নেমে এলো শহীদ সিঁড়ি দিয়ে। নিচে নেমে দারোয়ানকে দেখতে পেলো না সে। ভিতর থেকে গেট খুলে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। একটু পর আবেদীনও রাস্তায় এসে পৌঁছুলো। তারপর আবেদীনকে অনুসরণ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই শহীদ হোটেল লা কারবুজেতে এসে পৌঁছলো।

কাঁটায় কাঁটায় রাত বারোটা। শহীদ উৎকর্ণ হয়ে বসে আছে নিজের স্যুইটে। এমন সময় করিডরে কয়েকজনের মিলিত পায়ের শব্দ শুনতে পেলো সে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো শহীদ সোফা ছেড়ে। বাথরুমের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পার্শ্ববর্তী স্যুইটের বাথরুমে প্রবেশ করার জন্যে এগিয়ে গেল সে। শহীদ আগেই কুয়াশার দেয়া টর্চটা দিয়ে আবেদীনের বাথরুমের ছিটকিনি গলিয়ে ফেলেছিল। সুতরাং অনায়াসেই সে ভিতরে প্রবেশ করে কীহোলের ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতর তাকাতে পারলো। চারজন লোক আবেদীনের সঙ্গে কথা বলছে দেখতে পেলো শহীদ। আবেদীনের গলা শোনা গেল, 'আমাকে সঙ্গে না নেবার আদেশ যদি তোমরা পেয়ে থাকো তবে আমার বলার

কি-ই বা থাকতে পারে। কিন্তু এখন আমাকে কি করতে হবে তা তো তোমাদের কাছ থেকেই জানতে পারবো বলে জানি।'

একজন বললো, 'তুমি এখন কি করবে তা আমরা জানি না। আমরা চারজন এখন কি করবো তা জানি। আমরা আগামীকাল সকালে কারখানার উদ্দেশে যাত্রা করবো। সেখানকার হাল-হকিকত সম্পর্কে রিপোর্ট করতে হবে যতো দ্রুত সম্ভব।'

আর একজন বললো, 'ডাক্তাররা ঠিক মতো কাজ করছে কিনা বা কর্নিয়ার জন্যে কোনো নতুন অর্ডার এসেছে কিনা সে সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে বা আলোচনা করতে আমরা যাচ্ছি না কারখানায়। আমরা যাচ্ছি শহীদ খান এবং সিম্পসনকে ছিঁড়েখুঁড়ে কাক-শকুনকে দিয়ে খাওয়াতে।'

অন্য আর একজন বললো, 'অবশ্যি বিশ্বাসঘাতক যাতে সেই মহাত্মাদেরকে আগে থেকে সাবধান না করে দিতে পারে তার ব্যবস্থা না করে আমরা রওনা হবো না।'

প্রথম লোকটা বললো, 'তা তো নিশ্চয়ই।'

লোকটা কথা শেষ করেই টেবিলের তলা থেকে একটা তীক্ষ্ণফলা ছোরাসহ হাতটা তুলেই আবেদীনের বুকে আচমকা বসিয়ে দিলো আমূল। সঙ্গে সঙ্গে একজন এগিয়ে এসে আবেদীনের মুখ চেপে ধরলো যাতে কোনো শব্দ না করতে পারে। গোঁ গোঁ একটা শব্দ তবু আবেদীনের কণ্ঠ চিরে বের হয়ে এলো। চোখ দুটো যন্ত্রণায় কুঁচকে উঠলো।

শিউরে উঠলো শহীদ বীভৎস দৃশ্যটা দেখে। লোকগুলো আবেদীনের শরীরের যত্রতত্র ছোরা বসিয়ে আঘাত করছে। অসহায় জানোয়ারের মতো মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে আবেদীন। কিছুক্ষণ পর ছোরাবিদ্ধ শরীরটা স্তব্ধ হয়ে গেল তার।

এই অমানুষিক দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে নিজের স্যুইটে ফিরে এলো শহীদ। তারপর তৈরি হয়ে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলো কান পেতে। একটু পরেই লোকজনের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল করিডরে। পায়ের শব্দ সামনে এগিয়ে যেতে দরজা খুলে বাইরে থেকে সেটা বন্ধ করে দিয়ে লোকগুলোকে গোপনে অনুসরণ করতে লাগলো সে।

লোকগুলো লা কারবুজ থেকে বেরিয়ে একটা বারে ঢুকলো। শহীদও ভিতরে ঢুকে কাছাকাছি একটা টেবিল দখল করে বসলো। লোকগুলো শহীদের দিকে তাকিয়ে দেখলো বটে, তবে মনোযোগী হলো না। নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলো।

চারজনই প্রচুর মদ খেলো ঘন্টাখানেক ধরে। ইতিমধ্যে মদের নেশায় লোকগুলোর কথাবার্তা জোরে জোরে হচ্ছিলো। শহীদ সব কথা অবশ্যি শুনতে পেলো না। শুধু জানতে পারলো আগামীকাল সকাল দশটার ট্রেনে ওরা যাত্রা করবে। একে একে স্টেশনে উপস্থিত হবে ওরা দশটার আগেই। ওদের মধ্যে বাঙালী লোকটা, যার নাম শহীদ অনুমান করে বুঝলো নজরুল ইসলাম, বেশ স্বাস্থ্যবান, লম্বা, ফরসা। টিকালো নাক। জোড়া ভ্রূ। সরু ঠোঁট। মনে মনে হাসলো শহীদ। কেননা ওই লোকটার ছদ্মবেশ ধরে

বাকি তিনজনের সঙ্গে সে-ও দুর্বৃত্তদের ঘাঁটি অভিমুখে যাত্রা করবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল ইতিমধ্যে। ছদ্মবেশ বেশ নিখুঁতই হবে। চেহারার ভঙ্গিগত অনেক মিল এমনিতেও আছে লোকটার সঙ্গে শহীদের।

কিছুক্ষণ পরই বার ছেড়ে বের হয়ে পড়লো লোকগুলো। রাস্তায় নেমে চারজন চারদিকে চলে গেল ট্যাক্সি করে। শহীদও ভাড়া করা একটা ট্যাক্সিতে বাঙালী লোকটাকে অনুসরণ করে শহরতলীর পুরানো একটা বাড়ির সামনে এসে নামলো। ট্যাক্সিওয়ালাকে বেশি ভাড়া দিয়ে শহীদ বললো যে রাস্তার মোড়ে ফিরে গিয়ে তার জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে মোটা বকশিশ মিলবে। রাজি হলো ড্রাইভার, তারপর চলে গেল রাস্তার মোড়ের দিকে। নজরুল ইসলাম বাড়ির ভিতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। ট্যাক্সি চলে যেতে শহীদ একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশটা দেখে নিয়ে পাঁচিল টপকে বাড়িটার ভিতরে ঢুকে পড়লো। বাড়িটা পুরানো এবং বেশ বড়। অন্ধকারে বেশি কিছু ঠাহর করতে পারলো না শহীদ। বারান্দা ধরে কিছুটা হাঁটতেই একটা ঘর দেখতে পেলো সে। ভিতরে আলোর আভাস পাওয়া গেল। ধীরে ধীরে ঘরের জানালার সামনে গিয়ে উঁকি মেরে দেখলো শহীদ। নজরুল ইসলামকে কাপড়-চোপড় ছাড়তে ব্যস্ত দেখা গেল। ঘরের ভিতর আরো দুজন লোক ঘুমিয়ে আছে। পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে ভাবছিল শহীদ। এমন সময় নজরুল ইসলাম ঘরের দরজা ঠেলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে। তারপর নিশ্চিন্ত মনে বাথরুমের দিকে হাঁটতে লাগলো। একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছিল শহীদ নজরুল ইসলামকে। লোকটা বাথরুমে ঢুকতে খুশি হয়ে উঠলো সে। তারপর দ্রুত পায়ে বাথরুমের পাশে গিয়ে ওত্ পেতে দাঁড়িয়ে রইলো নিঃশব্দে। একটু পরেই বাথরুম থেকে বের হয়ে আসতে দেখা গেল লোকটাকে। বিলম্ব না করে সর্বশক্তি দিয়ে প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারলো শহীদ লোকটার নাক লক্ষ্য করে। অতর্কিত অসহনীয় একটা ঘুসি খেয়ে তাল হারিয়ে টলে পড়ে যাচ্ছিলো সে। তাকে পড়তে না দিয়ে ধরে ফেলে আবার একটা প্রচণ্ড ঘুসি চালালো তলপেটের উপর। সহ্য করতে পারলো না লোকটা। জ্ঞান হারিয়ে ফেললো তখুনি। মাটিতে পড়বার আগে এবারও শহীদ অজ্ঞান শরীরটা ধরে ফেললো। তারপর অচেতন লোকটাকে দ্রুত কাঁধে তুলে নিলো সে। বাড়ির দরজা খুলে নিঃশব্দে পথে নামলো। তারপর ত্রস্ত পদে মোড়ের দিকে হাঁটতে লাগলো।

মোড়ে এসে ট্যাক্সিটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিশ্চিন্ত হলো শহীদ। ড্রাইভারের ভয়ার্ত মুখ একবার প্রত্যক্ষ করে গম্ভীর কণ্ঠে সে বললো, 'থানা হেডকোয়ার্টারে নিয়ে চলো জলদি। আমি পুলিসের লোক।'

'জ্বি, হুজুর!'

ড্রাইভার ব্যস্ত কণ্ঠে কথাটা বলে ট্যাক্সি ছেড়ে দিলো।

নয়

জ্ঞান ফিরে পেতে ধীরে ধীরে চোখ খুলে তাকালো কামাল। একজন পাঠান ভদ্রলোককে তার পাশে বসে থাকতে দেখলো সে। ভদ্রলোক একটা খোলা বইয়ের পাতায় চোখ রেখে বসে আছেন। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হতভম্ব দৃষ্টিতে তাঁবুটা দেখতে লাগলো কামাল। বিদ্যুৎচমকের মতো স্মরণ হলো তার যে নদী পার হবার সময় পা ফসকে পড়ে যায় স্রোতের মধ্যে। কিছুক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টা করে সে তীরের দিকে এগোবার। কিন্তু অল্পক্ষণ পরই জ্ঞান হারায়। তারপর থেকে আর কিছুই মনে নেই তার। কয়েকটা প্রশ্ন জেগে উঠলো কামালের মনে। কে তাকে উদ্ধার করলো মৃত্যুর কবল থেকে? এখানেই বা সে এলো কিভাবে? শহীদ কোথায়? সে কি বন্দী হয়েছে শত্রুর হাতে?

'গুড গড! এইতো আপনার জ্ঞান ফিরে এসেছে! আমি আনন্দ অনুভব করছি মি.·· পার্শ্ববর্তী পাঠান ভদ্রলোক ইংরেজিতে বলে উঠলেন কামালের উদ্দেশ্যে।

ফিরে তাকালো কামাল। তারপর বললো, 'আমার নাম কামাল আহমেদ, কিন্তু...'

কথাটা শেষ না করেই উঠে বসতে গেল কামাল। ভদ্রলোক আপত্তি করে বললেন, 'উঠবেন না, মি. কামাল। আপনি ভয়ানক অসুস্থ এখনও। আপনার বেশি কথা বলাও মানা। আমরা আপনার সম্পর্কে যা জানি সব বলছি, তবে আমার অনুরোধ আপনি এই মুহূর্তে বেশি কথা বলবেন না। প্রথমে আপনার কিছু খাওয়া দরকার। তারপর সুস্থবোধ করলে আলাপ করা যাবে।'

একটু থেমে ভদ্রলোক বললেন, 'আমার নাম খুরশীদ আলম, সিভিল সার্জেন। প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে পড়াশোনা আছে সামান্য। বর্তমানে আমার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে এদিকে এসেছিলাম। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন কিছু পাওয়া যায় কিনা অনুসন্ধান করতে। ফেরার পথে এই সরাইখানায় আশ্রয় নিয়েছিলাম রাত কাটাবার জন্যে।

'গতকাল ভোর রাতে যাত্রা করার সময় আপনাকে এই তাঁবুতে আবিষ্কার করে বিমূঢ় সরাইখানার মালিক খবরটা আমাদেরকে জানায়। কে যেন আপনার অচেতন এবং সিক্ত শরীরটা সকলের অজান্তে এই তাঁবুতে রেখে গিয়েছিল।

'আপনার অবস্থা দেখে রীতিমত শঙ্কিত হয়ে পড়লাম আমি। অগত্যা আমার বন্ধুদেরকে বিদায় জানিয়ে আপনার জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত এখানে থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিতে হয় আমাকে। এই হলো সম্পূর্ণ ঘটনা। আপনার সম্পর্কে কৌতূহলের সীমা নেই মি. কামাল। বাংলাদেশের একজন ভদ্রলোক এই দুর্গম এলাকায়···যাই হোক, পরে আমরা সব শুনবো আপনার মুখে। এখন আপনার খাবার ব্যবস্থা করতে বলি।'

কামালকে কোনো কথা বলতে না দিয়ে খুরশীদ আলম তাঁবু থেকে বের হয়ে গেলেন হাসিমুখে। কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কামাল ভদ্রলোকের গমন পথের দিকে। তারপর চিন্তার জটাজালে জড়িয়ে পড়লো গভীরভাবে।

সেদিন বিকেলে কামালকে উঠে বসার অনুমতি দিলেন খুরশীদ আলম। উঠে বসলেও বেশ দুর্বলতা অনুভব করছিল কামাল। মনে হলো মাথা ঘুরে বুঝি পড়ে যাবে। বালিশে ঠেস দিয়ে বসে কামাল খুরশীদ আলমের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলো, 'কবে নাগাদ আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হবো বলে মনে হয়, মি. খুরশীদ?'

'অন্তত সাতদিন আপনার সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার, তারপর আপনার দুর্বলতা আর থাকবে না।'

আঁৎকে উঠলো কামাল, 'অসম্ভব! বড়জোর আগামীকাল পর্যন্ত আমি বিশ্রাম নিতে পারি, তার বেশি কোনমতেই সম্ভব নয়। এমনিতেও কি সর্বনাশ যে হয়ে গেছে কে জানে।'

কৌতূহলী স্বরে মি. খুরশীদ বললেন, 'বলুন দেখি, মি. কামাল, এবার আপনার সম্পর্কে। আমার তো আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু আপনার কথা শুনে আগ্রহটা অতিমাত্রায় খোঁচাচ্ছে আমায়। অবশ্য সব কথা যদি বলতে আপত্তি থাকে আপনার, তবে আমার অনুরোধ আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি।'

মি. খুরশীদকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ দেখলো না কামাল। দু'একটা কথা বাদ দিয়ে তাদের সব কথাই বললো সে। অভিযানের মূল কেন্দ্রে প্রবেশ করার পূর্বেই তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বলে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করলো। তারপর বললো, 'এক্ষেত্রে বিশ্রাম গ্রহণের কথা আমি কোনমতে মেনে নিতে পারছি না। যেমন করে হোক যেতে আমাকে হবেই। অবশ্যি এখন আমি কপর্দকশূন্য। ঘোড়া, খাদ্য, অস্ত্র—প্রয়োজনীয় কিছুই নেই আমার। তবু…'

মি. খুরশীদ বাধা দিয়ে বললেন, 'আপনি কপর্দকশূন্য কি না জানি না। তবে, একটা ঘোড়া আপনার সঙ্গে এই সরাইখানায় পাওয়া গেছে।'

চমকে উঠে কামাল বললো, 'তাই নাকি? অদ্ভুত ব্যাপার কিন্তু। আমার প্রাণরক্ষাকারী যে কে তা পর্যন্ত আমি জানতে পারলাম না।'

কামাল আবার বললো, 'তবে আর ভাবনার কিছু রইলো না। আমি যে-কোনো সময় যাত্রা করতে পারি। আগামীকালই রওনা হবো আমি।'

মি. খুরশীদ বললেন, 'সেটাই ভালো হবে। শরীরটা আর একটু সুস্থ হলে যাত্রা শুরু করাই ঠিক হবে আপনার পক্ষে।'

মাঝখানের একটা দিন বাদ দিয়ে যাত্রা শুরু করলো কামাল বিকেলের দিকে। অজ্ঞাত প্রাণরক্ষাকারীর ঘোড়ায় চড়ে কেমন অস্বস্তিবোধ করছিল সে।

ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস নেই কামালের। উপরন্তু ঘোড়াটাও শুরু থেকেই কেমন যেন অদ্ভুত আচরণ করছিল। একসময় ঘোড়াটা সত্যিই খেপে উঠলো। চলতে চলতে কামাল একবার একটু জোরে লাগামটা টেনে ধরেছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য, ঘোড়াটা সঙ্গে সঙ্গে রুখে দাঁড়ালো। শুধু তাই নয়, পিঠ দুলিয়ে, পিছনের পা শূন্যে তুলে তাকে পিঠ থেকে ফেলে দেবার চেষ্টায় উন্মাদ হয়ে উঠলো।

অনভ্যস্ত হাতে ঘোড়াটাকে প্রাণপণে সামলাবার চেষ্টা করতে লাগলো কামাল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। লাগাম টেনে টেনে হাতে ফোস্কা পড়ে গেল তার। একবার ঘোড়াটা প্রাণপণে ছুটতে আরম্ভ করলো হঠাৎ। কামাল কোনমতে প্রাণভয়ে অধীর হয়ে জাপটে ধরে রইলো ঘোড়ার গলা। বেশ কিছুক্ষণ একটানা এই ভাবে ছোটবার পর ঘোড়াটা আবার পূর্ববৎ আচরণ করতে লাগলো। কিছুতেই স্থির হয়ে বসে থাকতে দেবে না কামালকে পিঠের উপর।

কোনরকমে কুণ্ডলী পাকিয়ে জাপটে ধরে আছে কামাল ঘোড়াটার ঘর্মাক্ত পিঠ। ইতিমধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। অন্ধকার মরুভূমিতে কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। কোথা থেকে কোথায় যে যাচ্ছে তা অনুমান করার সাধ্যও নেই তার। ঘোড়াটা একটু স্থির হলেই সে লাফ দিয়ে নেমে পড়বে ভাবছিল কামাল। কিন্তু শিক্ষিত ঘোড়া চটে গেছে। উপায় নেই আর। ছুটছে সে দুর্দম বেগে!

হঠাৎ একসময় ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে গেল কামাল। পড়বার সময় চোখ বন্ধ করে ভবিতব্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল সে। বালিতে ছিটকে পড়েই চোখ খুলে তাকালো।

কিন্তু—একি! হায়, শেষ পর্যন্ত সে কি চোরাবালিতে পড়লো?

ঠিক তাই। উঠে বসতে গিয়েই বুঝলো কামাল ধীরে ধীরে বালির নিচে ঢুকে যাচ্ছে সে।

ব্যাপারটা বোধগম্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কামাল কিন্তু হতদিশা হয়ে পড়লো না। শরীরের শেষ শক্তিটুকু ব্যয় করেও যতক্ষণ পারে নিশ্চিত মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে তৈরি হলো সে মনে মনে।

এ রকম বিপদে পড়লে কি করতে হয় কামালের তা জানা আছে ভালো করে। হাত আর পা এলিয়ে সে নিঃসাড় পড়ে রইলো। শরীরটাকে রাখল যেভাবে হাত-পা না নেড়েও সাঁতারুরা পানির উপর চিত্ হয়ে ভাসে সেই ভাবে।

সর্বনাশী ঘোড়াটার পিঠটা দেখা যাচ্ছে খানিক দূরে। বেদম পা ছুঁড়ছে বোকা জানোয়ারটা। ক্রমশই ডুবে যাচ্ছে তার শরীরটা নরম ভিজে বালির ভিতরে।

শিউরে উঠলো কামাল। কিছুক্ষণ পর তারও ওই দশা হবে।

অনড় পড়ে থাকলে একটু বেশি সময় লাগবে বালির ভিতর জীবন্ত ঢুকে যেতে। কিন্তু কেউ উদ্ধার না করলে পরিত্রাণ নেই তার। তবু একবার শেষ চেষ্টা করতে দোষ কি! কামাল হঠাৎ অনেকটা উন্মাদের মতোই হাত-পা ঝেড়ে চিৎকার করে উঠলো আকাশফাটা কণ্ঠে—কে আছো, বাঁচাও! বাঁ-চা-ও!

পরক্ষণেই টের পেলো কামাল, প্রায় আধ হাত বালির নিচে ঢুকে গেছে সে নড়াচড়ার দরুন!

আশঙ্কায় জর্জরিত হয়ে অসহায়ভাবে নিঃসাড় পড়ে রইলো সে চোখ বন্ধ করে।

ক'মিনিট পর চোখের উপর তীব্র আলোর ছটা পড়তে চমকে তাকালো কামাল।

সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার থেকে মি. সিম্পসনের গলা ভেসে এলো, 'কামাল!'

'মি. সিম্পসন!' আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল কামালের।

'এই দড়িটা ধরো।' মি. সিম্পসন ল্যাসো ছোঁড়ার কায়দায় কামালের দিকে একটা দড়ি ছুঁড়ে দিলেন।

কোনো পরোয়া না করে শরীরের সমস্ত শক্তি সংহত করে দড়ির ফাঁসটা দুহাতে জাপটে ধরলো কামাল। এবারকার মতো বেঁচে গেছে সে!

দশ

মি. সিম্পসনের দড়ি ধরে চোরাবালি থেকে মুক্ত হয়ে কামাল শহীদকে দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'শহীদ কোথায়, মি. সিম্পসন?'

অধৈর্যস্বরে মি. সিম্পসন বললেন, 'তুমি কি পাগল হলে, কামাল! শহীদ কোথায় সে কথা তো আমিই তোমায় জিজ্ঞেস করবো। বলো, কোথায় শহীদ?'

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কামাল। বুঝতে পারলো সে সব। শহীদ শত্রুর হাতে বন্দী হয়েছিল তাহলে। কিন্তু কোথায় সে এখন?

'কই বলো! অমন চুপ করে রইলে কেন?'

যা ঘটেছিল সবই বললো কামাল মি. সিম্পসনকে। অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে উঠলো মি. সিম্পসনের মুখ। কিছুক্ষণ নির্বাক থেকে একসময় তিনি বললেন, 'শহীদের ব্যাপার নিয়ে আমরা যতোটা দুশ্চিন্তা করছি ততোটা বোধহয় ঠিক নয় কামাল। শহীদকে আমরা খুব ভালো ভাবেই জানি। সুতরাং তার উপর ভরসা রেখে এসো আমরা কাজ শুরু করি। কুখ্যাত দুর্গটা এখান থেকে দূরে নয়। পিছন দিকে তাকিয়ে দেখো, দেখতে পাবে দুর্গটা। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাবো সম্ভবত ওখানে। আশা করি শহীদকে আমরা ওখানেই পাবো। আমার বিশ্বাস গন্তব্যস্থানে সে যেমন করেই হোক পৌঁছবেই। তাছাড়া ওখানে আমরা আজ রাতের মধ্যেই পৌঁছতে না পারলে হয়তো কুয়াশার যা করার সব করে সর্বনাশ ঘটিয়ে কেটে পড়বে আগেভাগে।'

কামাল বললো, 'বেশ, তাই হোক। কিন্তু ঘোড়া নেই আমাদের, তাছাড়া দুর্গে তো অনেক লোকজন আছে শত্রুপক্ষের বাধা দেবার। আমরা ভিতরে ঢুকতে পারবো তো?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'চেষ্টা করতে দোষ কি। প্রায় কোয়ার্টার মাইল জায়গা জুড়ে দুর্গটা। এতো বড় জায়গাটার কোনো না কোনো খানে দুর্বল অংশ না থেকেই পারে না। চেষ্টা করলে আমরা নিশ্চয়ই ঢুকতে পারবো।'

কামাল বললো, 'আমার কিন্তু মনে হচ্ছে কুয়াশার কাজ কুয়াশা সেরে ফেলেছে ইতিমধ্যে। আমরা গিয়ে হয়তো দুর্গ শূন্য দেখবো।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'অসম্ভব নয়। কেননা, মরুভূমিতে শত্রুদের একটা

পাহারার ঘাটিতেও লোক নেই দেখে এসেছি আমি। সবগুলো তাঁবুই শূন্য। লোকগুলোকে হয়তো কুয়াশা বন্দী করে নিয়ে গেছে।'

কামাল বললো, 'অসম্ভব নয়।'

মি. সিম্পসন হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলে উঠলেন, 'আরে! আমার ওয়্যারলেস সেটটা কোথায় গেল! ওটা তো চোরাবালির কাছে যখন যাই তখন ছিলো আমার কাঁধে ঝোলানো!'

'বলেন কী?' কামাল হতবাক কণ্ঠে বললো।

'আমার কি মনে হয় জানো,' মি. সিম্পসন চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, 'তোমার দিকে যখন আমি চোরাবালির কিনারে দাঁড়িয়ে ল্যাসো ছুঁড়েছিলাম তখনই সেটা পড়ে যায় আমার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে। এখন কি করি বলো তো? ওটা ছাড়া বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের আর কোনো উপায়ই রইলো না যে আমাদের।'

'তবু একবার খোঁজ করে দেখতে দোষ কি।' কামাল বললো, 'চলুন দেখি সেটটা কোথাও পড়েছে কি না।'

'কোনো লাভ নেই কামাল। মি. সিম্পসন হতাশ কণ্ঠে বললেন, আমি জানি ওটা আর পাওয়া যাবে না। তার চেয়ে সময় নষ্ট না করে চলো আমরা দুর্গের দিকেই যাই।'

'চলুন,' কামাল অগত্যা সায় দিলো।

গভীর রাতে দুর্গের পিছন দিকে এসে পৌঁছুলো ওরা। কোনরকম বাধাই দিলো না কেউ। বিরাটাকার দুর্গটা আগাগোড়া পাথরের তৈরি। দু'মানুষ সমান উঁচু চারদিকের দেয়াল। দেয়ালের গায়ে কোনরকম গর্ত পাওয়া গেল না। পাঁচিলের উপর হাতখানেক উঁচু কাঁটাতারের বেড়া। দড়ির মই বের করলেন মি. সিম্পসন। প্রথমে কামাল উঠলো পাঁচিলের মাথায়, তারপর মি. সিম্পসন।

দুর্গের ভিতর দিকে তাকিয়ে অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলো না ওরা। হঠাৎ বুকটা দুরুদুরু করতে লাগলো কামালের। শহীদকে ছাড়া কোনো অভিযানেই সে একা কখনও সফল হতে পারেনি। প্রতিবারই বিপদ থেকে শহীদ তাকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু এখন যদি কোনো ফাঁদে পা দিয়ে ফেলে সে? কে বাঁচাবে তাকে?

দুজনই নেমে পড়লো একে একে দুর্গের ভিতর। দুর্গের মেঝেটাও পাথরের তৈরি। সামনের কিছুই দৃষ্টিগোচর হলো না। পাঁচিল ঘেঁষে গুটি গুটি পায়ে এগোলো ওরা নিঃশব্দে। টর্চ জ্বালতে মানা করেছেন মি. সিম্পসন। যদিও সম্পূর্ণ অপরিচিত ওদের কাছে দুর্গের আকার-আকৃতি, তবু টর্চ জ্বেলে নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন করার কোনো মানে হয় না। হাঁটতেই থাকলো ওরা। মিনিট কয়েক হেঁটে অবশেষে দুর্গের একাংশে একটা আলোর রেখা দেখতে পেলো।

একটা ঘরের জানালা পথে আলো এসে পড়েছে বাইরে। জানালাটা বেশ উঁচুতে। লোহার শিক দেয়া। কিন্তু জানালার নিচে কোনো বারান্দা নেই। ঘরটার গা ঘেঁষে ওরা হাঁটতে লাগলো আবার। অস্বাভাবিক লম্বা ঘরটা। বিরাট একটা হল ঘর যেন। হঠাৎ

একটা কম বয়েসী ছেলের কণ্ঠস্বর শুনে থমকে দাঁড়ালো ওরা। তারপর একটা লোহার পাতের দরজা দেখতে পেয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল চুপিচুপি। দরজার গায়ের ছোট্ট একটা ফুটোয় চোখ রেখে কিছুই দেখতে পেলো না কামাল। কান পেতে তবু কণ্ঠস্বরটা শুনতে চেষ্টা করলো।

আশ্চর্য হয়ে শুনলো কামাল ছেলেটি উত্তেজিত স্বরে বলছে, 'হ্যাঁ ভাইয়া, সকলকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি। বাইরে বোধহয় একজন লোক পাহারায় আছে। আমাদের সবাই পাশের ঘরে তৈরি হয়েই আছে। আপনার হুকুম পেলেই লোকগুলোকে আমরা বাইরে নিয়ে যেতে পারবো। না, না, কোনো অসুবিধা হবে না। আপনি আপনার এই ছোটো ভাইটার উপর নির্ভর করতে পারেন, ভাইয়া। আর একটা সুখবর আছে, ভাইয়া, আমার ভাই—শাকিলকে পেয়েছি। ওর চেহারা বদলে গেছে বলে চিনতে পারিনি প্রথমে। আগামীকাল ওর চোখ তুলে নেবার দিন ছিলো!'

কিছুক্ষণ নীরবতার পর আবার শোনা গেল, 'আপনি দুর্গের ভিতরেই আছেন, ভাইয়া? তবে আপনি নিজে আসছেন না কেন এখানে?'

আবার কিছুক্ষণের নীরবতা। তারপর শেষবারের মতো শোনা গেল, 'বুঝেছি। হ্যাঁ, আমরা ওদেরকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছি। যন্ত্রটা বন্ধ করে দিই এবার?'

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো ওরা। কিন্তু আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। কামাল বললো, 'ঘরটার ভিতর ঢুকতে হবে মি. সিম্পসন। অনেক তথ্য জানা যাবে ভিতরে। কে যেন ওয়্যারলেসে কথা বলছিল কার সঙ্গে।'

'সুতরাং ভিতরে ঢোকবার জন্য চেষ্টা করা যাক।'

লোহার দরজাটা ভালভাবে পরীক্ষা করা হলো, কিন্তু অসম্ভব বলে মনে হলো দরজাটা অতিক্রম করা। হলঘরটায় ঢোকার জন্যে ঘোরাফেরা করতে লাগলো ওরা। এদিক থেকে ওদিকে ঘুরতে লাগলো। এভাবে ঘুরতে ঘুরতেই দিশে হারিয়ে ফেললো ওরা। হলঘরটার সঙ্গে লাগোয়া আরো ঘর ছিলো চারপাশে। ওরা ভাবলো ঘর একটাই। মিনিটের পর মিনিট কেটে গেল। হঠাৎ মেশিনগানের শব্দে চমকে উঠলো ওরা। বিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারপর শব্দ লক্ষ্য করে ছুটলো। মেশিনগানের শব্দ কিছুক্ষণ হয়েই থেমে গেছে। ছুটতে ছুটতে কামাল বললো, 'গোলকধাঁধায় পড়ে গেছি আমরা মি. সিম্পসন। এদিক দিয়ে তো আমরা একবার গেছি, আবার সেই একই জায়গায় এলাম কি করে!'

মি. সিম্পসন কিছু বলবার আগেই কামাল মরিয়া হয়ে টর্চ জ্বাললো। টর্চের আলোয় ওরা দেখলো চারদিকে চারটে সংকীর্ণ গলি চলে গেছে, গলিগুলোর দু'পাশে উঁচু সারি সারি ঘর শুধু। টর্চটা না নিবিয়েই একটা গলি ধরে ছুটলো দুজন। দুপাশের ঘরের সারি আর শেষ হতে চায় না। মিনিট দুয়েক ছোটার পর মুক্তি পেলো ওরা গোলক ধাঁধা থেকে। তারপরই থমকে দাঁড়ালো।

সম্মুখেই তিনজন সেন্ট্রির মৃতদেহ দেখতে পেলো ওরা। আবার ছুটলো

মৃতদেহগুলো পিছনে ফেলে। একটা দেয়ালের আড়াল থেকে উঠান মতো একটা জায়গায় পৌঁছেই চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল কামালের। উঠানটা বিজলী বাতিতে আলোকিত। সেই আলোকিত উঠানে একজন লোক একটা হালকা মেশিনগান উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছিল। লোকটার পিছনেই প্রায় দু' আড়াই শো ছোটো ছোটো ছেলে শক্ত-কঠিন মুখে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে।

'স্টপ!'

চিৎকার করে উঠলো লোকটা কামাল ও মি. সিম্পসনকে দেখেই। একমুহূর্ত পরই লোকটা মেশিনগানের মুখটা ওদের দিক থেকে সরিয়ে নিয়ে বলে উঠলো, 'মাফ করবেন! এতক্ষণ চিনলাম।'

কামাল লোকটাকে চিনতে পেরে অবাক না হয়ে পারলো না। লোকটা কুয়াশার অনুচর মান্নান ছাড়া আর কেউ নয়। কামাল জিজ্ঞেস করলো গম্ভীর চালে, 'তোমরা যাচ্ছো কোথায়?'

মান্নান হাসিমুখে উত্তর দিলো, 'উত্তর দেবার অনুমতি আছে কি নেই জানি না বলে উত্তর দিতে পারছি না আমি। আচ্ছা চলি।'

ঘুরে দাঁড়ালো মান্নান কথাকটি বলে। সঙ্গে সঙ্গে ছেলের দলও ঘুরে দাঁড়িয়ে সামনে এগিয়ে চললো। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল এক সময়।

মি. সিম্পসন কামালের উদ্দেশ্যে বললেন, 'ওদেরকে কি যেতে দেয়া উচিত হলো?'

হেসে ফেলে কামাল বললো, 'ওদেরকে আটকে রেখে কি লাভ হতো?'

'তাহলে হয়তো কুয়াশার সাক্ষাত পেতাম।'

কামাল কোনো উত্তর না দিয়ে একটা ঘরের খোলা দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ঘরের ভিতর ঢুকে ওরা দেখলো ঘরটা শূন্য। ভিতর দিয়ে অন্য ঘরে যাবার দরজা রয়েছে একটা। দরজাটা খোলাই ছিলো। দ্বিতীয় ঘরটায় প্রবেশ করে আবার অন্যান্য ঘরে যাবার দরজা দেখতে পেলো ওরা। এভাবে একটার পর একটা পেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ একসময় থমকে দাঁড়ালো ওরা। দূরে লোহার গেট খোলা বা বন্ধ করার ক্যাঁচ ক্যাঁচ একটা শব্দ শুনতে পেয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো। তারপর দ্রুত পায়ে শব্দ লক্ষ্য করে সামনে এগোতে লাগলো। কয়েকটা ঘর পার হতে ওরা একটা বিরাট হলঘরের ভিতর এসে দাঁড়ালো। ঘরটার অন্যদিকের দরজাটার দিকে আগে আগে এগিয়ে গেলেন মি. সিম্পসন। মি. সিম্পসন দরজাটা টপকেই দেখতে পেলেন কালো আলখেল্লা পরিহিত একটা বিশাল মূর্তি তার কাঁধে চার-পাঁচজন অচেতন মানুষকে নিয়ে একটা ঘরের ভিতর ঢুকলো। তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মি. সিম্পসন। কুয়াশাকে চিনতে বিলম্ব হয়নি তাঁর। একটু পরই ঘরটা থেকে বের হয়ে ছোটো উঠানটায় এসে দাঁড়ালো কুয়াশা। সঙ্গে সঙ্গে রিভলভার তাক করে গম্ভীর কণ্ঠে মি. সিম্পসন কুয়াশার উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, 'মাথার উপরে হাত তুলে দাঁড়াও কুয়াশা! সাবধান! চালাকি

করার চেষ্টা করে খামোকা বিপদের ঝুঁকি নিও না।'

মি. সিম্পসনের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো। ছট্ করে কোথা থেকে একটা ঢিল এসে লাগলো সিম্পসনের হাতের কব্জিতে। বাবুল একটা থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে মেরেছে ঢিলটা।

মি. সিম্পসনের হাত থেকে রিভলভারটা ছিটকে পড়লো দূরে।

'সাবাশ!' হেসে উঠে কুয়াশা বললো বাবুলের দিকে তাকিয়ে।

এদিকে যে মুহূর্তে মি. সিম্পসন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন সেই মুহূর্তে কামাল পিছন দিকে একটা ঘড় ঘড় শব্দ শুনে থমকে দাঁড়ালো। তারপর শব্দটা লক্ষ্য করে পাশের ঘরে এসে দাঁড়ালো সে নিঃশব্দে। চমকে উঠলো কামাল ঘরটার ভিতর পা ফেলেই। ঘরের একদিককার দেয়াল সরে যাচ্ছে ভোজবাজির মতো ক্রমশ। আশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কামাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেয়ালের একটা অংশ অদৃশ্য হয়ে গেল একপাশে। দেয়ালটা অদৃশ্য হয়ে যেতেই একটা কুয়োর মতো দেখতে পেলো সে। একটা সিঁড়িও উঠে এসেছে নিচের দিক থেকে। অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে একটা পদশব্দ ক্রমশ উঠে আসছে উপর দিকে শুনতে পেলো কামাল। সঙ্গে সঙ্গে সে দেয়ালের পাশে সরে দাঁড়ালো। একটু পরই একটা লোককে ঘরের ভিতর উঠে আসতে দেখলো স্টেনগান হাতে করে। কালবিলম্ব না করে স্টেনগানটা কেড়ে নিয়ে দূরে ফেলে দিলো কামাল। তারপর লোকটার গলা টিপে ধরলো শক্ত আঙুলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান হারালো লোকটা। অচেতন লোকটাকে এবার বেঁধে ফেললো কামাল। তারপর মি. সিম্পসনের খোঁজ না করেই সিঁড়ি ধরে নামতে লাগলো একহাতে উদ্যত রিভলভার আর অন্য হাতে টর্চ জ্বেলে।

এগারো

নজরুল ইসলামকে থানায় জমা রেখে পরদিন সকাল দশটায় তারই ছদ্মবেশে প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে নিরাপদেই যাত্রা করেছিল শহীদ। তিনজনের মধ্যে কেউই তার ছদ্মবেশ ধরতে পারেনি। সন্দেহ করেনি বিন্দুমাত্রও। ট্রেনে করে মাইল পঞ্চাশ অতিক্রম করেছিল ওরা। তারপর এক জায়গায় নেমে মোটরে আরোহণ করেছিল। মোটরে চড়ে আরো পঞ্চাশ মাইল গিয়ে একটা জঙ্গলে প্রবেশ করেছিল ওরা সেদিনই। 'কপ্টার রাখা ছিলো আগে থেকেই। কোথা থেকে, কিভাবে 'কপ্টারটা জঙ্গলে এলো তা শহীদ বুঝতে পারলো না। জিজ্ঞেস করতেও ভরসা করেনি সে। তাহলে নির্ঘাৎ সন্দেহ হতো লোকগুলোর।

হেলিকপ্টারে চড়ে ঘন্টা দুয়েক ওড়ার পর মরুভূমির দেখা পাওয়া যায়। মরুভূমিতে কয়েক জায়গায় নেমেছিল তারা। অসম্ভব চমকে উঠেছিল লোক তিনজন। শহীদও কম হতবাক হয়নি। মরুভূমির বহু স্থানেই তাঁবু দেখতে পেলো ওরা। কিন্তু একটা তাঁবুতেও লোক নেই। লোকগুলোর কথা শুনে শহীদ বুঝলো সবগুলো তাঁবুই ছিলো অনাহূত

ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যাতে দুর্গ অভিমুখে যাত্রা করতে না পারে তার জন্য পাহারার ঘাঁটি। কিন্তু খুব সম্ভব, শত্রুপক্ষের আক্রমণের মুখে লোকগুলো টিকতে পারেনি। তাদেরকে হয়তো বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

চমকে উঠেছিল লোকগুলো। শহীদও গম্ভীর গম্ভীর ভাব এনে অভিনয় করতে লাগলো। অবশেষে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো গুপ্ত পথে ওরা দুর্গে প্রবেশ করবে। ব্যাপার খুব গুরুতর বোঝা যাচ্ছে। দুর্গ নিশ্চয়ই অজানা কোনো শত্রু শক্তির দ্বারা বিপদগ্রস্ত হয়েছে। লোকগুলোর মেজাজ দেখে রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠলো শহীদ। কিন্তু ভাবেসাবে সে-ও হিংস্র হয়ে উঠলো অজ্ঞাত শত্রুর বিরুদ্ধে।

একটা পাহাড়ের উপর নামানো হলো 'কপ্টারটা সন্ধ্যার সময়। পাহাড় থেকে কিছুটা নেমে একটা গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথ ধরে মিনিট পনেরো হাঁটার পর প্রশস্ত একটা জায়গায় হাজির হলো ওরা। আশ্চর্যের সীমা রইলো না শহীদের, যখন জানতে পারলো সে এই পাথরের সুড়ঙ্গ পথ ধরে দুর্গের একেবারে সর্বশেষ স্তরে পৌঁছানো যায়। কিন্তু আশ্চর্য হবার মতো আরো বিষয় ছিলো শহীদের জন্যে। আরো কিছুদূর এগিয়ে একটা অন্ধকার মতো জায়গায় সে দেখতে পেলো একটা ফোক্সওয়াগেন থারটিন হাণ্ড্রেড।

সকলেই একে একে চড়ে বসলো গাড়িটায়। তারপর হেডলাইট জ্বেলে দু'পাশের পাথরের দেয়াল ঘেঁষে ভয়ানক বেগে চালাতে লাগলো একজন গাড়িটা। প্রতি মুহূর্তে শহীদের আশঙ্কা হতে লাগলো এই বুঝি একটু বেঁকে গিয়ে পাথরের গায়ে ধাক্কা লেগে গাড়িটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়।

প্রচণ্ড বেগে গাড়িটা ছুটলো মিনিট দশেক। তারপরই পৌঁছে গেল ওরা। লোহার মোটা পাত দিয়ে মোড়া একটা বিরাট গেটের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো গাড়িটা। একে একে দ্রুত নেমে পড়লো সবাই গাড়ি থেকে। সাঙ্কেতিক বেল বাজাতে খুলে গেল গেট। দুজন স্টেনগানধারী সেন্ট্রি দাঁড়িয়ে আছে দেখলো শহীদ। এদেরকে দেখেই স্টেনগান নামিয়ে রেখে স্যালুট করলো চটপট।

'খবর কি, হিকমত খান?'

একজন সেন্ট্রি বললো, 'সব ঠিক আছে, হুজুর।'

'সব ঠিক আছে?'

'জ্বি, হুজুর।'

'এক তলা আর দু'তলার খবর জানো?'

'না, হুজুর। উপরের তলায় ওঠার হুকুম নেই তা তো জানেন।'

'তা ঠিক। আচ্ছা যাও, গাড়িটা ঠিক জায়গায় রাখো।'

সেন্ট্রি দু'জন গেট পেরিয়ে চলে গেল ওদিকে।

'নজরুল, তুমি চাবিটা নিয়ে এসো গেটের। আমরা ততক্ষণ এগিয়ে গিয়ে দেখি।'

কথাটা বলে চলে গেল তিনজনই। শহীদ লক্ষ্য করলো পূর্বদিকের একটা বারান্দায় উঠে ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে রইলো শহীদ তালা মেরে চাবির গোছাটা হাতে

নিয়ে। সেন্টি দুজন গাড়ির তদারকে ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। হঠাৎ মনস্থির করে ফেললো শহীদ। অন্যমনস্কভাবে এগিয়ে গিয়ে আচমকা গেটটা বন্ধ করে দিলো সে। একটুও দেরি না করে তালা লাগিয়ে দিলো দ্রুত। সেন্টি দুজনের স্টেনগান দুটো পড়ে ছিল সামনেই। তুলে নিলো শহীদ একটা। অন্যটা একপাশে সরিয়ে রাখলো যাতে কেউ না দেখতে পায়। তারপর লোক তিনজন কিছুক্ষণ আগে যেদিকে গেছে সেইদিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল। বারান্দার শেষ প্রান্তে একটা ঘর দেখতে পেলো শহীদ। নির্ভয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লো সে। কিন্তু দেখতে পেলো না কাউকে। ঘরটার ভিতর দিয়ে পরপর কয়েকটা ঘর পেরিয়ে গেল শহীদ। এবার সে যে ঘরটায় এসে দাঁড়ালো সেটা একটা অদ্ভুত রকমের ঘর। কিছুটা ল্যাবরেটরির মতো দেখতে। অদ্ভুত আকারের শত শত শিশি আলমারিতে সাজানো রয়েছে। ঘরটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। আলমারিটার কাছে এগিয়ে গিয়ে শিশিগুলোর গায়ে আঁটা লেবেল পড়ে শিউরে উঠলো শহীদ। শত শত ছেলেকে চিরতরে অন্ধ করে দিয়ে তাদের চোখের কর্নিয়া বের করে ভরে রাখা হয়েছে বিশেষভাবে তৈরি এই ছোট শিশিগুলোতে। দাঁতে দাঁত চেপে ঘরটা ছেড়ে অন্য একটা ঘরের উদ্দেশে পা বাড়ালো শহীদ। মাঝখানের দরজাটা অতিক্রম করেই থমকে দাঁড়ালো সে। একজন ডাক্তার একটা টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে কি যেন পড়ছেন। শহীদের পায়ের আওয়াজ শুনে মুখ তুলে তাকালেন তিনি। স্টেনগানের মুখ তারই দিকে উঁচিয়ে শহীদকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'কি ব্যাপার, মি. নজরুল! স্টেনগান হাতে কোথায় চলেছেন?'

গম্ভীর কণ্ঠে শহীদ বললো, 'আমার নাম নজরুল ইসলাম নয়, প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খানের নাম আপনি নিশ্চয়ই শোনেননি, আমি সেই শহীদ খান। নজরুল ইসলামের ছদ্মবেশে আছি। আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিন ভালো চান তো।'

অবাক দৃষ্টিতে ডাক্তার তাকিয়ে রইলো শহীদের দিকে। তারপর মুখ খুলতে গিয়েই বাধা পেলো শহীদের কণ্ঠস্বরের, 'দরকার নেই আপনার সঙ্গে কথা বলে সময় ব্যয় করার। ভালমানুষের মতো চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ান। তা না হলে গুলি করবো।'

যন্ত্রচালিতের মতোই উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার। তারপর শহীদের পরবর্তী আদেশ অনুযায়ী টেবিলের কাছ থেকে কয়েক পা সরে এসে পিছন ফিরে দাঁড়ালেন নিঃশব্দে। ডাক্তারের পকেট সার্চ করে কিছুই পেলো না শহীদ। সে তার নিজের পকেট থেকে সিল্কের কর্ড বের করে বেঁধে ফেলে রাখলো ডাক্তারকে মেঝেতে। ডাক্তারকে বাঁধা শেষ করে উঠে দাঁড়াতেই হঠাৎ লাউড স্পীকারে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো শহীদ··· 'নজরুল দোতলায় উঠে এসো তাড়াতাড়ি! সর্বনাশ হতে বাকি নেই কিছু! একতলায় উঠছি আমরা। ডাক্তার আর সেন্টি দুজনকেও সঙ্গে করে নিয়ে এসো। বেশি লোকের দরকার হতে পারে। লিফট্ নামিয়ে দিচ্ছি।'

চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে রইলো শহীদ। দোতলায় যেতে চাইলেই সে যাবে কিভাবে। লিফট্ কোন দিকে তা কে জানে। হঠাৎ ঘড় ঘড় করে একটা শব্দ হলো ঘরের বাইরে।

ছুটে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো শহীদ। বারান্দার এক কোণে দেখা যাচ্ছে একটা লিফট্। এখুনি নিচে নেমে এসেছে ওটা দোতলা থেকে।

দোতলায় উঠে দুজন সেন্ট্রির মৃতদেহ ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পেলো না শহীদ। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা সিঁড়ি পেয়ে গেল সে। কালবিলম্ব না করে সিঁড়ি টপকে উঠতে শুরু করলো তৎক্ষণাৎ। সিঁড়িটা একটা প্রশস্ত ঘরে এসে শেষ হয়েছে। শূন্য ঘর। ঘরটার চারদিকে অনেক-গুলো খোলা দরজা। কোন্ দিকে যাবে ভেবে ঠিক করতে পারলো না শহীদ। এমন সময় গুলির শব্দ শুনে চমকে উঠলো। পরমুহূর্তে শব্দ লক্ষ্য করে ছুটলো ঘর ছেড়ে। রিভলভারের শব্দ ঘন ঘন কানে আসছে তার। কখনো ঘরের ভিতর দিয়ে কখনো অন্ধকারে উঠান পেরিয়ে সামনে ছুটতে লাগলো শহীদ। অবশেষে একটা আলোকিত মস্ত উঠানের পিছন দিকে এসে দাঁড়ালো সে। তারপরই দেখলো লোক তিনজন এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ছে দুর্গের প্রধান গেটের দিকে লক্ষ্য করে। দুর্গের ভিতর, গেটের পাশেই কেউ লুকিয়ে আছে বুঝতে পারলো শহীদ। সেখান থেকেও গুলি ছোঁড়া হচ্ছে। পিছনে শহীদের উপস্থিতি টের পায়নি লোকগুলো। সুযোগের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো শহীদ। মিনিট দু'য়েকের মধ্যেই লোকগুলোর গুলি শেষ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আড়াল থেকে বের হয়ে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে শহীদ বলে উঠলো, 'মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকো সবাই।'

ভয়ানকভাবে চমকে উঠলো লোকগুলো। কিন্তু মাথার উপর হাত তুলে রাখতে কেউই বিলম্ব করলো না।

'পিছন ফিরে তাকাবার দরকার নেই। আমি তোমাদের কাছে নজরুল ইসলাম বটে, কিন্তু আসল নই, নকল!'

শহীদের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গের বিরাটাকার গেটের আড়াল থেকে কালো আলখাল্লা পরিহিত স্বয়ং কুয়াশা বের হয়ে এলো।

'ধন্যবাদ, বন্ধু। কিন্তু শহীদ, আর একমুহূর্ত এখানে থাকা উচিত নয় আমাদের। ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছি আমি সম্পূর্ণ দুর্গটা। সলতেতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। মিনিটখানেকের মধ্যেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে দুর্গটা ধসে পড়বে।'

কুয়াশার কথা শেষ হতে আঁতকে উঠলো শহীদ। বললো, 'সর্বনাশ! ভিতরে যে মানুষ আছে দেখে এসেছি।'

কুয়াশা বললো, 'না, কোনো মানুষ আর নেই। যাদেরকে বন্দী করে রেখেছিলাম আমি তাদের সবাইকেই আমার লোকেরা দুর্গের বাইরে নিয়ে গেছে। ওদেরকে আমি পুলিসের হাতে সোপর্দ করতে চাই। আর সময় নেই শহীদ, চলো বেরিয়ে পড়া যাক।'

'এক সঙ্গে গেটের দিকে দৌড় দাও তোমরা তিনজন।' চিৎকার করে উঠলো শহীদ লোক তিনজনের উদ্দেশ্যে।

দুর্গের বাইরে চন্দ্রালোকিত মরুভূমি। নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছতেই প্রথম বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেলো ওরা। তারপর ঘন ঘন ডিনামাইট ফাটার গগনবিদারী

শব্দে সকলের কানে তালা লাগার দশা হলো। ক্রমশই দুর্গটা ধসে পড়তে লাগলো চতুর্দিক থেকে। ডিনামাইট ফাটার শব্দ ক্রমেই কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলো।

বিশাল দুর্গের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত ভয়াবহ ধ্বংসকাণ্ড ঘটতে লাগলো নির্জন মরুভূমিতে।

ডিনামাইট ফাটার শেষ শব্দ বাতাসে মিলিয়ে যাবার আগেই শহীদ ও কুয়াশা লোক তিনজনকে বেঁধে ফেলেছে দড়ি দিয়ে। কোনদিকে যখন কোনো শব্দ নেই আর তখন একটা হেলিকপ্টার আসার শব্দ শুনে শহীদ প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে কুয়াশার দিকে তাকালো। মৃদু হেসে বললো, 'কপ্টারটা আমারই।'

আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইলো শহীদ।

ইতিমধ্যে 'কপ্টারটা নেমে পড়েছে অদূরে। দুজন লোক নেমে এলো সেটা থেকে। কুয়াশা এগিয়ে গেল 'কপ্টারটার দিকে। তারপর লোকগুলোর সঙ্গে কি আলোচনা করে শহীদের কাছে ফিরে এসে বললো, 'তোমার বন্দীগুলোকে আমার জিম্মায় এখন গচ্ছিত রাখতে পারো শহীদ। করাচীতে ফিরিয়ে নিতে পারবে।'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো শহীদ। বন্দী লোক তিনজনকে নিয়ে চলে গেল কুয়াশার লোকেরা।

'কপ্টারটা আকাশপথে অদৃশ্য হয়ে যেতে একটু পরে শহীদ বললো, 'কামালকে হারিয়েছি আমি, কুয়াশা। তাকে…।'

মৃদু হেসে কুয়াশা বললো, 'বৃথা আশঙ্কা করছো শহীদ। কামালকে আমি নদী থেকে বাঁচিয়ে নিরাপদ স্থানে রেখে এসেছি। তারও আগে গুহার ভিতর ঢুকে তোমার পায়ের বাঁধন খুলে দিয়েছিলাম আমি।'

শহীদ বললো, 'ধন্যবাদ, কুয়াশা। কিন্তু মি. সিম্পসনের খবর কি বলতে পারো?'

হাসতে হাসতে কুয়াশা বললো, 'মি. সিম্পসন আহত অবস্থায় আমারই তত্ত্বাবধানে আছেন।'

হঠাৎ মনে পড়ে যেতে শহীদ বললো, 'আসল কথাই যে জিজ্ঞেস করা হয়নি! দুর্গের ভিতরের সব ছেলেকে উদ্ধার করেছো তো?'

কুয়াশা বললো, 'মিথ্যে তোমার দুশ্চিন্তা, শহীদ। মোট আড়াইশো ছেলেকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।'

অস্বাভাবিক কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো শহীদ, 'আড়াইশো কেন? তোমার কি বুদ্ধি ভ্রংশ হলো কুয়াশা? আড়াইশো ছেলেকে উদ্ধার করেছো যে! দুর্গে ছেলে ছিলো মোট চারশো।'

'চারশো!'

থতমত খেয়ে কুয়াশা শহীদের দিকে তাকিয়ে রইলো।

'নিশ্চয়ই চারশো। এই দেখো চারশো ছেলের লিস্ট।'

পকেট থেকে একটা লম্বা মতো কাগজ বের করে শহীদ কুয়াশার হাতে দিলো।

কাঁপা হাতে কাগজটা নিয়ে দেখলো কুয়াশা। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। কাগজটা থেকে মুখ তুলে কুয়াশা শহীদের মুখের দিকে কিছুক্ষণ নির্বাক তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, 'কোথায় পেলে তুমি লিস্টটা?'

অধৈর্যস্বরে শহীদ বললো, 'যে লোকগুলোকে এখন পাঠালাম তোমার 'কপ্টারে করে ওদের সঙ্গে হায়দারাবাদ থেকে আসছি আমি। ওদের মুখে তো তথ্যটা জেনেই ছিলাম, কাগজটাও সংগ্রহ করেছিলাম ওদের কাছ থেকে।'

নিথর দাঁড়িয়ে রইলো কুয়াশা। দেড়শো ছেলের হত্যাকারী বলে নিজেকে কোনমতে মেনে নিতে পারছিল না সে। 'তুমি জানতে না কুয়াশা দুর্গের কোন স্তরে, কোন দিকে কতো ছেলে আছে?' কঠিন গলায় প্রশ্ন করলো শহীদ।

'স্তর। তার মানে?'

'তুমি জানতে না কুয়াশা দুর্গটার নিচের দিকে আরো দুটো স্তর আছে? সেখানে কোনো না কোনো জায়গায় আরো ছেলে থাকতে পারে সে কথা তোমার মনে হয়নি একবারের জন্যেও?'

নির্বাক দাঁড়িয়ে আছে কুয়াশা। কোনো কথাই তার মুখে জোগাচ্ছে না। দুর্গের নিচের তলায় যে আরও এক বা একাধিক জগৎ ছিলো তা কুয়াশা ঘুণাক্ষরেও জানতো না।

অস্বাভাবিক মূর্তিতে রূপান্তরিত হলো শহীদ। কঠিনতর হয়ে উঠলো তার কণ্ঠস্বর। তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনার স্বরে জিজ্ঞেস করলো সে, 'উত্তর দাও, কুয়াশা। কি বলবার আছে তোমার দেড়শো নিষ্পাপ ছোটো ছোটো ছেলের জীবন সম্পর্কে?'

বিমূঢ় কণ্ঠে এতক্ষণে কুয়াশা আবার কথা বললো, 'কিছুই বুঝতে পারছি না, শহীদ। আমি খবর পেয়েছিলাম দুর্গে আড়াইশো ছেলে আছে, কিন্তু আর…'

'কে বলেছিল তোমাকে আড়াইশো ছেলে দুর্গে আছে, জানতে চাই।'

'একটা ছোটো ছেলেকে ভিতরে পাঠিয়েছিলাম আমি, ওয়্যারলেস মারফতে সে-ই খবরটা জানায় আমাকে। আমি…'

চিৎকার করে উঠে কুয়াশাকে বাধা দিলো শহীদ, 'একটা বাচ্চা ছেলের ওপর আস্থা রেখে দুর্গটা উড়িয়ে দিতে পারলে তুমি, কুয়াশা! অদ্ভুত, অদ্ভুত তোমার কাণ্ড-কারখানা! আসলে পৃথিবীতে তুমি একটা অভিশাপ, কুয়াশা। নিজেকে তুমি ভাবো মানুষের দুর্ভাগ্য মোচনকারী বৈজ্ঞানিক হিসেবে, দুস্থ মানুষের জন্যে আশীর্বাদ হিসেবে—কিন্তু ভুল, তা তুমি নও, কুয়াশা। আমরাও তোমাকে ঠিকমত চিনতে পারিনি, কুয়াশা। তা নয়তো এতো দ্বিধা জন্মায় কেন, এতো ভয় কেন, এতো মায়া কেন, কেন এতো সহানুভূতি তোমার প্রতি আমাদের সকলের? ভুল ধারণা আমাদের, সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। আসল ব্যাপার বুঝতে পারছি আমি। তুমি সৃষ্টিকর্তার অভিশাপ, মানুষ খুন করা তোমার নেশা। জ্ঞানে-অজ্ঞানে, চেতনে-অবচেতনে তুমি রক্তপিপাসু। তুমি চেষ্টা করলেও পারবে না মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি না খেলে। তুমি…'

'শহীদ!'

যন্ত্রণায় যেন ককিয়ে উঠলো কুয়াশা। শহীদের প্রতিটি শব্দ চাবুকের মতো হৃদয়ে আঘাত করছে তার।

'বলতে দাও আমাকে। তোমাকে আমি ভুল চিনেছিলাম, কুয়াশা। তোমার কোনো দোষ নেই এতে। সৃষ্টিকর্তার এই-ই ইচ্ছা, তোমাকে দিয়ে নিজের ইচ্ছা পূরণ করছেন। কি গূঢ় উদ্দেশ্য এর মধ্যে আছে তা তিনিই জানেন একমাত্র।'

থরথর করে কাঁপছে শহীদ। অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে তার দৃষ্টি। লাল টকটকে হয়ে গেছে চোখ দুটো। সর্বশরীর দিয়ে যেন আগুন ছুটছে।

শহীদের কথা শেষ হতে স্থির, গম্ভীর গলায় কুয়াশা বললো, 'তুমি যা বললে তা কি তোমার মনের কথা, শহীদ? তুমি কি মনে মনে কথাগুলো সত্যি বলে বিশ্বাস করো?'

ভালমন্দ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে শহীদ। ভেবেচিন্তে কোনো কিছু করার বা বলার মতো অবস্থা নয় তার তখন। কুয়াশার প্রশ্ন শুনে সে কঠিন গলায় বলে উঠলো, 'হ্যাঁ প্রতিটি কথা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, কুয়াশা!' আবার শোনো, 'তুমি মানুষের উপকার না করে চিরটা কাল অপকার করে যেতেই বাধ্য। মানুষের জন্যে আশীর্বাদ নও তুমি, অভিশাপ!'

'তবে এখন যা করা উচিত তাই করো, শহীদ। ভয় পেয়ো না, পিছিয়ে যেয়ো না দুর্বলতায়, দ্বিধা করো না কোনরকম।'

'স্থির অবিচলিত কণ্ঠে কথা কটি বলে শহীদের দিকে নিজের রিভলভারটি ছুঁড়ে দিয়ে আবার বললো, 'গুলি করো আমার বুক লক্ষ্য করে। মানুষের জন্যে অভিশাপকে চিরদিনের জন্যে মানুষের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দাও।'

শহীদ বুঝি পাগল হয়ে গেছে। স্থির হতে পারলো না সে কোনমতে। উত্তেজনায়, কাঁপছে সে। খপ্ করে কুয়াশার রিভলভারটি ধরে নিলো সে।

অস্বাভাবিক উত্তেজনায় হাত যে কাঁপছে শহীদের। কিন্তু সেদিকেও খেয়াল নেই তার। কুয়াশার দিকে তাকিয়ে কাঁপা হাতে পরপর ছ'বার টিপে দিলো সে রিভলভারের ট্রিগার।

ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ভরে গেল কুয়াশা আর শহীদের মধ্যবর্তী জায়গাটুকু। গুলি শেষ হয়ে যেতেই রিভলভারটি পড়ে গেল বালিতে শহীদের কাঁপা হাত থেকে খসে। দরদর করে ঘামছে সে ফাঁকা মরুভূমির শীতল আবহাওয়াতে।

ধোঁয়া সরে যেতে নির্বাক তাকালো দুজন দুজনের দিকে। অক্ষত শরীরে নিথর দাঁড়িয়ে আছে কুয়াশা একই জায়গায়। যেন একটা প্রাণহীন স্ট্যাচু। নিষ্পলক দৃষ্টি তার শহীদের মুখের উপর শান্ত ভাবে রাখা। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম মিলেমিশে ফোঁটায় পরিণত হচ্ছে। আর শহীদ কাঁপছে তখনও দুর্দমনীয় উত্তেজনায়।

'একটা গুলিও লাগাতে পারলে না, শহীদ! তোমার পকেটে হয়তো রিভলভার আছে, কিংবা তোমার পাশেই রয়েছে স্টেনগান—স্টেনগানটাই তুলে নাও, শহীদ। ওতে

এবার কাজ হবে, দেখো।'

তেমনি ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থেকে কুয়াশা কথা কটি বললো।

কথা জোগালো না শহীদের মুখে। নির্বাক, হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে কুয়াশার দিকে তাকাতে না পেরে। হঠাৎ দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলো সে, 'আমাকে ক্ষমা করো, কুয়াশা, ক্ষমা করো আমাকে।'

মুখ ঢেকেই দাঁড়িয়ে রইলো শহীদ। একটু পরই তার কাঁধে কুয়াশার হাতের মোলায়েম স্পর্শ অনুভব করলো সে।

কুয়াশা হাসিমুখে বললো, 'আজ আমার নবজন্ম হলো, শহীদ! সত্যি তুমি আমার দৃষ্টি খুলে দিয়েছো। প্রতিজ্ঞা করছি তোমার সামনে, আমি আজ থেকে নরহত্যাকে ঘৃণা করবো। আমি আর কখনো আমার সাধনার জন্য, স্বার্থের জন্য নরহত্যা করবো না। অতীতে যে সব নরহত্যা আমার দ্বারা ঘটেছে তার জন্য আমি অনুতপ্ত।'

মুখ থেকে হাত নামিয়ে কুয়াশার মুখের দিকে তাকালো শহীদ। গম্ভীর মুখাবয়ব বদলে গেল কুয়াশার। মৃদু মৃদু হাসলো সে। এমন সময় অদূরেই ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে সচকিত হয়ে তাকালো দু'জন। চাঁদের আলোয় দেখা গেল একজন ঘোড়সওয়ার ছুটে আসছে এদিকে।

ঘোড়সওয়ারটিকে ভালো করে দেখেই উজ্জ্বল হয়ে উঠলো শহীদের মুখ। দেখেই চিনতে পেরেছে সে কামালকে।

ওদের সামনে এসে দ্রুত নামলো কামাল ঘোড়া থেকে। শহীদকে দেখতে পেয়েই আনন্দে চিৎকার করে উঠলো সে, 'তুই তাহলে এখানেই আছিস, শহীদ! আর আমি ভাবছি...'

'তোর কি খবর, কামাল?'

হাসিমুখে কামাল বললো, 'খবর ভালো। গুলির শব্দ শুনে ছুটে আসছি দেড়শো ছেলেকে নিরাপদ একটা জায়গায় অপেক্ষা করতে বলে। ছেলেগুলোকে আমি দুর্গের দ্বিতীয় স্তর থেকে উদ্ধার করেছি।'

চমকে উঠলো শহীদ কামালের কথা শুনে। কি প্রচণ্ড ভুল করে বসেছিল সে! কুয়াশার দিকে তাকাতে পারলো না সে অপরাধবোধে জর্জরিত হয়ে।

কুয়াশা শহীদকে লক্ষ্য করে বললো, 'লজ্জার কিছু নেই, শহীদ। অনুশোচনার দরকার নেই তোমার। তুমি আমাকে যা বলেছো, যা করেছো তা তো আমার জন্যে প্রয়োজন ছিলো। তা না হলে কি আমি আমার ভুল ধরতে পারতাম?'

ধীর কণ্ঠে শহীদ বললো, 'তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে, বন্ধু?'

হেসে ফেলে কুয়াশা বললো, 'ক্ষমা চেয়ো না, শহীদ। কোনো অপরাধই তুমি করনি। সর্বশক্তিমান বিধাতার যা কাম্য ছিলো তাই করিয়েছেন তিনি তোমাকে দিয়ে। তোমার অপরাধ তো আমি দেখছি না কোথাও।'

কামাল কিছু বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে দেখতে লাগলো কুয়াশা ও শহীদকে।

কুয়াশা এবার প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললো, 'তোমরা যাও, শহীদ। 'কপ্টার পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি। আমার লোকেরা তোমাদেরকে 'কপ্টারে করে নিয়ে যাবে নদীর ওপারে। সেখানে কয়েকটা ডিঙ্গি নৌকা আছে। নৌকার মাঝিরা আধঘন্টার মধ্যে জাঁহাবাজ স্টিমারে পৌঁছে দেবে তোমাদের সকলকে। তোমরা পৌঁছবার আগে জাহাজ ছাড়বে না। ছেলেগুলোকে 'কপ্টারে করে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা আমি করছি—কেমন?'

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো শহীদ।

ঘুড়ে দাঁড়ালো কুয়াশা। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চললো। হাঁটতে হাঁটতে কুয়াশা পকেট থেকে ছোট্টো ওয়্যারলেস যন্ত্রটা বের করে মুখের কাছে তুলে ধরে কি যেন বললো। তারপর যন্ত্রটা পকেটে ভরে আবার হাঁটতে লাগলো।

শহীদ দেখলো কালো আলখেল্লা পরিহিত কুয়াশার বিশাল মূর্তিটা লম্বা লম্বা পা ফেলে মরুভূমির দিগন্ত বিস্তৃত ধু-ধু বালির রাজ্যে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। হঠাৎ একসময় একটা বালিয়াড়ির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল মূর্তিটা।

তারপরও আচ্ছন্নের মতো সেদিকে তাকিয়ে রইলো শহীদ বিবিক্ত হৃদয়ে।